স্বামী অভেদানন্দের
কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ

স্বামী অভেদানন্দের
কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ স্বামী সত্যকামানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬
ই-মেল ঃ ramakrishnavedantamath@vsnl.net
ওয়েবসাইট ঃ www.ramakrishnavedantamath.org

প্রথম প্রকাশ ১৩৩৬
দ্বিতীয় সংস্করণ পৌষ ১৩৬০ (জানুয়ারি ১৯৫৩)
তৃতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬২ (জুলাই ১৯৫৫)
চতুর্থ সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ (মে ১৯৬৭)
পঞ্চম সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৯১ (জুলাই ১৯৮৪)
ষষ্ঠ সংস্করণ ভাদ্র ১৪০২ (আগস্ট ১৯৯৫)
সপ্তম সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৫ (এপ্রিল ২০০৮)

ISBN 978-81-88446-83-4

লেজার সেটিং ঃ
অক্ষর লেজার
২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক ঃ
পেলিকান প্রেস
৮৫, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রকাশকের নিবেদন

'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইখানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে। প্রায় চব্বিশ বছর পরে বর্ধিত ও সুসংস্কৃত রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় সংস্করণ। চতুর্থ সংস্করণে 'ভূমিকা' এবং 'পরিশিষ্ট' সংযোজন করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। বর্তমানে গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। নূতন সংশোধিত এই সপ্তম সংস্করণটি 'স্বামী অভেদানন্দের কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণ' এই পরিবর্তিত নামে সুধীসমাজে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের মতোই সমাদর লাভ করবে আশা রাখি। এই গ্রন্থে যেখানে 'স্বামীজী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে 'স্বামী অভেদানন্দ' বুঝতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০০৬।

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভারত এবং তিব্বত ও সিকিম-রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের কম চেষ্টা করেননি ইংরাজ-রাজ এবং সেই চেষ্টার মাধ্যমে কয়েকটি পথও আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডাফরিণের সময়ে (১৮৮৪-১৮৮৮) ইংরাজ বণিকরা অচিন-দেশ লাদাকের পথে অভিযান করতে ইচ্ছা করেছিলেন পশম-ব্যবসায়ের লোভে। বণিকরা ইংরাজ সরকারকে জানিয়েছিলেন তাঁদের অনুরোধ, ফলে লর্ড মেকলের অধিনায়কত্বে একটি মিশন পাঠানোই সাব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু চীনের কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানালেন তাতে বিশেষভাবে। ইংরাজদেরও ছিল সংশয় আগে থেকে এবং তারই জন্য কাশ্মীর ও তিব্বতের সঙ্গে বুঝাপড়ার দরকার হয়েছিল তাঁদের। কিন্তু তদানীন্তন চীনের আপত্তিতে ও রাজনৈতিক নানাকারণে তিব্বতে ইংরাজ-মিশন পাঠানো স্থগিত রাখা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কূটনীতিজ্ঞ পেভালস্কি তিব্বত ভ্রমণে মনোযোগ দিলেন রুশিয়ার স্বার্থ-খাতিরে। ব্রিটিশ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জনের মনে এলো তাতে সন্দেহ, সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অভিযান-আতঙ্কও করেছিল তাঁকে চিন্তিত। ফলে তিব্বতের উপর পতিত হ'ল ইংরাজের দৃষ্টি। তাই বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধের অভিযানকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা তিব্বতের সঙ্গে। ইংরাজ-সৈন্য প্রেরিত হ'ল তিব্বতের পথে। যুদ্ধাভিযানের অধিনায়ক হিসাবে নিযুক্ত হলেন লর্ড কার্জন, স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যান্ড ও মিষ্টার র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড। ভুটানরাজ সহায়করূপে ব্রিটিশ অভিযাত্রীদের পথ দেখিয়েছিলেন। ব্রিটিশরাজ সমর্থ হয়েছিলেন তিব্বতে তাঁদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে। ইংরাজি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে তিব্বত-সরকারের স্থাপিত হ'ল সন্ধি ও বাণিজ্যচুক্তি। এ সকল ব্যাপারে লাদাকে ও ভারতের মধ্যে আবিষ্কৃত হ'ল দু'একটি পথ।

অন্যান্য সড়ক ছাড়াও কালিম্পঙ দার্জিলিঙ এই দু'দিক থেকে তিব্বতে অভিযান করার হ'ল সুবিধা। প্রথম, কালিম্পঙ থেকে পিডঙ, গ্যাণ্টক, ইয়াতুঙ ফারিজং (১৪২০০ ফিট), স্যামাডা, রঙ্গিলো, গিয়াঙসি বা জ্ঞানৎসে ও কলসার ভিতর দিয়ে যাওয়া যায় 'পেদী' চৌদ্দ-পনেরো দিনের রাস্তা অতিক্রম ক'রে। দ্বিতীয়, দার্জিলিঙ থেকে আবার 'ইয়াতুং' যাওয়ারও একটি পথ আছে যার দূরত্ব হ'ল ৮৩ মাইল। এই হাঁটাপথে পাঁচ দিন লাগে। দার্জিলিঙ থেকে 'জেলেপ্‌পা-পাস' গিরিবর্ত্ম, সেখান থেকে আঁকাবাঁকা পথ গেছে 'চুম্বি'-উপত্যকার সীমান্তবর্তী ইয়াতুঙ পর্যন্ত। ইয়াতুঙ থেকে যাওয়া যায় 'গিয়াঙসি' এবং সেখান থেকে 'লাসা' দুইশত চুয়াত্তর মাইলের পথ। ইয়াতুঙ থেকে আবার খামার নামক একটি বাণিজ্য-সড়ক আছে—যার ভেতর দিয়ে গেলে ইয়াতুঙ থেকে লাসার দূরত্ব পড়ে দুইশত পঞ্চাশ মাইল। কালিম্পঙ হ'তে লাসা পর্যন্ত যে পথ আছে তাতে খচ্চরের পৃষ্ঠে যেতে তিন সপ্তাহ লাগে।

দার্জিলিঙ হ'তে বাণিজ্য-পথটি 'নাথুলা-পাস' (১৪৫০০ ফিট) দিয়ে চুম্বি উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে, আর কালিম্পঙ হ'তে 'জেলেপ্পা-পাস'-এর (১৪৫০০ ফিট) উপর দিয়ে আর একটি পথ গেছে 'চুম্বি' পর্যন্ত। তাছাড়া সিকিম হ'তে তিব্বতে যেতে প্রায় আড়াই শো মাইলব্যাপী তিনটি বাণিজ্য-পরিবহন-পথও আছে। সে তিনটির নাম 'ল্যাণ্টুক-নাথুলা', 'জিলিপ-লা' এবং 'কাঙ্‌রা-লামা' বা 'লচেন সড়ক' বা গিরিপথ। একমাত্র খচ্চরের পৃষ্ঠে এইসব সড়ক ও গিরিপথ অতিক্রম করা যায়। তবে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান তার একমাত্র পথ সিকিমের বুকের উপর দিয়েই চলে গেছে। ভারতের সঙ্গে তিব্বতের এই যে কয়েকটি পথের যোগাযোগ সমস্তই বাণিজ্যিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত ছিল। পর্যটকরা ভারতবর্ষ থেকে এইসব পথে লাদাকে উপনীত হ'তে পারেন। এই বিবরণটি দেওয়া হ'ল একমাত্র অতীতের তথ্য হিসাবে, কোন রাজনৈতিক কারণে নয়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রথমে কাশ্মীর ও পরে তিব্বত পরিভ্রমণ করেন। কাশ্মীর পরিভ্রমণের পর তিনি সেখান থেকে যাত্রা করেন সিন্ধুনদের ধার দিয়ে তিব্বতের পথে। স্বামীজীর পরিভ্রমণ-কাহিনী বেশ চমকপ্রদ ও ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, তিব্বতী লামাদের জীবন-যাপনপ্রণালী, আচার-ব্যবহার ও তিব্বতের বিভিন্ন গুম্ফার (মনাষ্ট্রি) বিবরণ, তিব্বতবাসীদের সামাজিক বিবরণ, তাদের চিকিৎসাপ্রণালী ও ক্রীড়া-কৌতুকের কাহিনী এই পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। আরো সমৃদ্ধ করেছে যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক ও অপ্রকাশিত ভারতীয় জীবনকাহিনীর সমাবেশ।

জেরুজালেমে ইহুদীদের দ্বারা আনীত অভিযোগের ফলে তেত্রিশ বছর বয়সপ্রাপ্ত যীশুখ্রীষ্টের ওপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন রোম্যান শাসক পন্টিয়াস পাইলেট ও অন্যান্য দু'জন অপরাধীর সঙ্গে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। খ্রীষ্টানসমাজ বিশ্বাস করেন যে, ঐ ক্রুশে বিদ্ধ হয়েই যীশুখ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কোন কোন খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের মতে যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেননি। তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের কয়েকজন তাঁকে অজ্ঞান ও অচৈতন্য অবস্থায় ক্রুশ হ'তে উদ্ধার ক'রে সেবাশুশ্রূষা করেন। ঔষধী লতাপাতার রসে সিঞ্চিত ক'রে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ ক্ষতস্থানগুলির তাঁরা আরোগ্য সম্পাদন করেন। এই চমকপ্রদ কাহিনীর বিবরণ দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী "The Crucifixion by An Eye Witness" and "The Unknown Life of Jesus Christ" দুখানি বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম বইটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় আলেকজান্দ্রিয়া শহরে ও দ্বিতীয়টি প্রণয়ন করেন রাশিয়ানিবাসী পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ্ হিমিস গুম্ফায় রক্ষিত পুঁথির প্রমাণপঞ্জী থেকে। অনেকে বইটির ঘটনাকে অনৈতিহাসিক বলেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের অনেক যুক্তিবাদী ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত বিচার ক'রে বিশ্বাস করেন যে, ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে

যীশুখ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করেননি, তিনি জীবিত ছিলেন এবং প্রতিপক্ষগণ-কর্তৃক ধৃত হবার ভয়ে আত্মগোপন ক'রে পুনরায় আসেন ভারতবর্ষে। নিকোলাস নটোভিচের কাহিনী থেকে জানা যায়, চৌদ্দ বছর বয়সে যীশুখ্রীষ্ট জেরুজালেম থেকে পদব্রজে বাণিজ্যজীবী বণিকদের সঙ্গে সিন্ধুদেশে তথা ভারতবর্ষে আসেন। পর্যটক নটোভিচ্ লিখেছেন ঃ

"When Issa had attained the age of thirteen, when an Israelite should take a wife, the house, in which his parents dwelt and earned their livelihood in modest labour, became a meeting place for the rich and the noble, who desired to gain, for a son-in-law, the young Issa, already celebrated for his edifying discourses in the name of the Almighty.

"It was then that Issa clandestinely left his father's house, went out of Jerusalem, and, in company with some merchants, travelled toward Sindh. **

"In the course of his fourteenth year young Issa, blessed by God, journeyed beyond the Sindh and settled among the Aryas in the beloved country of God."

এই ঘটনা বিশ্বাস করার পক্ষে নটোভিচ্ যে যুক্তি ও প্রমাণপঞ্জী দিয়েছেন তা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হয়েছে। তাছাড়া ক্রুশে বিদ্ধ হবার পর নানারূপ শুশ্রূষায় পুনর্জীবন লাভ ক'রে যীশুখ্রীষ্ট আত্মগোপন করেছিলেন ভারতের পথে যাত্রা ক'রে, একথা অনেকে বিশ্বাস করেন এবং এ'বিশ্বাসের পিছনে তাঁরা বহু যুক্তিও প্রদান করেন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রুশ-পর্যটক নটোভিচের মতোই হিমিস-গুম্ফায় একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন তিব্বতীভাষায় লেখা যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবনের কথা। তিনিও ঐ গুম্ফা বা বৌদ্ধমঠের একজন দোভাষী লামার মাধ্যমে সেই পুঁথির যে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়ে নেন সেটিও এই বইয়ের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দেওয়া হ'ল। স্বামীজী মহারাজ কাশ্মীরের অন্তর্গত 'খানা-ইয়ারি' নামক স্থানে যীশুখ্রীষ্টের নামে উৎসৃষ্ট একটি 'কবর' দেখেছিলেন সেকথা এবং তার একটি আলোকচিত্র (ফটো—যা তিনি গ্রহণ করেছিলেন) এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোন এক ভদ্রলোকের লেখা একটি প্রবন্ধও ইংরাজি ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লিখিত হয়েছিল যে, করাচীর শহর-অঞ্চল থেকে কয়েক মাইল দূরে আধা-শহরের মতো স্থানে একটি সেণ্ট টমাসের কবর ও বেদী আছে। সেখানে একশ্রেণীর নরনারী নিজেদের সেণ্ট টমাসের দীক্ষিত খ্রীষ্টান-সম্প্রদায় ব'লে এখনো পরিচয় দেন। তাঁরা নাকি ওটিকে যীশুখ্রীষ্টেরই কবর বলেন। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা ঐ কবরে ফুল, দীপমালা ও ধূপধুনা দিয়ে

বিশেষপূজার অনুষ্ঠান করেন। পূজার শেষে তাঁরা 'জয় যেশু কৃস্তি, জয় যেশু কৃস্তি' ব'লে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে নৃত্যও করেন।

যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে যে মরেননি, বরং আরোগ্য লাভ ক'রে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এ'সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট বিবৃতি পাই আমরা সাধক স্বামী রামতীর্থের 'The Spiritual Power That Wins' বক্তৃতায়। সেটি হল :

"Now, Christ regained this union with the spirit before his death. You know that Christ did not die when he was crucified. This is a fact which may be proved. He was in a state called *samadhi,* a state where all life-functions stop, where the pulse beats not, where the blood apparently leaves the veins, where all signs of life are no more, where the body is, as it were, crucified. Christ threw himself into that state for three days and like a Yogi came to life again, made his escape and came back to live in Kashmir. Rama (Swami Rama Tirtha) had been there and found many signs of Christ having lived there. Up to that time there was no Christian sect in Kashmir. There was many places called by his name where Christians never came. Cities called by the same names as many of the cities of Jerusalem through which Christ passed. There is standing a grave of nearly 2000 years. It is held very sacred and called the *'Graves of Eash'* (Isha), which is the name of Christ in Hindusthani language, and 'Eash' means 'prince'. So there are many reasons to prove that He (Jesus) came to India, the same India where he learned his teaching.

"Again the people of India have a kind of magic ointment, which is called the *'Christ Ointment' (Malam-i-Isha),* and the story which the people, who prepare this ointment, tell, is that this ointment Christ used to heal his wounds after he came to life and that ointment really heals all sorts of wounds miraculously".

'কাশ্মীর ও তিব্বতে'-গ্রন্থ স্বামী অভেদানন্দের পরিব্রাজক জীবনের ইতিকাহিনী হ'লেও ঐতিহাসিক উপাদানে পূর্ণ, এজন্য তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইখানি অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি ইংরাজি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে বেলুড় মঠে ওঠেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কাশ্মীর ও তিব্বত-ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রথমে কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উপস্থিত হন। কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ (স্বামী তুরীয়ানন্দ) রোগশয্যায় তখন শায়িত। তিনি পৃষ্ঠব্রণে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সুদীর্ঘ বিশ বছর পরে হরি মহারাজের সঙ্গে আবার তাঁর মিলন হয়। স্বামী অভেদানন্দ পূজ্যপাদ হরি মহারাজের অসুখে

অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে পড়েন। হরি মহারাজের সঙ্গে সেই মিলনই তাঁর শেষ মিলন, কারণ পৃষ্ঠব্রণে অস্ত্রোপচার করা হ'লেও এই রোগেই হরি মহারাজ সমাধিতে দেহত্যাগ করেন। স্বামী অভেদানন্দ তিন দিন কাশীতে থেকে পার্শ্ববর্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে হরি মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাশ্মীর-যাত্রার জন্য কাশী ত্যাগ করেন এবং মোগলসরাই ষ্টেশনে পাঞ্জাব মেল ধ'রে লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ কাশ্মীর ও তিব্বতের প্রতিদিনের ভ্রমণ-কাহিনী তাঁর রোজনাম্চায় লিখে রাখতেন। কাশ্মীর ও তিব্বত-ভ্রমণ শেষ ক'রে ১১ই ডিসেম্বর তিনি আবার বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। তাঁর নিত্যসঙ্গী সেবক হিসাবে ছিলেন ব্রহ্মচারী ভৈরবচৈতন্য। স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারীকে কাশ্মীর ও তিব্বতের ভ্রমণ-কাহিনীর একটি খস্‌ড়া তৈরী করতে বলেন। ব্রহ্মচারী স্বামীজী মহারাজের রোজনাম্চা, 'টুরিষ্টস্ গাইড্ টু কাশ্মীর,' রাজতরঙ্গিনী ও কাশ্মীর-তিব্বত সম্বন্ধে আরো অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সুদীর্ঘ একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন। কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মঠের নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় ব্রহ্মচারী-লিখিত রচনাটি পাঠ করার সুযোগ পাননি। পরে কলকাতায় কর্মকেন্দ্র নির্বাচন ক'রে তিনি প্রথমে মেছুয়াবাজারে ও পরে ১১, ইডেন হস্‌পিটাল রোডে একটি বাড়ী ভাড়া ক'রে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে (বৈশাখ ১৩৩৪) রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির মুখপত্র মাসিক 'বিশ্ববাণী' প্রকাশিত হ'ল। ব্রহ্মচারী-লিখিত কাশ্মীর ও তিব্বতের ভ্রমণকাহিনীটি সমিতির কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে বিশ্ববাণীতে তখন প্রকাশ করতে থাকেন। পরে কাহিনীটিকে গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করতে অনুরুদ্ধ হ'লে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ নিজের রোজনাম্চা ও কাশ্মীর-তিব্বত-ভ্রমণের বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিয়ে 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকায় ব্রহ্মচারী-লিখিত ভ্রমণ-কাহিনীটির আদ্যোপান্ত সংশোধন ও বহু অংশে পরিবর্ধন সাধন করেন। গ্রন্থে তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী ও উপাদানগুলি সম্পূর্ণভাবে স্বামীজী মহারাজেরই নিজের সংযোজিত। স্বামী অভেদানন্দজীর সম্পাদনার পর বর্ধিত পাণ্ডুলিপি ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে "পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ" নাম নিয়ে প্রথম সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়। পরে পরিবর্তন ক'রে বইখানির নাম রাখা হয় "কাশ্মীর ও তিব্বতে"। প্রায় চব্বিশ বছর পরে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আরো বর্ধিত ও পরিশুদ্ধ রূপ নিয়ে। বইটির প্রথম সংস্করণ অনেক আগেই নিঃশেষিত হয়ে গেলেও নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। বর্তমানে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল জ্ঞানলিপ্সুদের শুভেচ্ছাকে স্মরণ ক'রে। চতুর্থ সংস্করণের ভাষা পরিমার্জিত করা হয়েছে এবং নূতন একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে রুশ-পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ্ লিখিত

"দি আন্‌নোন লাইফ্ অফ যিশাস্ ক্রাইষ্ট" থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে—যা থেকে পাওয়া যাবে হিমিস্ মঠে রক্ষিত যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত জীবনকাহিনীর সমর্থনসূচক প্রমাণ। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এবং তাঁরও আগে রুশ পর্যটক নটোভিচ্ যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন একই উপায় অবলম্বন ক'রে, সুতরাং অনুবাদ-তথ্য উভয়ের প্রায় সমান। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাই স্বামী অভেদানন্দ-লিখিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনকাহিনীর বঙ্গানুবাদ ছাড়াও নিকোলাস নটোভিচ্ কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য আমরা পরিশিষ্টে উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ,
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬।
জুলাই, ১৯৮৪।

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীনগরের পথে ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্যদেশে যাইবার পূর্বে সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল (১৮৮৬-১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান সকল তীর্থে সাধন-ভজন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ; কিন্তু কাশ্মীরে অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিবার সুবিধা তাঁহার কখনও হইয়া উঠে নাই, তাই তাঁহার ঐ স্থান দর্শনের ইচ্ছা আমেরিকায় অবস্থানকালেই বলবতী হইয়াছিল। সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে আমেরিকা হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার সেই ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হয় ও গ্রীষ্মের দুই মাস শিলং পাহাড়ে অতিবাহিত করিবার পর বেলুড় মঠে ফিরিয়া তিনি ১৪ই জুলাই ১৯২২ তারিখে সন্ধ্যায় পাঞ্জাব মেলে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় স্বামীজী কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ তখন পৃষ্ঠব্রণরোগে সেখানে শয্যাগত। আমেরিকায় একত্রে তাঁহারা বহুদিন বেদান্ত প্রচার করিয়াছেন আর আজ এই সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পরে উভয়ের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইল ! উভয়ের মনই এক অব্যক্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ! কিন্তু হায় ! কে তখন জানিত যে, এই অপূর্ব মিলনের আনন্দ দু'তিন দিন পরেই চিরবিচ্ছেদের সলিলে আবার মুছিয়া যাইবে।

সেইদিন কাশী সেবাশ্রমে বিশ্রাম করিয়া পরদিন স্বামীজী সারনাথ (ডিয়ার পার্ক—মৃগদাব) উপস্থিত হইলেন। সারনাথ কাশী হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভগবান শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মাদর্শ পঞ্চবৃদ্ধের নিকট এইস্থান হইতে সর্বপ্রথম প্রচার করেন। লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তির ধ্বংসাবশেষগুলি রক্ষা করিবার আইন করিয়া দিয়া ভারতের যে কতখানি উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এইস্থানের যাদুঘর ও খননাদি-কার্য দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আধুনিক কাশীধামের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়'। ইহা দেখিলে ভারতবাসীমাত্রেরই বুকে আশার সঞ্চার হয় ; শিক্ষাবিস্তারের কি বিরাট ব্যাপার এইস্থানে চলিতেছে। যাঁহার মানসপটে এই বিরাট কর্মের চিন্তা প্রথম উদিত হয় সেই ডক্টর মিসেস অ্যানি বেসান্তের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষাসংস্কার কার্যে বর্তমান ভারত যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। হিন্দু

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এর প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার কিং অতি মিশুক লোক। ভারতীয় ছাত্রগণের উপর তাঁহার বিশেষ স্নেহ, এবং তাহাদের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণে খাটিতেছেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে মিস্টার কিং স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি সঙ্গে করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বামীজীকে বলিলেন ঃ "আপনি পঁচিশ বৎসর বাস করিলেন আমেরিকায়, অন্ততঃ পঁচিশদিন কাশীতে থাকুন, এবং আমরাও আপনার নিকট হইতে বেদান্তের কথা শুনি।" কিন্তু এইবারে থাকিলে অমরনাথ দর্শনের বিলম্ব হইয়া যাইবে বলিয়া স্বামীজী শীঘ্র কাশ্মীরে যাইবার প্রয়োজন তাঁহাকে জানাইলেন এবং বারান্তরে আসিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সেবাশ্রমে ফিরিবার পথে দুর্গাবাড়ীর নিকট একখানি 'বাগিচা' দেখাইয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ "ত্রিশ বৎসর আগে সারদানন্দ, সচ্চিদানন্দ, যোগানন্দ ও আমি এই স্থানে বসিয়া সাধন-ভজন করিতাম ও মাধুকরী করিয়া খাইতাম।" সেই সময়ে কে জানিত যে, পাশ্চাত্যদেশবাসী সহস্র সহস্র ধর্মপিপাসুর নিকট বেদান্তের উদার বার্তা শুনাইবার জন্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এই প্রকারে তৈয়ারী করিয়া লইতেছিলেন। কাশীধামে তিনদিন থাকিয়া স্বামীজী মোগলসরাই স্টেশনে আপ পাঞ্জাব মেল ধরিয়া লাহোর যাত্রা করিলেন। রাত্রি ২॥০টার সময় হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল ; দেখিলাম গাড়ি আলিগড়ে থামিয়াছে। ৫।৬ জন দুধওয়ালা 'গরম দুধ' লইবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছে ; সেই অনুরোধের গোলমালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। স্বামীজীর দিকে তাকাইয়া দেখি গোলমালে তিনিও জাগিয়া উঠিয়াছেন। আলিগড়ে মাখনের কারখানা এত বেশী যে, খাঁটি দুধ মেলা ভার—সব দুধই মাখন তোলা (স্কিম্‌ড্ মিল্ক)। আমাদের কামরায় কেহই সেই দুধ লইল না। ভোর ৫টায় আমরা আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট-এ আসিয়া পৌঁছিলাম। আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট হইতে ই. আই. রেলওয়ে ছাড়িয়া এন. ডব্লু. রেলওয়ে-এর গাড়ী ধরিয়া লাহোর যাইতে হয়। গাড়ী প্রস্তুতই ছিল। আমরা মালপত্র তাহাতে তুলিয়া দিলাম। কিছু খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে সেখানে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিছুই মিলিল না। প্ল্যাটফর্মে দুই ব্যক্তি কি যেন বেচিতেছিল। তাহাদের একজন 'হিন্দু আণ্ডা' ও অপরে 'মুসলমান আণ্ডা' বলিয়া চীৎকার-শব্দে স্টেশনটি মুখরিত করিতেছিল। আমাদের কামরার সম্মুখে একজন শিখযাত্রী কিছু 'হিন্দু আণ্ডা' কিনিলেন, আমরা কৌতূহলবশতঃ জানালা দিয়া জিনিসটা কি দেখিতে লাগিলাম। দেখি, একটি হাঁসের ডিম ও তাহার সহিত কিছু নুন ও গোলমরিচের গুঁড়া।

আমাদের গাড়ী বেলা আন্দাজ ১২টার সময় লাহোর পৌঁছিল। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আসিতেছেন জানিতে পারিয়া পূর্বাহ্ণেই স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। লাহোর

স্টেশনটি খুব বড়। এখানকার একটি বন্দোবস্ত স্বামীজীর খুব সুন্দর লাগিল। স্টেশন হইতে প্রায় ১০০ হাত দূরে গাড়ী, মোটর, টাঙ্গা প্রভৃতির আড্ডা। যাত্রী আসিলে পুলিশ বংশীধ্বনি করিবে ও একখানি গাড়ী আসিবে, গাড়োয়ানের সঙ্গে দর-কষাকষি নাই, সব রেট বাঁধা। ইহা যে কতখানি সুবিধা তাহা কলিকাতার শ্যামবাজার প্রভৃতি স্থানের গাড়ীর আড্ডায় যাঁহারা অন্ততঃ একবার গাড়ী ভাড়া করিতে গিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

লাহোরে স্বামীজী স্থানীয় অ্যাডভোকেট সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার যত্ন ও অমায়িকতার কথা আমরা এ'জীবনে ভুলিতে পারিব না। লাহোরে এই সময় ভয়ানক গরম। দুইটি টাঙ্গার ঘোড়া পথে গরমে সর্দিগর্মি হইয়া মারা গেল এই সংবাদ আসিল। সে উৎকট গরম যে কি ভীষণ তাহা বাংলাদেশের লোককে (সেইস্থানে লইয়া না গেলে) বুঝানো কঠিন। আমাদেরও গরমে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল ; তাই সাহদারা, জুম্মা মসজিদ, সালেমার বাগ, ঠাণ্ডি সড়ক প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান স্থান দেখিয়াই আমরা পরদিবস রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিলাম। স্বামীজী বলিলেন ঃ "গরম কমিলে, কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া লাহোরে অনেকদিন থাকা যাইবে।"

এন. ডব্লু. রেলপথে বেড়ানো বড়ই আনন্দের। এমন সুন্দর পার্বত্য দৃশ্য অন্য কোন রেলে নাই ; কত ঝরণা, কত উপত্যকা, কত টানেল (সুড়ঙ্গ) পার হইয়া আমরা বেলা প্রায় ১০টার সময় রাওলপিণ্ডি পৌঁছিলাম। এইস্থানে শ্রীনগর ও কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানে যাইবার জন্য মোটরকার, বাস, টাঙ্গা, ডাণ্ডি প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়। মোটরকারে শ্রীনগর যাইতে সাত ঘণ্টা সময় লাগে ও ৪ জন যাত্রীর জন্য মোট ১০০ টাকা ভাড়া লয়, কিন্তু মালপত্র বেশী লইতে দেয় না। অল্প-স্বল্প মাল সঙ্গে লইয়া বাকি মাল বাসে চাপাইয়া দিলে উহা তিন দিন পরে শ্রীনগরে আসে। মোটর-লরি তিন দিনে এবং টাঙ্গা ছয় দিনে শ্রীনগরে পৌঁছায়। প্রত্যেক যাত্রীর জন্য লরির ভাড়া ৮ টাকা হইতে ৩০ টাকার মধ্যে এবং টাঙ্গার ৮ টাকা হইতে ১৫ টাকার মধ্যে। সময়ে সময়ে লোক বেশী হইলে বা পথ খারাপ থাকিলে যাত্রীদের তিন-চার দিন রাওলপিণ্ডিতে পড়িয়া থাকিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের পড়িয়া থাকিতে হয় নাই। গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখি একটি বাস শ্রীনগরে যাইবার জন্য স্টেশনের নিকটে প্রস্তুত রহিয়াছে। স্বামীজী বাসের মালিকের সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া টাকা অগ্রিম দিয়া দিলেন ও মালপত্র উঠানো শেষ হইলে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্য আমরা অন্যত্র গমন করিলাম। এইস্থানে আহারের কোন অসুবিধা নাই ; বৃহৎ বাজার, হোটেল ও রিফ্রেসমেন্ট রুম আছে। কালীবাড়ীতে কেহ প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন। আমাদের বাসের ভিতরের প্রত্যেক সিটের ভাড়া ১৫ টাকা এবং সম্মুখের ভাড়া ২২ টাকা। এই সময়ে অমরনাথ-যাত্রীর ভিড়

বলিয়া ভাড়া এত বেশী হইয়াছে, নচেৎ বৎসরে অন্যান্য সময় উহা ৮/১০ টাকার অধিক হয় না। বাসে মালের ভাড়া প্রত্যেক মণ হিসাবে ৮ টাকা দিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক যাত্রী আধ মণ মাল বিনা ভাড়ায় সঙ্গে লইতে পারে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা ফিরিয়া দেখি, ইতঃপূর্বে বাসওয়ালা যে সীটটি স্বামীজীকে ২২ টাকায় বেচিয়া অগ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহাই আবার অন্য আর একজন সাহেবকে ৩৫ টাকায় বেচিয়াছে। সাহেবটি (মেজর স্কিনার) খুব ভদ্রলোক, সকল ব্যাপার শুনিয়া, বাসওয়ালাকে খুব তিরস্কার করলেন ও নিজে সরিয়া গিয়া অন্য সীট-এ বসিলেন। বাস বেলা ১২টার সময় ছাড়িবার কথা ছিল, কিন্তু ছাড়িল ঠিক বৈকাল ৪টায়। এই দেশের লোকেরও কথা বাংলাদেশেরই মত। আমাদের বাসের ভিতর ২০ জন উদাসী সাধু উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের গাঁজা টানার ধূম ও হরিধ্বনির চীৎকারে রাস্তার লোকেরা আমাদের বাসখানির ভিতর যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা অনুভব করিতেছিল।

'রাওলপিণ্ডি' হইতে 'বারকাও' গ্রাম পর্যন্ত সাড়ে তের মাইল ; পথ বেশ সমতল কিন্তু 'ছত্তর' নামক গ্রামের নিকট ও শৈল গ্রামের সেতুর পরপার হইতে পথ বড় খারাপ, 'চড়াই' ভাঙিতে হইল। 'ছত্তর' গ্রামে বাস থামাইয়া সরকারী কর্মচারীগণ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে পাঁচ আনা হিসাবে পথকর (রোড-সেস্) আদায় করিল। এইস্থানের 'চড়াই'-এর পথটি মনোহর পার্বত্য-দৃশ্যপূর্ণ ও বরাবর বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। 'ত্রেত' নামক গ্রামে আসিয়া বাসের ইঞ্জিনে শীতল জল ভরিতে হইল। কারণ এত পথ ক্রমাগত চড়াই করিয়া বাসের ইঞ্জিন অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরেই আমরা 'মারি' বা 'কুমারী' নামক পার্বত্য-শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইস্থানটি রাওলপিণ্ডি হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ; আজ রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে হইবে। কারণ রাত্রে এই পথে গরুর গাড়ি ব্যতীত অন্য কোন গাড়ি চলিবার নিয়ম নাই। দিনে উহার উল্টা নিয়ম। এই স্থানে পৌঁছিয়া আমাদের অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল, কারণ স্থানটি সমুদ্রতট হইতে ৭০০০ ফিট ঊর্ধ্বে অবস্থিত। মারির যে স্থানে বাজার সেই স্থানটির নাম সানি ব্যাঙ্ক। ইহা ৬০৫০ ফিট উচ্চ। মারিতে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ নরনারী গ্রীষ্মবাস করিয়া থাকেন। সেইজন্য ইহাকে এই প্রদেশের দার্জিলিং বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাজারে একটি মাড়োয়ারীর দোকানে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম।

সকালে জলযোগের পর আবার রওনা হওয়া গেল। বহু নদী, বনভূমি পার হইয়া নানা অধিত্যকা উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আমরা ব্রিটিশ-ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ 'কোহালা'য় উপনীত হইলাম। তখন বেলা প্রায় একটা। স্থানটি মারি হইতে ২৯½ মাইল উত্তরে এবং সমুদ্রতট হইতে ১৮৮০ ফিট উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এইস্থান এত ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইলেও গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যন্ত গরম পড়ে, এমনকি সময় সময় উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রী পর্যন্ত হইয়া থাকে। এইস্থানে বিতস্তা নদী খুব

খরস্রোতা ; একটি সুন্দর লৌহনির্মিত ঝোলানো সেতুর উপর দিয়া নদীটি পার হওয়া গেল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় এইস্থানের প্রাচীন সেতুটি নষ্ট হইয়া যাওয়ার পর কাশ্মীরের মহারাজা বর্তমান সেতুটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নদীর পরপারে প্রত্যেক যাত্রীর নাম, ধাম, শ্রীনগর যাইবার উদ্দেশ্য এবং কতদিনে ফিরিবেন ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া পুলিশ-কর্মচারীগণ প্রত্যেকের মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল ও প্রত্যেকের নিকট হইতে পাঁচ আনা হিসাবে পথকর (রোড সেস্) আদায় করিল। ইহা কাশ্মীর রাজসরকারের প্রাপ্য। এইস্থানে দোকানপাট সুবিধামত নাই। একটি ক্ষুদ্র বাজার আছে। দোকানদারগণ অধিকাংশই মুসলমান। এইস্থানের ডাকবাংলোটি খুব বড় ও সেখানে থাকিবার বন্দোবস্ত খুব ভাল। এত বড় ডাকবাংলো এই পথে আর কোথাও নাই। এইস্থানে আহারাদি করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এই স্থানে আসিয়া পর্যন্ত আমাদের খুব গরম বোধ হইতেছিল। বাস চলিতে আরম্ভ করিলে, শীতল বাতাস গায়ে লাগায় আমরা খানিকটা শান্তি লাভ করিলাম। অবশ্য এই শান্তি কেবল সম্মুখের সীট-এর যাত্রীরাই পাইয়া থাকেন। যাঁহারা বাসের ভিতরের সীট-এ বসেন তাঁহাদের ধুলায়, গরমে ও ঝাঁকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। চারিদিকে ঘনজঙ্গলপূর্ণ পর্বতের দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইতে লাগিল। 'ছত্তর'-এর নিকট আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া আমরা ক্রমাগত নিম্নে নামিতে লাগিলাম। এত বড় 'উৎরাই' এ'পথে আর নাই। বাস-চালক ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিয়া কিছু পেট্রোলের সাশ্রয় করিল ! ঢালু পথ পাইয়া বাস আপনি চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগত সাড়ে সাত মাইল চলিয়া অবশেষে আমরা একটি বৃহৎ নদীর উপরে একটি সুন্দর সেতুর নিকট আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানটির নাম 'দুলাই', সমুদ্রতট হইতে এই স্থান ২০২৩ ফিট উচ্চ। এইস্থানে একটি সুন্দর ডাকবাংলো আছে। সেখানে পথিকদিগের আহার ও বাসস্থানের সকল বন্দোবস্ত আছে। এই স্থান হইতে বরাবর পাহাড় কাটিয়া পথ নির্মিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে বর্ষাকালে পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ার চিহ্ন দেখা যায়। 'মজফরাবাদ'-এর নিকট 'কারনাল' নামক একটি ১৪০০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের মাথা তুষাররাজিতে অতি সুন্দর হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের মাথায় বরফ জমা বিশেষতঃ এত নিকটে দেখিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইলেন। দুলাই হইতে দোমেল ৯½ মাইল। বৈকাল ৪½ ঘটিকায় আমরা 'দোমেল' আসিয়া পৌঁছিলাম। বাসের ইঞ্জিন এত পথ চলিয়া পুনরায় গরম হইয়া উঠাতে সরকারী ডাকবাংলোর নিকট দাঁড় করানো হইল ও তাহার গরম জল ফেলিয়া দিয়া চালক শীতল জল পূর্ণ করিতে লাগিল। এই অবসরে যাত্রীরা অনেকেই জলযোগের জন্য বাজারের দিকে চলিয়া গেল, স্বামীজীও চা পান শেষ করিয়া আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। এই স্থানটি ২,১৭১ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটি ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বাজার আছে। অদূরে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা মিলিত

হইয়াছে বলিয়া এই স্থানকে 'দোমেল' অর্থাৎ দুই নদীর সম্মেলন বলে। এইস্থান হইতে বিতস্তা পূর্ববাহিনী হইয়াছে। প্রায় আধঘন্টা পরে আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। প্রায় দেড় মাইল পথ আসিয়া আমরা মজাফরাবাদের প্রাচীন শিখ-দুর্গ ও মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন শিখগণ কাশ্মীরের সোপোর নামক স্থান জয় করিয়া এ স্থানে বাস করিতেছিলেন তখন এই প্রদেশে 'বমবাস' প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগুলি তাঁহাদিগকে ঐ প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হইতে পারে নাই।

এইস্থানেই 'আবটাবাদ' ও 'মারি' যাইবার পথ দুইটি মিলিত হইয়াছে। স্বামীজী বাস হইতে ঐ পথটি দেখাইয়া দিলেন। উহা নদীতট হইতে ১৫০০ ফিট উপর দিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া গিয়াছে। উহা বাস হইতে কতকগুলি উচ্চ পাহাড়ের বক্ষে ফাটা ফাটা দাগের মত মনে হইতেছিল। শীতকালে এই দিকের অধিকাংশ পথই তুষার পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ঐ পথটি কখনও বন্ধ হয় না।

আমাদের বাস ঘণ্টায় বারো মাইল হিসাবে ছুটিতেছিল। ক্রমেই সম্মুখস্থ উপত্যকার দৃশ্য মনোহর দেখাইতে লাগিল। প্রথম দর্শনে উহাকে সংকীর্ণ মনে হইয়াছিল, কিন্তু যতই উহার নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম ততই উহা বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করিতে লাগিল। এইস্থানে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকায় আমাদের খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। এইস্থানে পথে একটি বাঁক আছে, বাঁকটি ঘুরিতেই আমরা সম্মুখে অন্য আর একখানি বাস আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। উহা শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি ফিরিতেছে; দেখিতে দেখিতে উহা আমাদের বাসের অতি নিকটবর্তী হইল। আমাদের চালক হর্ণ দিয়া উহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু উহার ব্রেক ছিল না, সজোরে আসিয়া আমাদের বাসখানিকে ধাক্কা মারিল। সুখের বিষয় কোন প্রাণহানি হইল না কিন্তু আমাদের বাসখানি খুব জখম হইয়া গেল। সে-বাসখানির বিশেষ কিছু হইল না, কিয়ৎক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সেখানি চলিয়া গেল। অগত্যা এই স্থানেই আমাদের বাসখানি দাঁড়াইয়া রহিল। চালক কামার ও মিস্ত্রি ডাকিয়া আনিয়া মেরামত আরম্ভ করিয়া দিল। সুখের বিষয়, এই পথের সমস্ত পল্লী ও বাজারে কামার ও কারিগর পাওয়া যায়। বাস মেরামত করিতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। অন্যান্য যাত্রিগণ বাজার হইতে আহারাদি সারিয়া কেহ বাসের ভিতর, কেহ উপরে, কেহ পথিপার্শ্বে, কেহ কোন দোকানে শয়ন করিয়া রহিল। আমরা ইতিপূর্বেই ডাকবাংলোয় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম; সামান্য বিছানাপত্র লইয়া রাত্রি যাপন করিতে চলিলাম।

এই অঞ্চলের সমস্ত পথেরই একধারে উচ্চ পর্বত ও অপর ধারে প্রায় আধ মাইল নীচু খাদ। কত লরি, মোটরকার অসাবধান হইয়া চলার ফলে সেই খাদে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ এই পার্বত্য পথের বাঁকগুলি

একেবারে ইংরাজি 'ইউ' অক্ষরের ন্যায় বক্র বলিয়া ধাক্কা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সমস্ত কারণে এই পথে ভ্রমণকারীদিগের উচিত (১) পথে সর্বদা হর্ণ দিতে দিতে আসা, (২) নূতন চালক গাড়ীতে না রাখা, (৩) ব্রেক খারাপ অবস্থায় গাড়ী পথে বাহির না করা। যাহা হউক, আমরা অল্প দূরবর্তী 'গারি' নামক পল্লীর ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম ও আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। দোমেল হইতে গারি চৌদ্দ মাইল (২,৬২৮ ফিট উচ্চ)। রাত্রে খুব শীত পড়িল। গ্রীষ্মকালে এখানে মশক ও ম্যালেরিয়ার উপদ্রব অতিশয় হইয়া থাকে।

পরদিন প্রাতে আমরা চা পান করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নদীতীরে ছাড়িয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম। কিছুদূর এই পথে যাইয়া আমরা পুনরায় নদীতীর প্রাপ্ত হইলাম। এই স্থানটি সমুদ্রতট হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ। দুই-একটি 'চানার' বৃক্ষ ইতস্ততঃ দেখা যাইতে লাগিল। 'হাতিয়ান' নামক গ্রামের পর হইতে চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে বড় বড় পাথর পতনোন্মুখ অবস্থায় বহুকাল হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এতক্ষণ পথে যেসকল পাহাড় দেখিয়া আসিতেছিলাম সেগুলি মাটি ও পাথর মিশ্রিত ছিল। এইস্থানের অধিকাংশ পাহাড়ই কেবল পাথরের এবং ছোট বড় নানা আকারের নুড়িপূর্ণ। কিয়ৎদূরে 'কারনাল' উপত্যকায় যাইবার একটি পথ ও ঐ রাস্তার উপর একটি সুন্দর ঝোলানো সেতু রহিয়াছে। এই স্থানে অসংখ্য চীড় (দেবদারু) গাছ জন্মিয়া থাকে। সকলগুলিই লম্বা সরু পাতাযুক্ত (লঞ্জি ফোলিয়া)। নদীর অপর পারে একটি শিখ-দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পূর্বলিখিত পার্বত্য জাতিদের সহিত যুদ্ধে শিখদিগকে এইস্থলে একবার ভীষণরূপে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। পাহাড়ীরা গভীর রাত্রে পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে ও তরবারি হস্তে হঠাৎ আসিয়া শিখ সৈন্যগণকে আক্রমণ করে। শত শত শিখ এই যুদ্ধে প্রাণ হারায়। এই স্থানের অল্প দূরেই 'চেনারি'র ক্ষুদ্র বাজার রহিয়াছে। এক মাইল দূরে একটি সুন্দর জলপ্রপাত আছে। এইস্থানের পথটি বহুবার ভাঙিয়া গিয়াছিল। উপরের পাহাড়টি প্রায়ই ধ্বসিয়া পড়ে। পূর্বে এইস্থানে 'চাকোটি' নামক ডাকবাংলো ছিল। উহা ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই স্থানটি ৩৬৯৩ ফিট উচ্চ। এইস্থানে নদীর উপর একটি পুরাতন ধরনের ভুর্জশাখা ও দড়ি নির্মিত ঝুলা পোল রহিয়াছে। উহা নদীর জল হইতে ৩০০ ফিট উর্ধ্বে অবস্থিত। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র সমতলভূমি। সমতলভূমি এ অঞ্চলে অতি বিরল, কিন্তু চারিধারের পার্বত্য দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক।

'চেনারি' গ্রামখানি 'গারি' হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইতিপূর্বে পথে অনেকগুলি জলপ্রপাত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এই স্থান হইতে পথের একদিকে কেবল উচ্চ পর্বতশ্রেণী ও অন্যদিকে অতি গভীর খাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। বহুবার

আঁকাবাঁকা পথে মোড় ফিরিতে ফিরিতে আমাদের বাস চলিতে লাগিল। বিতস্তা নদীটি এই অতি উচ্চ স্থান হইতে সরু সূতার মতো দেখা যাইতেছে। এই স্থানের পথটি বড় বড় পাথর কাটিয়া ও ডিনামাইট দিয়া পাথর উড়াইয়া দিয়া নির্মিত হইয়াছে। অনেকস্থানে পাহাড়ের গায়ে ডিনামাইট পোড়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এই পথটি নির্মাণ করিতে অনেক কুলি ও মজুরের প্রাণ গিয়াছে। এই পথের কিছুদূরে এক বৃহৎ লৌহের সেতু আছে। প্রথমে এই পথের সকল সেতু কাঠের ছিল, এখন সমস্তগুলিকেই লৌহের করা হইয়াছে। 'বরমভাত' নামক স্থানে বড় বড় পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখা যাইতে লাগিল। এইস্থান দিয়া অনেক সময় টাঙ্গা চলিতে পারে না। বর্ষাকালে উপর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই খসিয়া পথের উপর পড়ে। সেইজন্য সেই সময় এই পথ দিয়া চলাফেরা বড়ই বিপজ্জনক। 'উরি'র নিকট একটি ক্ষুদ্র ময়দানে একটি দুর্গ আছে। সেখানকার পার্বত্য-সৌন্দর্য অতুলনীয়। ময়দানটি নদীতট হইতে ৩০০ ফিট উচ্চভূমিতে অবস্থিত। পূর্বে 'উরি' খেতাবধারী একজন মুসলমান রাজা এইস্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এ-স্থানের ঐ প্রকার নামকরণ হইয়াছে। দুর্গটির নিকট একটি ছোট ঝোলানো সেতু রহিয়াছে। পথের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঠ দেখা যাইতেছে, মাঠগুলির একদিক পাহাড়ের সহিত সংলগ্ন ও অপর দিক খুব ঢালু। এইস্থানে অনেক ভল্লুক বাস করে এবং ইহার নিকটেই একটি নালা আছে। তথায় 'মারখর' নামক একপ্রকার পশু বিস্তর বাস করে। সেইজন্য অনেক সাহেব-শিকারী এইস্থানে শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। 'চেনারি' হইতে 'উরি' ১৮ মাইল দূর। আমাদের আসিতে দুই ঘন্টা সময় লাগিল। 'হাজিপীর' নামক একটি পাহাড়ের উপর দিয়া 'পুঞ্চ' রাজ্যের পথটি অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। পথটি এত সরু যে, কোন গাড়ী চলিতে পারে না, কেবল ঘোড়া যাইতে পারে। এই পথের কিছু দূর হইতে উপত্যকাভূমি পুনরায় সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে কতকগুলি বেলেপাথরের, কতকগুলি খড়িপাথরের এবং কতকগুলি হল্‌দে ও বেগুনে রং মেশানো পাথরের পাহাড় রহিয়াছে। আমাদের চারিদিকেই পীরপঞ্জালের সুদৃশ্য বনভূমির পথটি ক্রমাগত ঢালু হইয়া যাইতেছে। 'ব্রাণকুত্রি' নামক গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। এইস্থানের দৃশ্য অতি চমৎকার। মনে হইতেছে বুঝি প্রকৃতিদেবী নানাজাতির ফুল দিয়া গিরিরাজকে পূজা করিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে ফুলগাছ, ঝরণা, বন, উচ্চ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ও তুষারশ্রেণী থাকিয়া স্থানটির দৃশ্য অতীব মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। নিকটেই একটি ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস বা 'বিজ্‌লী-ঘর' রহিয়াছে। এই প্রকাণ্ড পাওয়ার হাউস হইতে সারা কাশ্মীর রাজ্যে ইলেকট্রিক আলো সরবরাহ হয়। জলের চাপে আটখানি চাকা (টারবাইন) ঘুরাইবার ফলে এখানে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন চালানো হইতেছে। ইহা একটি দেখিবার মতো স্থান সন্দেহ নাই। এত বড় হাইড্রলিক পাওয়ার হাউস বোধ হয়

অনেক দেশেই নাই। নিকটে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় গগন ভেদ করিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার অল্প দূরেই 'রামপুর' বস্তি। স্থানটি খুব রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। ইহা উচ্চতায় সমুদ্রতীর অপেক্ষা ৪৮৪২ ফিট্ অধিক। 'উরি' হইতে এইস্থান ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এইস্থান হইতে পথ অপেক্ষাকৃত সমতল। রামপুর হইতে এক মাইল দূরবর্তী 'বানিয়ার' নদী অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। নিকটে একটি করাতের কারখানা ও একটি ক্ষুদ্র বাজার পার হইলাম। এইস্থানে একটি মোড় ঘুরিতেই দেখি সম্মুখে একখানি মোটরকার, কিন্তু কোন দুর্ঘটনা হইল না কারণ চালক আমাদের মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইয়া বামদিকে সরিয়া গিয়াছিল এবং গতি কম করিয়া দিয়াছিল। যদি হর্ণ না শুনিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই দুইটিতে ধাক্কা লাগিত কারণ পথ খুব সরু। যেসকল ইঞ্জিনিয়ার এই পথটি মেরামত করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের একটি শাখা-অফিস ও বিশ্রামগৃহ এই স্থানে আছে। অনতিদূরে পাহাড়ের বহু বড় বড় ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এই পর্বত-অংশগুলি পুরাকালে তুষার নদীর (গ্লেসিয়ার) চাপে পাহাড়ের চূড়া হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আরও কিছুদূর যাইয়া আমরা 'ভানিয়ার' নামক একটি সুন্দর প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। কয়েক বৎসর পূর্বে দেওয়ান 'কৃপারাম' ইহার উদ্ধারসাধন করেন। ইহা দেখিলে পুরাকালে এদেশে হিন্দুরা কিরূপ মন্দির নির্মাণ করিত তাহার নমুনা (মডেল) বুঝিতে পারা যায়। ইহার অল্প দূরেই 'নওসেরা' নামক গ্রাম ও একটি প্রাচীন দুর্গ রহিয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে ভীষণ ভূমিকম্পে এই গ্রামখানির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। এই স্থানের অল্প দূরেই বিতস্তার উপত্যকাভূমি পুনরায় খুব বিশালাকার ধারণ করিয়াছে। পথের বামদিকে অতি নীচু খাদ রহিয়াছে। খাদের নীচে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া আসে। খাদটি এত নীচু যে, তলদেশের বৃক্ষ সকলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মতো মনে হইতেছে। এই স্থান হইতে পথটি ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিয়া গিয়াছে। পথের সর্বোচ্চ স্থান হইতে নিম্নের উপত্যকার দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে বাগানের মতো চীড় (দেবদারু) বৃক্ষের বন দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে বাগানের মাঝে এক একটি পাহাড়ী গ্রাম। দুই-এক স্থানে মাঠ ও ঝরণা। চারিদিকে কেবলই পাহাড় দেখিতেছি, ইহার কোন্ দিক দিয়া যে আমরা প্রবেশ করিলাম বা কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। দূরে উত্তরে, ঐ সমস্ত তুষারাবৃত পাহাড় দেখা যাইতেছে। ঐগুলির মধ্যস্থলের উপত্যকায় ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রধান সহর "শ্রীনগর" অবস্থিত। ক্রমেই শ্রীনগর যত নিকটবর্তী হইতে লাগিল আমাদের উৎকণ্ঠাও ততই বাড়িতে লাগিল। দূরে তুষারধবল "নাংগা" পর্বত (২৬,৯০০ ফিট) ও "হরমুখ" পর্বত (৬,৯০০ ফিট) অতি সুন্দর দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে গুলমার্গের অভ্রভেদী পর্বতসকল সদর্পে উন্নতশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অদূরে "কোলাহাই"

পর্বতটি (১৮,০০০ ফিট) দেখিয়া মনে হইতে লাগিল ঠিক যেন একটি বিশালকায় সিংহ শুইয়া আছে এবং তাহার মুখের সম্মুখে বসিয়া একটি ক্ষুদ্র মেষশাবক। ক্রমে আমাদের বাস "বরামূলা" শহরে আসিয়া উপনীত হইল। বাস থামিলে আমরা নামিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। এই স্থানটি রামপুর হইতে ১৬ মাইল। উচ্চতা ৫,১৯৩ ফিট। একটি রোমান ক্যাথলিক মিশন-স্কুলের সম্মুখে বসিয়া স্বামীজী স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাশি উপভোগ করিতে লাগিলেন। পার্শ্বেই গুলমার্গ শহরে যাইবার একটি পথ রহিয়াছে। আমাদের বাসে দুইটি শিখ-যুবক ছিলেন। তাঁহারা গুলমার্গে যাইবেন। রাওলপিণ্ডি হইতে তাঁহারা আমাদের পার্শ্বে সম্মুখের সিট-এ বসিয়াই বরাবর আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজীর সহিত অনেক কথাবার্তা হওয়ায় বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের একজনের নাম কালওয়ান্ত সিংহ, লাহোরে বাড়ী। গুলমার্গে তাঁহার ভগ্নিপতি জঙ্গল-বিভাগে চাকুরী করেন। তাঁহার নিকট বেড়াইতে যাইতেছেন। এই স্থানে তাঁহারা দুইজনে নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বামীজীকে গুলমার্গে তাঁহাদের বাসায় একবার বেড়াইতে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গেলেন ; স্বামীজীও যাইতে স্বীকৃত হইলেন। গুলমার্গ এইস্থান হইতে ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। যাইবার জন্য ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। চল্‌তি মোটরকার বা টাঙ্গাও সময় সময় পাওয়া সম্ভব।

'বরাহ-মূল' বাক্যটির অপভ্রংশ 'বরামূলা' হইয়াছে। কাশ্মীরবাসী হিন্দুগণের বিশ্বাস যে, এই স্থানেই ভগবান বিষ্ণুর বরাহ অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শহরটি বিতস্তার উভয় তীরে অবস্থিত। গৃহসংখ্যা প্রায় ৮০০। বরামূলা জেলার ইহাই প্রধান শহর। 'রাজতরঙ্গিণী' পাঠে জানা যায়, রাজা অবন্তি বর্মার প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীসূর্য বিতস্তার তীরে একটি সুবৃহৎ বাঁধ রচনা করিয়া এই শহরটিকে একবার ভীষণ জলপ্লাবনের হাত হইতে রক্ষা করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে শহরটি সর্বতোভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এইস্থানে মোগল সৈন্যগণের একটি প্রাচীন সরাইখানা এবং শিখ-রাজত্বকালে নির্মিত একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য। দুটি গন্ধক-মিশ্রিত জলের ঝরণা, একটি প্রাচীন শিবমন্দির এবং বিতস্তার পূর্বতীরে একটি পুরাতন নগর-তোরণের ভগ্নাবশেষ এই শহরের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আধুনিক বরামূলা শহরে ডাকবাংলো, কতকগুলি দেশীয় কর্মচারীদের চটি, একটি ইংরাজি স্কুল, বাজার এবং কাঠের কারখানা উল্লেখযোগ্য। স্থানটি পার্বত্য সৌন্দর্যের লীলাভূমি। অনেকে কাশ্মীরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই স্থানকেই অধিকতর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় বলিয়া মনে করেন। এই শহরের আশেপাশের পাহাড়গুলির নুড়ি ও জলের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং মসৃণ পাথরের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এইসকল স্থান কোন-না-কোন সময়ে নিশ্চয়ই জলমগ্ন ছিল এবং উত্তাল তরঙ্গমালা সবেগে এইসকল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত।

পরে ভূমিকম্প বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে এই সকল পর্বতশ্রেণী ও সমতলভূমি জলের তলদেশ হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। তাহার পর কালক্রমে জল শুকাইয়া গিয়াছে। স্বামীজী বলিলেন ঃ এই সময় যে-সকল কাশ্মীরবাসী আর্য উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা উহাকে বিষ্ণুর বরাহ অবতার কল্পনা করিয়া গল্পাকারে ধর্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীনগর হইতে ১,০০০ ফিট নিম্নে অবস্থিত বলিয়া বরামূলাতে শীত অনেক কম। সেইজন্য শীতকালে অনেকে শ্রীনগর ও গুলমার্গ ছাড়িয়া এইস্থানে আসিয়া বাস করেন। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত যে পথটি আছে, এইস্থান হইতে তাহার দুইধারে অসংখ্য সফেদা বৃক্ষের (পপ্‌লার) সুন্দর শ্রেণী আছে। এত বড় তরুবীথিকা (এভেনিউ) কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ইহা লম্বায় ৩৪৷৷০ মাইল। বর্তমানে এই স্থানে বিতস্তা নদীতে খাল কাটিবার জন্য একটি অতিকায় বৈদ্যুতিক-কল বসানো হইয়াছে। এই শহর হইতে প্রত্যহ অসংখ্য নৌকা মাল বোঝাই হইয়া 'উলার হ্রদ' ও 'সাদিপুর' দিয়া শ্রীনগর যাইয়া থাকে।

আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে হইবে, কারণ সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই আজ শ্রীনগরে পৌঁছানো চাই, তাই পুনরায় আমরা বাসে চড়িয়া বসিলাম। বাস চলিতে লাগিল। পথটি কিছুদূর পাহাড়ের গা দিয়া গিয়া পরে একটি অধিত্যকার মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। পূর্বাভিমুখে ১৪ মাইল আসিয়া আমরা 'পাটান' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। গ্রামটিতে অসংখ্য 'চানার' গাছ ও ছোট ছোট মাঠ আছে। স্থানটির উচ্চতা ৫২২০ ফিট। এইস্থান হইতে 'নাংগা' পর্বতের দৃশ্য পূর্বাপেক্ষা স্পষ্টতর দেখাইতে লাগিল। এই গ্রাম হইতে শ্রীনগর আরও ১৮ মাইল। আমাদের বাস তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল, কারণ আর বেশী দেরী নাই। এইবার পথটি বরাবর সমতল ও অতি সুন্দর পার্বত্য-দৃশ্যপূর্ণ। পথের দুই ধারে অসংখ্য সফেদা (পপ্‌লার) গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে। সেইখান দিয়া আমাদের বাস সমতলভূমি পাইয়া খুব বেগে ছুটিতে লাগিল। এইস্থান হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত পথে আর পাহাড় নাই। এতক্ষণ কেবল পাহাড়ের উপর দিয়া ক্রমাগত আসিতে আসিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, এখন সমতলভূমিতে নামিয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ১৪ নম্বর মাইল-কাষ্ঠের নিকট একটি বন্যা খাল পার হইতে হইল। এইটি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। 'মিরগুণ্ড' নামক স্থানে অনেক ছোট ছোট ময়দান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। কাশ্মীর-রক্ষী 'ডোগরা' সৈন্যদল ইহার চারিদিকে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছে। ইহার এক মাইল দূরে ডানদিকে গুলমার্গ যাইবার আর একটি পথ গিয়াছে। ক্রমে আমরা দূর হইতে শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম ও দেখিতে দেখিতে শহরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর—মোটর পথে

রাওলপিণ্ডি—১,৭২০ ফিট

মাইল	২৬	ত্রেত ৪,০০০ ফিট											
,,	৩৭	১১	সানিব্যাঙ্ক ৬,০৫০ ফিট										
,,	৬৪	৩৮	২৭	কোহালা ১,৮৮০ ফিট									
,,	৭৫	৪৯	৩৮	১১	দুলাই ২,০২৩ ফিট								
,,	৮৫	৫৯	৪৮	২১	১০	দোমেল ২,১৭১ ফিট							
,,	৯৯	৭৩	৬২	৩৫	২৪	১৪	গারি ২,৬২৮ ফিট						
,,	১১৫	৮৯	৭৮	৫১	৪০	৩০	১৬	চেনারি ৩,৪১৪ ফিট					
,,	১৩৩	১০৭	৯৬	৬৯	৫৮	৪৮	৩৪	১৮	উরি ৪,৩৭০ ফিট				
,,	১৪৬	১২০	১০৯	৮২	৭১	৬১	৪৭	৩১	১৩	রামপুর ৪,৮৩১ ফিট			
,,	১৬২	১৩৬	১২৫	৯৮	৮৭	৭৭	৬৩	৪৭	২৯	১৬	বরামূলা ৫,১৯৩ ফিট		
,,	১৭৮	১৫২	১৪১	১১৪	১০৩	৯৩	৭৯	৬৩	৪৫	৩২	১৬	পাটান ৫,২২০ ফিট	
,,	১৯৬	১৭০	১৫৯	১৩২	১২১	১১১	৯৭	৮১	৬৩	৫০	৩৪	১৮	শ্রীনগর ৫,২০০ ফিট

রাওলপিণ্ডি, 'ত্রেত', 'সানিব্যাঙ্ক' প্রভৃতি পড়াও-এর দূরত্ব ও সমুদ্রতট হইতে উচ্চতা এবং পরস্পর পড়াও-এর দূরত্ব প্রদর্শিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ভূস্বর্গ কাশ্মীর ॥

শ্রীনগর

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত এই সুবৃহৎ পথটি ১৯৮ মাইল দীর্ঘ। পৃথিবীতে এইরূপ সুবৃহৎ পার্বত্য-মোটরপথ অতি অল্প স্থানেই আছে। রাওলপিণ্ডি হইতে বরামূলা পর্যন্ত পথটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং বরামূলা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত পথটি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর স্বয়ং একখানি মোটরে সর্বপ্রথমে এই পথ দিয়া শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি গমন করিয়া ইহাতে যাতায়াতের সূচনা করেন। এই পথটিকে সুন্দর ও সহজগম্য করিতে মহারাজের বহু অর্থ ব্যয় ও বহু কুলির প্রাণনাশ হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় এই পথের প্রায় সকল স্থানই ধ্বসিয়া পড়ে ও অধিকাংশ সেতুই ভগ্ন হইয়া যায়। পুনরায় সেই সমস্ত স্থান ও সেতু সংস্কার করিতে এবং কতকগুলি নূতন-খাল, ঝোলানো সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ভবিষ্যতে আর যাহাতে বন্যায় কোন ক্ষতি করিতে না পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিতে মহারাজের পুনরায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

আমাদের বাস বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া 'আমিরা কদল' বা প্রথম সেতু পার হইয়া বিতস্তা নদীর পশ্চিমতীরে 'দি পাঞ্জাব মোটর কোম্পানি'র দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ১৮।১৯ জন পাণ্ডা আসিয়া আমাদের ঘেরাও করিল ও কি নাম, কি জাতি, বাড়ী কোথা, কাহার ছেলে প্রভৃতি প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমরা আমাদের বেলুড় মঠের পাণ্ডা সুদামাকে খুঁজিয়া লইলাম ও তাহার সাহায্যে ডাক্তার এ. মিত্রের বাংলা-পাঠশালায় মালপত্রসমেত যাইয়া উঠিলাম। এইস্থানের শিক্ষক উপেনবাবু আমাদিগকে সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীনগরের ভূতপূর্ব বিখ্যাত বাঙালী ডাক্তার এ. মিত্র মহাশয়ের বিধবা-পত্নী আমাদিগের বাসের জন্য পূর্ব হইতেই এই স্থানটি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপেনবাবু যখন কলিকাতা বাগবাজারে 'উদ্বোধন' অফিসে থাকিতেন তখন হইতেই আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। সেইজন্য এই সুদূর কাশ্মীর প্রদেশে সমস্ত অপরিচিতের মধ্যে পরিচিত তাঁহাকে পাইয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। এই পাঠশালার পার্শ্বের বাড়ীতে রসিকরঞ্জন ঘোষ মহাশয় সপরিবারে বাস করেন। সেখানে 'দি কাশ্মীর ট্রেডিং সিণ্ডিকেট' নামক তাঁহাদের একটি শাল আলোয়ানের বড় দোকান আছে। রসিকবাবু নিজ বাড়ীতে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। আমরা আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিলাম। সারা রাত্রি 'পিশু'র কামড়ে আমাদিগকে

অস্থির করিয়া তুলিল। এই পোকাগুলি এত ক্ষুদ্রাকৃতি যে, মশারির ছিদ্র দিয়াও অক্লেশে আসা-যাওয়া করিতে পারে। ইহারা অতিশয় চঞ্চল বলিয়া সহজে ইহাদিগকে মারাও যায় না। এগুলি অনেকটা আমাদের দেশের 'উকুনের' ন্যায়, তবে এগুলি কাঠের মেজে, আসবাবের ফাঁকে বাস করে ও দেখিতে লাল রং-এর। কাশ্মীরে অধিকাংশ বাড়ীই কাষ্ঠের নির্মিত সেইজন্য পিশুর প্রাদুর্ভাব সেখানে এত অধিক।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অনুরক্ত বন্ধু আলওয়ারের মহারাজা জয়সিংহ তার-যোগে কাশ্মীর মহারাজকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামীজী অমরনাথ-দর্শনে যাইতেছেন। পথে তাঁহার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় কাশ্মীর রাজসরকার হইতে যেন সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হয়। স্বামীজী শ্রীনগরে আসিয়াছেন শুনিয়া পরদিন কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিং স্বামীজীকে দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমরা ঐ গাড়ীতে রাজদর্শনে চলিলাম। যাইবার সময় স্বামীজীকে পাগড়ী বাঁধিতে হইল, ইহাই এ দেশের বিশেষ প্রথা। স্বামীজীর পাগড়ী বাঁধা অভ্যাস ছিল, তাই তিনি সহজেই বৃহৎ এক গেরুয়া পাগড়ী বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং গেরুয়া আলখাল্লা পরিধান করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইলেন। স্বামীজীর গাড়ী বিতস্তা নদী পার হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া যাইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম ও পথপ্রদর্শকের নির্দেশমত বৈঠকখানা ও কাছারিবাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে বিতস্তার সম্মুখে দ্বিতলের একটি বারান্দায়, যে-স্থানে স্বামীজীর বসিবার জন্য গালিচা পাতা হইয়াছিল, সেখানে আমরা আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কাশ্মীর স্টেটের সেক্রেটারী পণ্ডিত শ্রীজগৎরাম জু. মুতামিন্দ দরবার রায় বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীমনমোহনলাল লঙ্গর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ আসিয়া আমাদের নিকট উপবেশন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মহারাজা বাহাদুরও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ, খর্বকায় কৃশ। তাঁহার পরিধানে সাদা কাপড়ের একটি ইজার ও মস্তকে একটি অতি বৃহৎ পাগড়ী। দুইজন মাত্র ছোকরা এডিকঙ্ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর অতিশয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। কাশ্মীরের নানাস্থানে তাঁহার বহু সদানুষ্ঠান আছে এবং প্রত্যহ ১০০৮টি পদ্মফুল দিয়া তিনি গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। পূজার পরে পদ্মগুলি বিতস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেগুলি সারাদিন ধরিয়া নদীবক্ষে ভাসিতে থাকে ও জলের শোভাকে অতুলনীয় করিয়া তুলে।

মহারাজা বাহাদুর স্বামীজীর সহিত ধর্ম, আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারকার্য, বেলুড় মঠের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বহুবিধ জনহিতকর কার্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করিয়া বলিলেন ঃ "বহুদিন পূর্বে বিবেকানন্দ স্বামী ও নিবেদিতা আমার এখানে আসিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্বামী আমার হাত

দেখিয়াছিলেন।" এইরূপে প্রায় একঘন্টা কথাবার্তার পর মহারাজা বাহাদুর স্বামীজীকে, যে কয়দিন কাশ্মীরে থাকিবেন তাঁহার অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী সম্মত হইলে মহারাজা স্টেট সেক্রেটারী মহাশয়কে স্বামীজীকে রাজ-অতিথি (স্টেট-গেস্ট) করিয়া লইবার জন্য আদেশ করিলেন ও তাঁহার অমরনাথ-যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। আমরা বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

অমরনাথ-যাত্রার এখনও চারদিন বিলম্ব আছে, আবশ্যকীয় সমস্ত আয়োজন সরকারী তরফ হইতে হইবে জানিয়া স্বামীজী নিশ্চিন্ত মনে শহরতলিটি উত্তমরূপে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কাশ্মীর বলিতে সাধারণতঃ শ্রীনগরকেই বুঝাইয়া থাকে। পূর্বে কাশ্মীরের রাজধানী ছিল 'পুরাধিষ্ঠান' বা বর্তমান 'পাণ্ডার্থান'। উহা শ্রীনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। 'রাজতরঙ্গিণী'-তে ঐ স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০ অব্দে নির্মিত 'ভীম-স্বামিন্' ও 'বর্ধমনেশ' মহাদেবের মন্দিরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১]; অতএব উহা যে অতি প্রাচীন শহর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন ঐ প্রাচীন স্থানের একটি মাত্র অতি পুরাতন প্রস্তরনির্মিত শিবমন্দির অবশিষ্ট আছে। উহার পাথরগুলি জোড়ে জোড়ে মিলাইয়া বসানো, কোনপ্রকার মশলা ব্যবহারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরটি ৯১৩—২১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ 'পার্থে'-র নির্মিত। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী 'মেরু'-র নাম হইতে ঐ শিবের নাম 'মেরু-বর্ধনস্বামী' রাখা হয়। রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেনের সময় পর্যন্ত (৪২১ খ্রীঃ) এই রাজধানীটি নদীর বাম দিকে অবস্থিত ছিল। তিনিই উহাকে দক্ষিণ দিকে উঠাইয়া লইয়া আসেন। কহ্লন মিশ্র বলেন ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে সম্রাট অশোক এই শ্রীনগর শহরটির প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে পাণ্ড্রেনাথানের ধ্বংসাবশেষ আছে। পরে রাজা অভিমন্যুর সময় (৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ) হইতেই ইহা প্রকৃত রাজধানীরূপে পরিণত হয়। অশোক-নির্মিত শ্রীনগর—বর্তমান শ্রীনগরের পূর্বাংশে, এখন যে-স্থানটিকে 'গেপ' (আইতগঞ্জ) বলে, সেইস্থানে ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজা প্রবর সেন দ্বিতীয়, হরিপর্বতের নিকট নূতন রাজধানী প্রবরপুর স্থাপন করেন। তিনি বিতস্তা নদীর উপর নৌ-সেতু এবং বহু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট গোপাদিত্যের রাজধানী গুপকারে ছিল। গুপকারের প্রকৃত নাম 'গোপগৃহ'। এখন এইস্থানে ইংরেজেরা বাস করেন। এখানে কয়েকটি বড় বড় আঙুরের ক্ষেত ও সাহেবদের মদের ভাঁটিখানা আছে। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে পরপৃষ্ঠায় রাজাদের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

১। রাজতরঙ্গিণী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১২৩।

সময়	রাজাদের নাম	কীর্তি
খ্রীষ্টপূর্ব (বি. সি.) ৩য় শতাব্দী	সম্রাট অশোক	বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও শ্রীনগর শহর প্রতিষ্ঠা করেন।
খ্রীষ্টপূর্ব (বি. সি.) ২য় শতাব্দী	হুস্ক, যুস্ক ও কনিষ্ক	বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তুরস্ক দেশীয় শাসকত্রয়।
খ্রীষ্টীয় (এ. ডি.) ৬ষ্ঠ শতাব্দী	মিহিরকুল	হুনদেশীয় শাসনকর্তা। ইঁহার রাজ্য মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
,,	গোপাদিত্য	শঙ্করাচার্য পর্বত ও গোপগৃহে বহু মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
,,	মাতৃগুপ্ত	ইঁহার সময় কাশ্মীররাজ্য উজ্জয়িনী রাজ্যের অধীন হয়।
,,	প্রবর সেন (দ্বিতীয়)	হরি-পর্বতের নিকট নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ৭ম শতাব্দী	দুর্লভ বর্ধন	ইনি সমগ্র পাঞ্জাবরাজ্য জয় করেন ও ইঁহার সময় বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হুয়েন সাঙ্ কাশ্মীর আগমন করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ৬৯৯-৭৩৫	ললিতাদিত্য	ইনি তুর্কিগণকে পরাজিত করেন, তিব্বতীয়গণকে 'বাল্‌তিস্থান' হইতে তাড়াইয়া দেন, 'মার্তণ্ড' শহর প্রতিষ্ঠিত করেন, ও সেখানকার সূর্য-মন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী ও খাল নির্মাণ করেন এবং 'জয়পীদ' নামক রাজার দ্বারা 'জয়পুর' শহর প্রতিষ্ঠিত করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ৮৫৫-৮৮৩	অবন্তি বর্মণ	নদীর উপর বাঁধ রচনা ও বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ৮৮৩-৯০৩	শঙ্কর বর্মণ	হৃত রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ৯২৮-৯৩৭	চক্র বর্মণ	ইঁহার অধীনস্থ জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়।
খ্রীষ্টাব্দ ৯৫০-১০০৩	রাণী দিদ্দা (অন্যনাম—দীক্ষা)	একজন লোহার জাতীয় কৃষককে বিবাহ করেন ; উহা হইতে নূতন রাজবংশের উদ্ভব হয়।
খ্রীষ্টাব্দ ১০৮৯-১১০১	হর্ষ	অশেষ গুণান্বিত কিন্তু অত্যাচারী। অল্পদিনে নিহত হন।

সময়	রাজাদের নাম	কীর্তি
খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৯	শাহমীর	প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা। ইঁহার সময় সেকেন্দার বুৎসিকন্ত অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ১৪২০-১৪৭০	জৈন উল-আব্দীন	বিদ্যাশিক্ষা পোষণ করিতেন। ইঁহার রাজত্ব সমৃদ্ধিশালী। ইঁহার সময়ে এখানে বহু হিন্দুর পুনর্বসতি হইয়াছিল।
খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩২	মির্জা হাইদার	উত্তর দিক হইতে আসিয়া কাশ্মীর জয় করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮৬	সম্রাট আকবর	কাশ্মীর জয় করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ১৬০০	সম্রাট জাহাঙ্গীর	কাশ্মীরে আচ্ছিবল, ভেরিনাগ, সালেমারবাগ, চশমাশাই নামক স্থানে ও জম্মুর পথে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে অতুলনীয় শোভাময় বহু বাগানবাড়ী নির্মাণ করেন। ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ও শ্বশুর আসফ্ খাঁও কাশ্মীরে 'নিসাতবাগ' নামক অতুলনীয় বাগানবাড়ীটি নির্মাণ করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫২	পাঠান রাজত্ব	কাশ্মীর রাজ্য কাবুলের অধীন হয়।
খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৯	দেওয়ান চাঁদ	শিখগণ কাশ্মীর অধিকার করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৩	কর্ণেল মিঞা সিং	রাজ্যে সমৃদ্ধি স্থাপন করেন।
খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৩	গুলাব সিং	বর্তমান কাশ্মীর মহারাজের স্বর্গীয় পিতামহ। ইংরাজদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ইনি কাশ্মীরের রাজত্ব লাভ করেন। ইনি পশ্চিম তিব্বত জয় করেন।

যে কাশ্মীরকে কবিগণ একবাক্যে ভূ-স্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন শ্রীনগর তাহারই প্রধান শহর, অতএব ইহা যে অতি সৌন্দর্যময়ী নগরী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীতে এরূপ মনোমুগ্ধকর স্থান আর দ্বিতীয় নাই। শহরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া বিতস্তা নদী মৃদুগতিতে প্রবাহিত। সারা শহরটিতে ইহার উপর মোট সাতটি সেতু আছে। প্রথম ও দ্বিতীয়টি আধুনিক ; বাকী পাঁচটি পুরাতন কাশ্মীর ঢঙে প্রস্তুত।

প্রথম সেতুটির নাম 'আমিরা' বা 'প্রতাপ সিং কদল'
দ্বিতীয় সেতুটির নাম 'হাওয়া কদল'
তৃতীয় সেতুটির নাম 'ফতে কদল'
চতুর্থ সেতুটির নাম 'জিনা কদল'
পঞ্চম সেতুটির নাম 'আলি কদল'
ষষ্ঠ সেতুটির নাম 'নয়া কদল'
সপ্তম সেতুটির নাম 'সফ্ফর কদল'

কাশ্মীরে সেতুকে 'কদল' বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেতুর মধ্যবর্তী স্থানকে শহরের উৎকৃষ্ট অংশ, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সেতু পর্যন্ত স্থানকে মধ্যম ও চতুর্থ হইতে সপ্তম সেতু পর্যন্ত স্থানকে শহরের নিকৃষ্ট অংশ বলা যাইতে পারে। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় সেতুর মধ্যবর্তী স্থানেই রাজপ্রাসাদ, বাজার, যাদুঘর, হাসপাতাল, ডাক ও তার ঘর এবং কাছারী প্রভৃতি অবস্থিত। তৃতীয় হইতে পঞ্চম সেতুর নিকটবর্তী স্থানে দেশীয় লোকদের বাস ও শাল, আলোয়ানের কারখানাসকল আছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম সেতুর দিকে লোকালয় ক্রমশঃ কম হইয়া আসিয়াছে ও বিশেষ কিছুই উল্লেখযোগ্য নাই।

প্রথম সেতুর নিকট 'হুজুরীবাগ' নামক একটি বড় মাঠ আছে। সেখানে প্রত্যহ বৈকালে ফুটবল খেলিবার জন্য স্কুল-কলেজের ছেলেরা একত্রিত হয় ও অনেক ভদ্রলোক এইস্থানে ভ্রমণে আসেন। প্রায় প্রত্যহই এখানে কোন না কোন ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া থাকেন। নিকটেই 'আর্যসমাজ'-গৃহ। হুজুরীবাগ হইতে গুলমার্গের উচ্চশৃঙ্গ পর্বতমালা দেখিতে অতি সুন্দর। এই মাঠের পার্শ্বেই সরকারী হাসপাতাল। আরও দুইটি হাসপাতাল এই শহরে আছে। একটি মুন্সীবাগের নিকট, তাহার নাম 'মিশন হস্পিটাল' ও অপরটি ঠিক শহরের মধ্যস্থলে, চতুর্থ সেতুর নিকট 'মহারাজগঞ্জে'। কাশ্মীরে দুই প্রকার ডাকঘর আছে। এক প্রকার ইংরাজ গভর্নমেন্টের, যেমন সকল দেশে আছে, আর এক প্রকার কাশ্মীর সরকারের। ইহার দ্বারা কেবল কাশ্মীর রাজ্যের ভিতরেই সংবাদ আদান-প্রদান চলিতে পারে,—কাশ্মীরের বাহিরে চলে না। বিতস্তা নদীর অপর পারে ইংরাজি ডাকঘরের সম্মুখে 'প্রতাপ সিং কলেজ' নামক একটি কলেজ অবস্থিত। এত বড় কলেজ কাশ্মীরে আর নাই। ইহার অদূরেই 'নেদু এ্যাণ্ড সন্স'-এর সর্বোৎকৃষ্ট হোটেল, ইউরোপীয় অসংখ্য নরনারী এই স্থানে বাস করেন। ইহার নিকট বহুদূর বিস্তৃত শ্রীনগরের সুন্দর পোলো খেলার মাঠ। শহরের পূর্বাংশে 'শঙ্করাচার্য' বা 'তখত্-ই-সুলেমান' নামক একটি ৬২০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর শঙ্করাচার্য-স্থাপিত একটি মঠ আছে। মঠটিতে স্থায়ীভাবে কোন সাধু বাস করেন না। উপরে উঠিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি আছে। তাহা দ্বারা আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছানো যায়। উপর হইতে কাশ্মীরের দৃশ্য দেখিতে অতি

সুন্দর ও বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। এই পর্বতটির উপরে সম্রাট অশোকের পুত্র জালক (২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) সর্বপ্রথম একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা গোপাদিত্য উহাকে জ্যেষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পরিণত করেন এবং তথায় একটি স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষোক্ত মন্দিরটির কোন কোন অংশের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্বতের নিম্নে সোনারবাগ, মুন্সীবাগ, কুঠিবাগ, হরিসিং ও সেখবাগ নামক পাহাড়গুলি যথাক্রমে অবস্থিত। মুন্সীবাগে বড় বড় কুঠিওয়ালাদের ও সাহেবদের দোকান এবং ব্যাঙ্ক আছে। নানাপ্রকার দেশী ও বিদেশী পণ্যদ্রব্য এই স্থানে কিনিতে পাওয়া যায়। সেখবাগের বিপরীত দিকে বিতস্তার অপর পারে 'লালমুণ্ডি' নামক ঘাট। এই স্থানে শ্রীনগরের যাদুঘর (মিউজিয়াম) অবস্থিত। অনেক প্রাচীন শাল, আলোয়ান, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন অস্ত্র প্রভৃতি এইস্থানে সংরক্ষিত আছে। ইহার নিকটেই কাশ্মীরের রাজ-অতিথিদের বাসগৃহ। এক্ষণে লাহোরের জজ্ শ্রীসাদিলাল মহাশয় এই স্থানে রাজ-অতিথিভাবে বাস করিতেছেন। শহরের দক্ষিণে 'শুপিয়ান' নামক পাড়ায় রাজকুমার হরি সিং বাহাদুরের রেশমের অতি বৃহৎ কারখানা। এরূপ বৃহৎ রেশমের কারখানা ভারতবর্ষে আর নাই। কাশ্মীরে অন্য কেহ এই ব্যবসায় করিতে পারে না। ইহা তাঁহার একচেটিয়া। প্রায় ৪০০০ স্ত্রী, পুরুষ ও বালক এই কলে নিযুক্ত আছে। ইহাদের বেতন দৈনিক চার আনা হইতে আট আনা পর্যন্ত। প্রায় ১৫০,০০০ স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা প্রত্যেক বৎসর কারখানা হইতে গুটিপোকার ডিম লইয়া কাশ্মীরের উপত্যকাসমূহের জঙ্গলে যেসকল তুঁতবন আছে তাহাতে ইহা চাষ করে এবং রেশমের জন্য গুটিপোকা সংগ্রহ করিয়া এই কলে যোগান দেয় ও এইপ্রকারে প্রায় ৫.৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। এই কারখানার অল্প দূরেই ডোগরা-বংশীয় মহারাজা গুলাব সিং-এর সমাধিমন্দির অবস্থিত। এইস্থানের নিকটেই রামবাগ রোডে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দের 'নারায়ণ মঠ'। মঠাধ্যক্ষ এই স্বামীজী বাঙালী। ইনি কাশ্মীরে প্রায় দুই বিঘা জমি ক্রয় করিয়া ২২ বৎসর যাবৎ মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মঠে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিয়া থাকেন। অসংখ্য মেওয়ার গাছ মঠের উদ্যানে সযত্নে রোপিত আছে। এই সকল বৃক্ষে প্রচুর ফল জন্মায়। আমরা এই মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। নাক, সেও, আপেল, আলু-বখেরা প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে তুলিয়া খাইতে লাগিলাম।

শ্রীনগর শহর ৫,২০০ ফিট উচ্চ। জুলাই ও আগষ্ট মাসে এইস্থানে খুব গরম পড়ে, কিন্তু বসন্ত ও হেমন্তকালে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই কম থাকাতে এই স্থানটি অতি রমণীয় হইয়া উঠে। সমগ্র শহরে প্রায় ১২০,০০০ লোকের বাস, লোকসংখ্যার বারো আনা অংশই মুসলমান। প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে শহরের অনেক অংশ নষ্ট হইয়া যায়। পুরাতন রাজপ্রাসাদটিও ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। বর্তমান

রাজপ্রাসাদটির ঠিক নিম্নেই বিতস্তা নদী মৃদুগতিতে প্রবাহিত। সন্ধ্যাকালে বিতস্তার উপর 'শিকারা' (চেপ্টা নৌকা) করিয়া বেড়ানো অতি আরামদায়ক। স্বামীজী একখানি শিকারা ভাড়া করিয়া নদীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। দুই পার্শ্বে তিন-চারিতলা উচ্চ কাঠের বাড়ীগুলি বিদেশীর চক্ষে অতি সুন্দর দেখায়। বাড়ীগুলির ছাদের উপর ঘাস ও ফুলগাছ পুঁতিয়া রাখা কাশ্মীরীদের প্রাচীন প্রথা। দুই ধারের ঘাটে অসংখ্য কাশ্মীরী নরনারী ও বালক-বালিকা স্নান করিতেছে। তাহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অঙ্গে একটি করিয়া সাদা আলখাল্লা (ফেরাঙ্গ) প্রাচীন আর্যজাতির পোশাকের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দ্বিতীয় সেতুর নিকট, এখন যেস্থানে 'মালায়র ঘাট' অবস্থিত, পূর্বে সেইস্থানে রাজা সমধিমতের দ্বারা (খ্রীঃপূঃ ৫০ অব্দে) প্রতিষ্ঠিত 'তার্দ-মনেশ' নামক দেবমন্দির ছিল ; পার্শ্বে একটি শ্মশানঘাট এবং 'মায়াসুম' নামক একটি সুবৃহৎ দ্বীপ ছিল। এখন ঐ স্থানে ইংরেজপল্লী হইয়াছে। যেস্থান এখন 'দ্রোগজান' নামে অভিহিত পূর্বে সেই স্থানকে 'দুর্গাগলিকা' এবং 'বোচওয়ারা' নামক স্থানকে 'ভুকর্সিবাটিকা' বলা হইত। এই দুর্গাগলিকা নামক স্থানেই অন্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। নদীতীরে 'সা হামাদন' মসজিদটির দৃশ্য অতি সুন্দর, ইহা আগাগোড়া কাষ্ঠনির্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্যখচিত। নিকটেই আর একটি সুন্দর মসজিদ রহিয়াছে, উহা প্রস্তর-নির্মিত বলিয়া উহাকে 'পাথর মসজিদ' কহে। সাম্রাজ্ঞী নূরমহল উহার স্থাপয়িত্রী। চতুর্থ সেতুর নিকট জৈন উল-আব্দীনের বিখ্যাত গোরস্থান অবস্থিত। ইহা ইষ্টক-নির্মিত। একখানা পাথরে পালি ভাষায় লিখিত বিবরণ এইস্থানে আছে। পর্যটক রেভারেণ্ড ডক্টর অ্যাবট উহা আবিষ্কার করেন। নিকটেই 'মহারাজগঞ্জ'-এর বৃহৎ বাজার। সমগ্র শ্রীনগরে একমাত্র এইস্থানেই মৎস্য বিক্রয় হয়। এইস্থান হইতে ১০ মিনিটের পথ যাইলে বিখ্যাত 'জুম্মা মসজিদ' দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ সেতুর মাঝামাঝি স্থানে 'পাপিয়ে মাসী' (কাগজের আসবাব), 'চাপ্লী' জুতা, শাল ও আলোয়ান প্রভৃতি কাশ্মীরী শিল্পের কয়েকটি বড় বড় দোকান আছে। নদী দিয়া যাইতে যাইতে এইস্থানের উভয় তীরে অসংখ্য বিজ্ঞাপন, দোকানের নাম ও সাইনবোর্ড দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকে একটি সুন্দর মন্দির রহিয়াছে। ইহা পণ্ডিত রামজ নামক শ্রীনগরের জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ; ষষ্ঠ সেতুর নিকট নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। চারিদিকে পাহাড়। সম্মুখে একটি মুসলমানগণের 'এদ্গা', ডাফরিন হসপিটাল এবং ইয়ার্কান্দিগণের সরাই। হেমন্তকালে যখন কারাকোরাম পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া মধ্য এশিয়াবাসী ইয়ার্কান্দিগণ 'চামরি গাই' বা গরুর পিঠে চরস ও নামদার বোঝা চাপাইয়া ব্যবসায়ের জন্য শ্রীনগরে আসে, তখন তাহারা এইসকল সরাইয়ে বাস করে এবং শীতের শেষে যখন বরফ গলিয়া পার্বত্য পথসকল উন্মুক্ত হয় তখন স্বদেশে ফিরিয়া যায়। এইস্থানের অল্প দূরেই শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি যাইবার

পথটি অবস্থিত। আমরা নদীবক্ষ হইতে উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রথম সেতুর নিকট রাজপ্রাসাদের বিপরীত দিকে বিতস্তা নদী হইতে একটি খাল বাহির হইয়াছে, উহা বরাবর গৌকদল ও চানারবাগের মধ্য দিয়া দাল হ্রদে যাইয়া পড়িয়াছে। চানারবাগের নিকট খালের উপর বহু সাহেব-মেম ও দেশীয় ভ্রমণকারী হাউস-বোটে গ্রীষ্মবাস করেন। স্থানটিতে এত অধিক চানার বৃক্ষ যে, তাহা হইতেই এই স্থানটি ঐ প্রকার উপাধি লাভ করিয়াছে। এই জায়গাটি খুব ছায়া-শীতল ও মনোহর দৃশ্যপূর্ণ কিন্তু বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। এইখানে যথেষ্ট মশা আছে। দাল হ্রদ ও এই খালটির সংযোগস্থলে মহারাজ গুলাব সিংহ নির্মিত একটি বন্যা ফাটক (ফ্লাড্ গেট) আছে ; উহাকে 'দাল দরোয়াজা' বলে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে হ্রদের জল খালে আসিতে পারে না। বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শ্রীনগরের নানা স্থানে এই প্রকার ফাটক আছে। ১৮৯৩ ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় শহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া এই সকল ফাটক নির্মিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য-পাহাড়ের দিক দিয়া আর একটি খাল বিতস্তা হইতে 'দাল' পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহাকে 'মারখাল' বলে। ইহার উৎপত্তিস্থলের নিকট দিলদার-খাঁ-বাগে একটি সরকারী স্কুল অবস্থিত। ইহার গৃহগুলি ছোট ছোট এবং ইট ও কাঠ দিয়া কাশ্মীরী ঢঙে প্রস্তুত। খালটিতে অনেক সেতু ও কয়েকটি পাথর-বাঁধানো ঘাট আছে। ইহার জল অতি অপরিষ্কার। যে-স্থানে খালটি শেষ হইয়াছে তাহাকে 'আঞ্চার' বলে। এই স্থানে একদিক দিয়া সিন্ধুনদ ও গন্ধরবল যাইবার জলপথ আছে। পথ বরাবর 'দাল'-হ্রদের দল ও পানাপূর্ণ জলের উপর দিয়া গিয়াছে। এইস্থানে একটি 'ঈদগাহ' অবস্থিত। ইহার সম্মুখের ময়দানটিতে মেলা হয়। অপর পার্শ্বে 'আলি মসজিদ' নামক একটি সুদৃশ্য প্রাচীন মসজিদ আছে। উহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

নিকটেই হরি-পর্বতের উপরস্থ প্রাচীন দুর্গ ও নিম্নস্থ জুম্মা মসজিদ দর্শনযোগ্য। মসজিদটি হরি-পর্বতের দক্ষিণে চতুর্থ সেতু (জিনা কদল) হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। ইহা ১৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। সুলতান সেকেন্দের শাহ্ নামক জনৈক শাসনকর্তা এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ইহা নষ্ট হইয়া গেলে সুলতান মহম্মদ শাহ্ ইহার পুনঃসংস্কার করেন। পুনরায় ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা অগ্নিতে বিনষ্ট হইলে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইহার উদ্ধার-সাধন করেন। কাশ্মীরে যে-সকল মুসলমান বাদশাহ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহাকে খুব যত্ন করিতেন। সম্রাট আকবর ইহার নিকট একটি শহর বসাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইস্থানের পুরা কাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে-স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত তাহার নিকট হরিপর্বতের দক্ষিণে রাজা দ্বিতীয় প্রবর সেনের স্থাপিত 'প্রবরেশ' নামক মহাদেবের একটি মন্দির ছিল। তিনি এইস্থানে একটি নূতন শহরও বসাইয়াছিলেন, তখন এইস্থানকে 'শারীতক' বলা হইত।

এইস্থানের উত্তরে একটি দুর্গাদেবীর, দক্ষিণে 'ভীম স্বামী' নামক গণেশের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'বিষ্ণুরণ স্বামী' নামক দেবতার মন্দির ছিল। রাজা রামাদিত্য শেষোক্ত মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থান হইতে যেসকল প্রাচীন দ্রব্য মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ডাঃ অ্যাবটের আবিষ্কৃত খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে লিখিত ব্রাহ্মী-অক্ষরে একটি প্রস্তরলিপি, গুপ্ত-অক্ষরে লিখিত রাজা প্রবর সেনের মুদ্রা এবং সারদা অক্ষরে লিখিত রাজা অবন্তী বর্মার (৮৫৫-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর যাদুঘরে ঐ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যগুলি রক্ষিত আছে।

হরি-পর্বতের উপর অবস্থিত দুর্গটি দেখিতে হইলে শ্রীনগরের মুতাবিদ্ দরবারের দপ্তর হইতে অনুমতিপত্র আনিতে হয়। ৪০০ ফিট উর্ধ্বে পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। ইহা প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণের মঠ ছিল। পরে আকবর বাদশাহ ইহাকে দুর্গরূপে পরিণত করেন। এখন এইস্থানে কাশ্মীরের মহারাজার কয়েকজন সিপাহী, কয়েকটি বন্দুক ও তোপ আছে।

হরি-পর্বতের উপর হইতে নামিয়া স্বামীজী ইহার পাদদেশে অবস্থিত 'খানা ইয়ারী' নামক বস্তিতে যীশুখ্রীষ্টের সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে গেলেন। স্থানীয় মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের পয়গম্বর ঈশা স্বদেশে শত্রুর তাড়নায় কয়েকজন সহচরের সহিত গুপ্তভাবে এইস্থানে পলাইয়া আসিয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাস করেন ও শেষে তাঁহার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণ এইস্থানে তাঁহাকে সমাহিত করেন। সমাধি-মন্দিরের ভিতরটিতে অতি পবিত্র ভাব বর্তমান। দেওয়ালের মধ্যস্থিত একটি সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে দিব্য গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহাকে ঈশা পয়গম্বরের অলৌকিক শক্তি বলিয়া মনে করেন। এইস্থানে অনেকে রোগ আরাম হইবার জন্য 'হত্তা' দিয়া থাকেন। অনেকে বলেন, ভগবান যীশু কাবুলের পথে কাশ্মীরে আসিবার সময়ে যে পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুইয়া জলপান করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহাকে 'ইউসুফ তালাও' বলে। এই সমাধিস্থানের মুসলমানগণ বলিলেন : 'তারিখ্-ই-আঝাম' নামক আরবী কেতাবে উক্ত বিষয়টি বর্ণিত আছে। বাল্যকালে পশ্চিম তিব্বতের 'হিমিস মঠে' আগমন, জগন্নাথধামে ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে-সমস্ত কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, এইস্থান দেখিয়া সেগুলি সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 'যীশুর অপ্রকাশিত জীবন-কাহিনী' সম্বন্ধে রুশ-দেশীয় পর্যটক ডক্টর নিকোলাস নটোভিচের বিখ্যাত ইংরাজী পুস্তকে যীশুর তিব্বত আগমন সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার ঐ পুস্তক সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। স্বামীজী বলিলেন : "যীশুর জীবনের যে অংশের কোন তথ্যই পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষে অনুসন্ধান করিলে তাহার অনেক কিছুই পাওয়া

যাইতে পারে।" এ-স্থানের কয়েকখানি ফটো তুলিবার পর স্বামীজী এইস্থান হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্তী 'রাণা বাড়ী'[২] নামক পাড়ায় অবস্থিত বিবেকানন্দ পাঠাগারটি দেখিতে গেলেন।

এইস্থানের কয়েকজন সভ্য ও ডাক্তার শ্রীরাম আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। পাঠাগারটি একতলায়, একেবারে খালের তীরেই শান-বাঁধানো ঘাটের উপর অবস্থিত। ঘরটি বেশ বড়, প্রায় ২২।২৫ হাত লম্বা। সমস্ত পুস্তক তিনটি আলমারীতে সংগৃহীত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় সমস্ত পুস্তকই এই গ্রন্থাগারে আছে। একটি টেবিল, দুইখানি চেয়ার ও শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদের কয়েকখানি ছবি দেওয়ালে টাঙানো। স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা প্রত্যহ বৈকালে এখানে একত্রিত হয় এবং শনিবার ও রবিবার বক্তৃতাদি করে। ডাক্তার শ্রীরাম ইহাদের মধ্যে প্রধান কর্মী। ইনি খুব উদ্যোগী ভদ্রলোক এবং ইঁহার একটি 'বয়-স্কাউট'-এর দলও আছে। ইঁহার বাড়ী পাঞ্জাবে। শ্রীনগরে ইনি সপরিবারে বাস করেন ও ডাফরিন হাসপাতালে সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন-এর কার্য করেন। এইস্থানের সভ্যগণ স্বামী অভেদানন্দের বই পড়িয়া তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে স্বামীজী 'ছাত্রজীবনের কর্তব্য' ('ডিউটি অব দি স্টুডেন্ট-লাইফ') সম্বন্ধে একটি নীতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। এইস্থানের ভার লইয়া কাজ চালাইবার মতো উপযুক্ত একজন ত্যাগী কর্মী পাঠাইয়া দিবার জন্য ছাত্রেরা স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজীও চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর এইস্থান হইতে বিদায় লইয়া আমরা শিকারা চড়িয়া অন্যত্র চলিলাম।

এই স্থানের অল্প দূরেই 'ক্রনিয়াল' নামক পাড়ায় শিয়া-মুসলমানদের একটি মসজিদ দেখিতে পাইলাম, এই মসজিদে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ বিদ্রোহের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান আছে। ইহার উত্তরে শ্রীনগরের জেলখানা। সেখানে কয়েদীদের হাতে প্রস্তুত কাগজ, কার্পেট প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার কাছেই সরকারী কুষ্ঠ হাসপাতাল, সেই হাসপাতালে ১২০টি বেড আছে। ইহার সম্মুখস্থ ঘাটের নাম 'কুজিয়ারবল'। এইস্থান হইতে আর কিছুদূর গিয়া আমরা বিখ্যাত 'দাল' হ্রদে আসিয়া পৌঁছিলাম।

'দাল' হ্রদ উত্তর-দক্ষিণে ৫ মাইল ও পূর্ব-পশ্চিমে ২ মাইল দীর্ঘ। ইহার অনেক অংশ খুব দলপূর্ণ বলিয়া ইহার ঐ প্রকার নাম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে খুব স্বচ্ছ ও গভীর জল থাকিলেও ইহার অধিকাংশই অতিশয় জলজ উদ্ভিদ দলপূর্ণ ও অল্প জলবিশিষ্ট। ইহার পশ্চাতে ৪০০ ফিট উচ্চ কয়েকটি পর্বত অবস্থিত। এই হ্রদে অসংখ্য ভাসমান উদ্যান (ফ্লোটিং গার্ডেন) আছে। এগুলি কাশ্মীরের বিশেষ দর্শনীয় জিনিস। বাঁশ দিয়া দলগুলিকে একত্র করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর মাটি ফেলিয়া ভাসমান

২। এইস্থানের প্রাচীন নাম 'রজন-বাটিকা' ছিল।

উদ্যানগুলি নির্মিত হয়। এইসকল উদ্যানে তরমুজ, খোরমুজা ও সকল প্রকার শাক-সব্জী উৎপন্ন হয়। প্রয়োজন হইলে এইগুলিকে নৌকার পিছনে বাঁধিয়া অন্যত্র লওয়া চলে, নচেৎ সাধারণতঃ এইগুলি পাড়ে পাড়ে যেসকল উইলো গাছ রহিয়াছে তাহার সহিত বাঁধা থাকে। এই সকল উইলো গাছ হইতে হকি, ক্রিকেট প্রভৃতির ব্যাট হইয়া থাকে। ইহা কাশ্মীরের একটি লাভজনক ব্যবসা। হ্রদের ধারেই 'হজরৎবল' নামক একটি বৃহৎ মসজিদ অবস্থিত। এইস্থানে হজরৎ মহম্মদ সেল্লেল্লা আলেহেসেল্লামের দুইগাছি মাথার কেশ এবং মৎস্য, হংস, সর্প প্রভৃতি আকৃতিবিশিষ্ট বহু প্রস্তরের পাত্র রক্ষিত আছে। ঈদের সময় এইস্থানে একটি বৃহৎ মেলা বসে, শহরের প্রায় অর্ধেক লোক এই সময়ে এখানে সমবেত হয়। ইহার অল্প দূরেই 'নাসিমবাগ' নামক একটি সুন্দর উদ্যান অবস্থিত। সম্রাট আকবর এই সুন্দর বাগানটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইস্থানের অসংখ্য চানার-বৃক্ষপূর্ণ দৃশ্য অতি মনোহর।

এইস্থানের নিকটেই হ্রদবক্ষে 'স্বর্ণলঙ্কা'-নামক একটি সুন্দর দ্বীপ অবস্থিত। ইহা প্রায় ৮০ হাত দীর্ঘ। এইস্থান হইতে কাশ্মীরের বিখ্যাত 'সালিমারবাগ' নামক প্রায় এক মাইল দীর্ঘ বাদশাহী উদ্যান। আমরা সেখানে গমন করিলাম। কয়েকটি পর্বতের পাদদেশে একটি সুবৃহৎ ঢালু ভূমিখণ্ডে এই উদ্যানটি অবস্থিত। ভিতরে প্রায় ১০০ ফোয়ারা রহিয়াছে। পার্শ্বস্থিত পর্বতের ঝরণার ধারাকে লুক্কায়িতভাবে আনিয়া এরূপ কৌশলে এইসকল ফোয়ারার মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে যে, দেখিয়া তখনকার দিনের ইঞ্জিনিয়ারগণের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। উহার প্রবল জলরাশি ৬।৭টি বৃহৎ ও উচ্চ সিঁড়ি দিয়া জলপ্রপাতের ন্যায় পড়িয়া নিম্নস্থিত হ্রদে যাইয়া মিশিতেছে। শ্রীনগর হইতে মোটরকার বা টাঙ্গাযোগে স্থলপথেও এইস্থানে আসা যায়। অনেকে ঐরূপ আসিয়াছেন দেখিলাম। উদ্যানটির মধ্যে নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি আগাগোড়া কৃষ্ণ-পাথরের নির্মিত নানাবিধ কারুকার্যখচিত বিশ্রামাগার রহিয়াছে। ভিতরে ভদ্রমহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র মহল (জেনানা) বিদ্যমান। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর তদীয় মহিষী নূরজাহানের জন্য এই প্রমোদ-উদ্যানটি নির্মাণ করেন। এই মনোরম স্থানে আসিলে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হয় যে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপতা যে কি তাহা বাদশাহগণই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাত না পড়িলে আজ কাশ্মীরের এত শোভা হইত না।

ইহার অল্প দূরেই মোগল বাদশাহগণের আর একটি সখের বাগান-বাড়ী 'নিশাৎবাগ' অবস্থিত। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্বশুর ও প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর দ্বারা নির্মিত। ইহা সালেমারবাগ হইতে সৌন্দর্যে ও নির্মাণ-কৌশলে কোন অংশেই হীন নহে। অনেক প্রবাসী নরনারী এই স্থানে বনভোজন করিতে আসিয়াছেন দেখিলাম। যদি আজ ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য বর্তমান থাকিত, তবে কি আর সাধারণ

ভলেণ্টিয়ারের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকেন এবং দরিদ্র ও সন্ন্যাসীদিগকে খোরাকি, শীতবস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করেন। পথে যেসকল স্থানে দুগ্ধ, কাষ্ঠ, কুলি, ঘোড়া প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য, সেইসকল স্থানে ঐসব দ্রব্য সহজপ্রাপ্য করিয়া দিয়া ইঁহারা মহাপুণ্য সঞ্চয় করেন।

আইশমোকামে একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি মাঠে প্রায় ২০০ তাঁবুতে যাত্রীগণ বাস করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবু হইতে উনানের ধোঁয়া উঠিতেছে। প্রায় ৫০০ যাত্রী এই বৎসর অমরনাথ দর্শনে চলিয়াছেন। অন্য অন্য বার এত অধিক যাত্রী হয় না। একটি ক্ষুদ্র বজরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই দিন হইতে ক্রমাগত বারিবর্ষণ হইয়া অদ্য প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে। পুনরায় বৃষ্টি হইতে পারে। এই পথে বৃষ্টি হইলে যাত্রীদের খুব কষ্ট হয়। জ্বালানি কাষ্ঠ, মালপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সমস্তই ভিজিয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁবুগুলি ভিজিয়া এত ভারী হয় যে, সেইস্থান হইতে অন্যস্থানে লওয়ার পক্ষে বড় অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। রাস্তাগুলি বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। শ্রীনগর হইতে এই পর্যন্ত পথ বেশ চওড়া, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রায় ১০০ গজ স্থান জুড়িয়া পথে কাদার নদী হইয়া রহিয়াছে। সেইসকল স্থান মালপত্র ও ঘোড়াসহ অতিক্রম করিতে যাত্রীদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। আমাদের মোটর স্থানে স্থানে অচল হইয়া পড়িল, কাদার মধ্যে পিছনের চাকা বেগে ঘোরা সত্ত্বেও সম্মুখের চাকা আদৌ ঘুরিল না। শেষে কুলি দিয়া মোটর ঠেলাইয়া কাদা পার করিতে হইল।

চতুর্দিকের উচ্চ পর্বতমালা, নিম্নে নদী, সবুজ তৃণরাজিসমাবৃত সমতলভূমি ও অসংখ্য আখরোট, চানার প্রভৃতি বৃক্ষের অতুলনীয় সৌন্দর্য দেখিয়া আমরা এইস্থানের 'আইশমোকাম' বা 'বিশ্রামস্থান' নামের সার্থকতা অনুভব করিতে লাগিলাম। এইস্থানের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়া স্বামীজী আমাদিগকে বলিলেন : "কাশ্মীরকে কেবল ভূস্বর্গ বলিলে এইস্থানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়, কাশ্মীর প্রকৃতপক্ষে ভূস্বর্গের সমষ্টি।"

যাত্রীদের বাসস্থানের নিকটেই 'আইশমোকাম' গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামখানি ও অধিবাসীগণ সকলেই মুসলমান। বাড়ীগুলি কাষ্ঠনির্মিত ও প্রায়ই ক্ষুদ্র দ্বিতল। অধিকাংশ বাড়ীতেই বেড়া দিয়া ঘেরা শাকসব্জীর বাগান আছে, সেখানে ওলকপি, টম্যাটো প্রভৃতি গাছ হইয়াছে। গ্রাম হইতে বহু নরনারী যাত্রীগণকে দেখিতে ও দুগ্ধ, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। স্বামীজী গ্রামখানি দেখিতে গেলেন। সেখানকার একটি মসজিদে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা বসিয়াছে। মসজিদটি প্রাচীন। বহুদিন পূর্বে নূরউদ্দিন নামক কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত পীরের জৈনুদ্দীন নামক জনৈক শিষ্য এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার খুব অলৌকিক শক্তি ছিল। এইরূপ কথিত আছে, মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরে তাঁহার

শিষ্যেরা স্বপ্নে আদেশ পান যে, প্রভাতে যেস্থানে তাঁহার যষ্টি পাওয়া যাইবে সেইস্থানে তাঁহার নামে একটি মসজিদ যেন তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কারণে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে কিছু দূরে হাপৎনাগে একটি তামার খনি রহিয়াছে। স্বামীজী উহা দেখিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা এক ছাদযুক্ত তাঁবু সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাদের সমস্ত আসবাব ভিজিয়া গিয়াছিল। আমাদের উভয় তাঁবুই দুই ছাদযুক্ত ছিল, সেইজন্য বৃষ্টি আমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

প্রভাতে বৃষ্টি থামিলে মোটরখানিকে বিদায় দিয়া স্বামীজী ঝাম্পানে[১] এবং অন্যান্য সকলে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। সুদামা ও প্রসাদ জু আমাদের মালবাহী কুলি ও ঘোড়ার সঙ্গে থাকিল। অতুলবাবুর ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস ছিল না, সেইজন্য সহিস তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আমাদের দল হইতে অনেকটা পিছনে পড়িয়া গেলেন।

আমাদের অদ্যকার পড়াও 'পহেলগাঁও'। ঐস্থান আইশমোকাম হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথে কোন্ দিন কোন্ স্থান পর্যন্ত যাত্রীরা গমন করিবেন তাহা পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করা আছে, তজ্জন্য উহাকে 'পড়াও' কহে। সকল যাত্রীকে একসঙ্গে চলিতে হয়। 'ছড়ির' আগে কেহ যাইতে পারে না। ইহাই এই তীর্থের নিয়ম। 'ছড়ি' সকলের পূর্বে রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় যাত্রা করে, তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীরা যখন ইচ্ছা যাইতে থাকে। মোটাসোটা ও অস্ত্রশস্ত্রসহ একদল সাধু পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যান, ইঁহাদিগকেই 'ছড়ি' বলে। পূর্বে যে-সকল সাধু এই তীর্থে বাস করিতেন, তাঁহারাই পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যাইতেন, সেই কারণে এই তীর্থের এই প্রকার রীতি হইয়াছে। অরণ্যময় পার্বত্যপথে চড়াই-উৎরাই করিতে করিতে মহানন্দে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম ; ক্রমে আইশমোকাম হইতে ছয় মাইল আসিয়া আমরা 'বাটকোট' নামক একটি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটি ক্ষুদ্র এবং পথের উভয় ধারেই অবস্থিত। স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চারিদিকে পর্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত। শ্রীনগর হইতে মোটর বা টাঙ্গাযোগে এই পর্যন্ত আসা চলে, কিন্তু এইস্থানের পর হইতে পথে সামান্য চড়াই-উৎরাই থাকাতে পহেলগাঁও পর্যন্ত মোটর বা টাঙ্গা যাইতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে এই অসুবিধা না হয় ও মোটর টাঙ্গা প্রভৃতি বরাবর 'পহেলগাঁও' পর্যন্ত অক্লেশে যাতায়াত করিতে পারে তদুপযোগী করিয়া পথটিকে প্রস্তুত করা হইতেছে। শীঘ্রই শেষ হইবে। এইস্থান হইতে অল্প দূরে একটি চড়াই অতিক্রম করিতেই আমরা 'গণেশবল' তীর্থে উপস্থিত হইলাম, যাত্রীরা সকলেই এইস্থানে স্নানাদি করিয়া গণেশ ঠাকুরকে দর্শন ও পূজা করিলেন। পাণ্ডা সুদামা বলিল : "গণেশজীকে পূজা করিয়া না গেলে

১। এদেশে ডাণ্ডিকে 'ঝাম্পান' বলে।

রাখিলাম। ইতিপূর্বে প্রায় ১০০টি তাঁবু এইস্থানে পড়িয়াছে। ক্রমে অপর যাত্রীরাও আসিতে লাগিল। উপেনবাবু অনেক দেরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। পাছে পড়িয়া যান, এই ভয়ে তিনি একটি বৃদ্ধ ঘোড়া বাছিয়া লইয়াছেন। ঘোড়াটির পিছনের একটি পা অপর তিনটি অপেক্ষা কিছু বেশী লম্বা, তাই খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া সারা পথ আসিতে এত বিলম্ব হইল। তিনি 'ধর্মার্থ-বিভাগ' হইতে ঐ ঘোড়াটি পরে বদলাইয়া লইয়াছিলেন।

আমাদের তাঁবুর নিকটেই একটি পাহাড়ের পাদদেশে বরফ জমিয়া রহিয়াছে দেখিয়া যাত্রীরা তাড়াতাড়ি সেখানে যাইতেছিল। অনেকে হিমালয়ে বরফ পড়ে এই কথা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু চোখে কখনও দেখে নাই, আজ তাহা দর্শন করিয়া, তাহার উপর বেড়াইয়া পরমানন্দে বরফ খাইতে লাগিল। স্বামীজী অল্প খাইয়া বলিলেন : "এ সব গ্লেসিয়ার-এর[২] বরফ খেতে নেই, খেলে 'হিল ডায়রিয়া' ও গলগণ্ড হয়।" যে স্থানটিতে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে তাহা একটি বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এইস্থানের চারিদিকেই পাহাড় এবং আখরোট, ভূর্জপত্র প্রভৃতির জঙ্গল। নিকটেই একটি পার্বত্য নদী পাথরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। আমরা কিছু ডাল ও পাতা সমেত কাঁচা আখরোট ও ভূর্জপত্রের ছাল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। আমাদের সরকারী তত্ত্বাবধায়ক বলিল : "রাত্রে এইস্থানে বন্য জন্তুর ভয় আছে।"

চন্দনবাড়ীতে রাত্রি বাস করিয়া আমরা পরদিন প্রভাতে 'বায়ু-ব্যজন' যাত্রা করিলাম, পথে 'পিশু' নামক একটি ১,৫০০ ফিট উচ্চ পর্বত চড়াই করিতে সকলকেই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। 'পিশু'-শব্দে একপ্রকার উকুন বুঝায়, তাহা হইতে অথবা 'পিসর'-শব্দ হইতে এই পর্বতের এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। 'পিসর' কাশ্মীরী শব্দ, ইহার অর্থ পিচ্ছিল। এই পর্বতে আরোহণ করিবার পথটি ঠিক ইংরেজি 'z' অক্ষরের ন্যায়। ঘোড়া বা ঝাম্পান চড়িয়া কেহ এই পর্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও ঊর্ধ্বমুখী। যিনি যে বাহনে আসিয়াছেন, তাহা হইতে নামিয়া সকলকেই পদব্রজে যাইতে হইল। এই পাহাড়ে আরোহণের সময় সকলে পশ্চাতে থাকিতে নাই, কারণ হঠাৎ যদি কোন ঘোড়া বা মাল পড়িয়া যায়, তাহা গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নিম্নে যাহারা থাকে তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। সূর্যের তেজ অধিক হইবার পূর্বেই পিশু চড়াই শেষ করা কর্তব্য, নচেৎ রৌদ্র প্রখর হইলে অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ হয়। চড়াই করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে বসিতে নাই, উহাতে উরুদেশ ভার বোধ হয় সুতরাং দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করাই ভাল। পকেটে কিশমিশ, শুষ্ক ডালিমের দানা, লেবু প্রভৃতি রাখিতে হয়, আরোহণ করিতে করিতে মুখ শুকাইলে জল না খাইয়া এই সকল চিবাইতে হয়। খালিপেটে পাহাড়ে চড়া বিপজ্জনক, ইহাতে পেটে খিল ধরিবার সম্ভাবনা। পেটে

২। বহুকাল হইতে যে বরফ জমিয়া আছে।

শক্ত কোমরবন্ধ (বেল্ট) থাকা খুব ভাল, পায়ে মোজার বদলে পট্টি ও তলায় কাঁটা-পেরেকযুক্ত জুতা এবং হাতে হিল-ষ্টিক (পাহাড়ে বেড়াইবার জন্য লাঠি) থাকা দরকার। পর্বতে আরোহণকালে কোন দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হইতে নাই, উহাতে পতনের সম্ভাবনা।

চড়াই শেষ করিয়া আমরা সর্বোচ্চ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে নিম্নের পর্বতারোহণকারী যাত্রীগণকে পাহাড়ের গায়ে পিপীলিকার সারির মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল। উপরে একটি মালভূমির (প্লেটো) উপর দিয়া অমরনাথ যাইবার পথ গিয়াছে। এইস্থানের দৃশ্য অতি মনোহর, অসংখ্য দেবদারু, রুদ্রাক্ষ, ভূর্জ প্রভৃতি বৃক্ষ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। এইস্থানের ঘন অম্লজানপূর্ণ সমীরণ (ওজোন) আমাদের সব পথশ্রান্তি মুহূর্তে দূর করিয়া দিল ও দেহে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিল। যাত্রীরা এইস্থানে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ঘোড়াগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য খুলিয়া দিলেন, কেহ মালপত্রগুলি ভাল করিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে লাগিলেন এবং কেহ বা জলযোগ করিতে লাগিলেন। পুরুষের ন্যায় সমান সামর্থ্যে যে সকল পাঞ্জাবী মহিলা শিশু ক্রোড়ে করিয়া পদব্রজে বা অশ্বারোহণে পর্বতের পর পর্বত অতিক্রম করিয়া এই কঠিন তীর্থে চলিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া আমরা বঙ্গ-মহিলাগণের সহিত ইঁহাদের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাত্রীদিগের মধ্যে তিনজন বাঙালী মহিলা কষ্ট সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হইলাম।

এইস্থান হইতে রওনা হইয়া আমরা বেলা দুই ঘটিকার সময় বায়ু-ব্যজনে আসিয়া উপনীত হইলাম। এইস্থানে সর্বদা প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত থাকায় ইহার উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। যাত্রীরা কাঁচা 'জুনিপার' গাছ জ্বালাইয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিলেন। এইস্থানে অন্য কোন প্রকার জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় না। ভিজা বা কাঁচা হইলেও জুনিপার গাছগুলি অল্প অগ্নিসংযোগেই বেশ জ্বলিয়া উঠে, ইহা শুকাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। কেহ কেহ অন্য প্রকার জ্বালানি কাঠও সঙ্গে আনিয়াছেন। সন্ধ্যায় অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও প্রবলবেগে ঝড় উঠিল। রাত্রে এরূপ ভীষণ শীত পড়িল যে, এই শ্রাবণ মাসকে আমাদের মাঘ মাস মনে হইতে লাগিল।

চন্দনবাড়ী হইতে জোজপাল পাঁচ মাইল মাত্র। এইস্থানের উচ্চতা ১১,৩০০ ফিট। এইস্থানের প্রায় ১০০০ ফিট নিম্ন দিয়া একটি পার্বত্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত। উহার উভয় তীরেই মার্গ বা মাঠ রহিয়াছে। ঐগুলি বরফের সেতু থাকিলে সহজেই অতিক্রম করা যায়। কিছুদূরে ভূর্জপত্র গাছের বনের মধ্যে কয়েকটি গুজরদের কুটীর রহিয়াছে। ইহারা সকলেই মুসলমান ও দেখিতে দৃঢ়কায় ও সুশ্রী। গোচারণই ইহাদের পেশা। এইস্থানের অল্প দূরে ৮০০ ফিট উচ্চ একটি চড়াই অতিক্রম করিলে সোনাসর নামক একটি সুন্দর হ্রদ দৃষ্ট হয়। হ্রদটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্বতমালা হইতে তুষার নদীসকল নামিয়া বারিরাশির সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

জোজপাল হইতে শেষনাগ মাত্র চার মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানের উচ্চতা ১২০০০ ফিট ; পথে আসিতে ৭০০ ফিট উচ্চ একটি খাড়া চড়াই পড়ে, তাহার পর হইতে পথ বেশ সরল ও সহজ। শেষনাগ একটি হ্রদের নাম। ইহা কলিকাতার হেদুয়ার ন্যায় বড়। ইহার দুই পার্শ্বে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা বর্তমান। ঐসকল পর্বতের গাত্রে পুঞ্জীকৃত ও চিরস্থায়ী তুষাররাশি (গ্লেসিয়ার) ইহার জল স্পর্শ করিয়াছে। হ্রদের জল উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ। হ্রদটির দৃশ্য উপরের পথ হইতে এরূপ সুন্দর দেখায় যে, ইহাকে স্বর্গের অপ্সরাদের স্নানের স্থান বলিয়া ভ্রম হয় ! যাত্রীরা কেহ কেহ নিম্নে যাইয়া এই হ্রদের জলে স্নান-তর্পণাদি করিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এই হ্রদের জলে স্নান করিলে সর্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। স্বামীজী এই হ্রদটি দেখিয়া বলিলেন, "দেখছ, চারদিকের পাহাড় থেকে কি রকম গ্লেসিয়ার (তুষার নদী) নেমেছে ? ঐ থেকে আমাদের শাস্ত্রে মহাদেবের জটার কল্পনা হয়েছে, চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রিচূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর ঐ তুষারনদী হচ্ছে তাঁর জটা"। এই হ্রদের দক্ষিণে কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গের পশ্চাতে বিখ্যাত কোহিনুর-পর্বতটি সুন্দর দেখা যাইতেছে।

পরদিবস আমাদের পড়াও পঞ্চতরণী, শেষনাগ হইতে ঐস্থান এগারো মাইল। পথে একটি ১৪,০০০ ফিট উচ্চ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হইল। পথটি অত্যন্ত কঠিন। এই পথে ২।১টি শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারী ছাড়া বৎসরের ৩৬৫ দিন কেহই চলাচল করে না ; কেবল শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন অমরনাথ দর্শন উপলক্ষে ইহা সরকারী তরফ হইতে কয়েকদিনের জন্য যথাসম্ভব মনুষ্য-গমনোপযোগী করা হয়। তথাপি ক্রমাগত পাহাড় চড়াইয়ের যে স্বাভাবিক কষ্ট তাহা কে নিবারণ করিতে পারে ? এই উচ্চ পথ হইতে চারিদিকে যেসকল চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি সূর্যকিরণে তীব্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং সর্বদা সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, সেইজন্য চক্ষে সবুজ চশমা রাখা সকলের কর্তব্য। পথে পর্বতগাত্রে স্থানে স্থানে মরসুমী ফুল (সিজ্‌নফ্লাওয়ার) ফুটিয়া রহিয়াছে। কত প্রকার বর্ণ, আকৃতি ও জাতির যে ফুল তথায় রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। কোথাও আগাগোড়া পাহাড়টিই ফুল দিয়া মোড়া, ঠিক যেন একটি নানাবর্ণে চিত্রিত বৃহৎ সূচীশিল্প। প্রত্যেক ফুলটি কি সুন্দর ! দেশী সিজ্‌নফ্লাওয়ার এর কাছে কোথায় লাগে ! আমরা বাংলাদেশে লইয়া যাইব বলিয়া অনেকগুলি ফুলসমেত গাছ সংগ্রহ করিলাম। স্বামীজী বলিলেন ঃ "এগুলি নিয়ে যাওয়া বৃথা, স্নো-রেনজ্-এর ঠিক নীচেই এগুলি জন্মায়, সমতলভূমিতে বাঁচে না"। সুদামা বলিল ঃ "এই সকল ফুলের মধ্যে অনেকগুলি বিষ ফুল আছে। এই পথ দিয়া যাইবার সময় উহাদের রেণু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া যাত্রীদের মুখমণ্ডলে পড়ে ও মুখের চামড়া কালো করিয়া দেয়। কাহারও কাহারও গালে ও নাকে ঘা পর্যন্ত হইয়া যায়।

ঐ বিষাক্ত ঘা শীঘ্র সারে না। সেইজন্য পড়াওতে পৌঁছিয়াই গরম জল ও কার্বলিক সাবান দিয়া মুখ হাত প্রভৃতি দেহের অনাবৃত স্থানসকল উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা কর্তব্য।" এই কথা শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ "উচ্চতার জন্য গা বমি বমি করে এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডার জন্য হাত মুখ ফাটিয়া যায় এবং ঘা হয়"।

পথে আসিতে আসিতে একজন যাত্রী অত্যন্ত বমি করিয়া কাতর হইয়া পড়িল। ভলেন্টিয়ারগণ তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ধর্মার্থবিভাগের ডাক্তার আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিলেন ও কয়েকজন ভলেন্টিয়ারের সঙ্গে তাহাকে একটি ঝাম্পানে করিয়া পহেলগাঁও পাঠাইয়া দিলেন।

পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। স্বামীজী কয়েকখানি ফটো লইলেন। এই উচ্চস্থান হইতে মেঘগুলিকে অতি নিকটবর্তী ও সূর্যকে নিষ্প্রভ মনে হইতে লাগিল। দূরের কয়েকটি পর্বত ব্যতীত এই অঞ্চলের যাবতীয় পর্বতকেই ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন ঃ "এই রকম উঁচু জায়গায় উঠলে অনেকে বমি করে আর মাথা ঘুরে পড়ে যায়। একে 'মাউন্টেন-সিকনেস্' (শৈলপীড়া) বলে। কেদারনাথ পর্বতে (১১,৭৫০ ফিট উচ্চ) আমার একবার ঐ রকম হয়েছিল। খুব উঁচু ব'লে এইসব জায়গায় বাতাস সমতলভূমির বাতাস অপেক্ষা পাতলা আর তাতে অক্সিজেন কম থাকে, সেইজন্যে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় আর অল্প পরিশ্রম করলে হাঁপিয়ে পড়তে হয়। একটু চড়াই করলে মনে হয় যেন চার মাইল চলা হয়েছে।"

এই উচ্চ স্থান হইতে দূরবর্তী অমরনাথ পর্বতকে অতি নিকটবর্তী দেখাইতেছে। মনে হইতেছে যেন ছুটিয়া ঐ স্থানে যাওয়া যায়। এইস্থান হইতে যে সকল ঝরণা বাহির হইয়াছে তাহার এক ধারের ঝরণাগুলি অমরাবতী নদীতে ও অপর ধারেরগুলি সিন্ধুনদে যাইয়া পড়িয়াছে।

এইস্থানের বিপরীত দিকে ক্রমশঃ নামিতে নামিতে একটি সুন্দর অধিত্যকার মধ্য দিয়া আমরা পঞ্চতরণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু প্রস্তরখণ্ড পার্শ্বস্থিত পর্বতসকল হইতে খসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রমে আমরা পঞ্চতরণীর নদীর পাঁচটি ধারা পার হইয়া ভৈরব-ঘাট বা বৈরাগী-ঘাট পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি নাতিবৃহৎ মাঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহাই পঞ্চতরণী। এইস্থানে আসিতে হইলে ঐ নদীটিকে পাঁচবার পার হইতে হয় বলিয়া এইস্থানের উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। দুইটি ধারার জল এখন এক হাঁটুরও কম রহিয়াছে কিন্তু অপরগুলিতে জল গভীর ও বেগবতী ; উহাদের উপর কাষ্ঠ ও পাথর দিয়া ধর্মার্থ-বিভাগ হাল্কা সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। যে স্থানটি যাত্রীগণের বাসের জন্য নির্দিষ্ট করা আছে তাহা নদী হইতে কিছু উচ্চভূমিতে অবস্থিত। জুনিপার গুল্মই এ পড়াও-এর একমাত্র ইন্ধন, কারণ ইহা ব্যতীত এই প্রদেশে অন্য কোন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে না।

এইস্থান হইতে অমরাবতী নদীর তীর ধরিয়া পশ্চিমদিকে নয় মাইল যাইলে ভারতবর্ষ ও তিব্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বালতাল গ্রামে পৌঁছানো যায়। পথটি কঠিন, সর্বসাধারণের যোগ্য নহে। দুই একজন ভ্রমণকারী ব্যতীত অপর কেহ এই পথে যাইতে সাহস করে না।

অতি প্রত্যুষে যাত্রা না করিলে, ফিরিতে বেলা অধিক হইয়া যায় বলিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁবু ও মালপত্র পাহারা দিবার জন্য সরকারী কুলীদের রাখিয়া আমরা অমরনাথ দর্শনে বাহির হইলাম। পথটি তুঙ্গ পর্বতমালার গা বাহিয়া অমরাবতী নদীর কূলে কূলে গিয়াছে। পথে স্থানে স্থানে সুদৃশ্য ঝরণাসকল দৃষ্ট হইতেছে। কোন পর্বতেই উদ্ভিদের লেশমাত্র নাই। চারিদিকে এক ভীষণ অনুর্বরতা বিরাজ করিতেছে। কি এক পার্বত্য গাম্ভীর্য ও নিস্তব্ধতা চতুর্দিকে বর্তমান। স্থানটি কবি, চিত্রকর, তপস্বী ও ভ্রমণকারীদের চির আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই। গুগাম নামক স্থানে একটি বাঁকের নিকট ঘোড়া, ঝাম্পান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম, কারণ এইস্থান হইতে গুহা পর্যন্ত পথটি ঘোড়া, ঝাম্পান প্রভৃতি চলিবার অনুপযুক্ত। আমরা এইবার কতকগুলি জীর্ণ পাথরের পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথটি সংকীর্ণ ও উর্ধ্বমুখী। ক্রমে চড়াই শেষ করিয়া আমরা বিপরীত দিকে উৎরাই করিতে করিতে অমরাবতী নদীর চির-তুষারাবৃত তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম। এইস্থান হইতে প্রায় এক ফার্লং পথ বরফের সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। বরফের সেতুর নীচে অমরাবতী নদী বেগে গর্জন করিয়া ধাবিত হইতেছে। ইহার উপর দিয়া চলিবার সময় জুতার তলে কাঁটাপেরেক ও হাতে পাহাড়ে বেড়াবার লাঠি থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে পতনের বিশেষ সম্ভাবনা। যাত্রীরা অনেকে বরফের উপর দিয়া চলিবার সুবিধার জন্য ঘাসের চাপলীজুতা শ্রীনগর হইতে সঙ্গে আনিয়াছেন। বর্ফানের পথ শেষ হইলে অল্প চড়াইয়ের পথ অতিক্রম করিতেই আমরা অমরনাথ-গুহায় উপস্থিত হইলাম।

গুহাটির মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঝরণা জমিয়া বরফের স্তূপ হইয়া রহিয়াছে। যেটি সর্বাপেক্ষা বড় সেইটির নাম অমরনাথ-লিঙ্গ। ইহা দেখিতে বর্তুলাকার ও ইহার পরিধি প্রায় ছয় হাত ও উচ্চতা তিন হাত। প্রত্যেক তুষার-স্তূপের উপর গুহার ছাদ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। পাণ্ডা সুদামা বলিল, শিবলিঙ্গটি চন্দ্রের ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে ছোট ও বড় হইয়া থাকে ও অদ্য শ্রাবণী-পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। গুহার মধ্যে কয়েকজন মুসলমান অমরনাথজীর বিভূতি (খড়ি পাথরের গুঁড়া) বিক্রয় করিতেছে। এই তীর্থে মুসলমানদের অংশ আছে, কারণ প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জনৈক গুজর বা পাহাড়ী মুসলমান রাখাল এইস্থানটি সর্বপ্রথম দেখিতে পায় ও হিন্দুদের জানায়। এইস্থানের যাবতীয় পাহাড়ই খড়ি পাথরে পূর্ণ। স্বামীজী বলিলেন ঃ "এইসব পাথর পুড়িয়ে গুঁড়ো করলে প্যারিস প্ল্যাষ্টার তৈরী
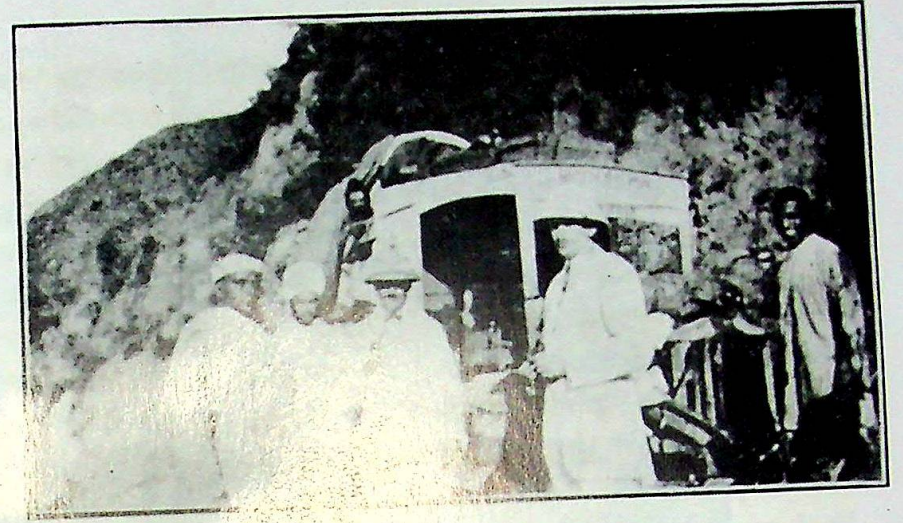
[illegible] আমাদের লরী।
এখান থেকে যাত্রা শুরু হল কাশ্মীর ও তিব্বতের পথে।
পশ্চাতে পর্ব[illegible] ও অরণ্য এবং প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্যে
[illegible]র মন ভরপুর হয়ে ওঠে।

হিমিশের পথে পাহাড়ের উপর ত্রিত্‌শ গুম্ফা ; সম্মুখে পয়ঃপ্রণালী

'লামাউরু' গুম্ফা

মেচোহী হইতে দ্রাসের পথে স্বামিজী ও গনিয়া
চতুর্দিকে তুষার বৃষ্টি
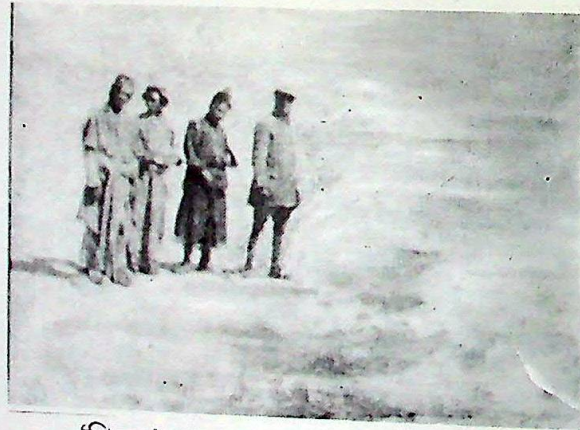
'পিতুক' গুম্ফার ছাদে স্বামিজী ও লামাগণ
চতুর্দিকে তুষার

হয়।" এই গুহাটি স্বাভাবিক, মানব খোদিত নহে। ইহা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় ১৫০ ফিট। ইহা সমুদ্রতট হইতে ১৩,০০০ ফিট উচ্চে, ১৮,০০০ ফিট উচ্চ চির-তুষারাবৃত পর্বতের গাত্রে অবস্থিত। এই গুহাতে কতকগুলি চামচিকে উড়িতেছে দেখিলাম এবং দুইটি কালো গোলা পায়রা গুহা হইতে বাহিরে উড়িয়া গেল। পাণ্ডারা বলে যে, ঐ পায়রা দুইটি অমরনাথের ভৈরব। তাহারা গুহা রক্ষা করে। গুহার এক কোণে বরফের ছোট ছোট চাঁই আছে। একটি পার্বতী ও গণেশ। গুহায় কোন মন্দির নাই। গুহার নিম্নেই অমরাবতী নদী অবস্থিত। অনেকগুলি খড়ি পাথরের পাহাড়ের ধোয়াট লইয়া ইহা প্রবাহিত বলিয়া ইহার জল ঈষৎ শ্বেতাভ, সেইজন্য ইহার অপর নাম দুধগঙ্গা। যাত্রীগণ ইহার জলে স্নান তর্পণাদি করিয়া ভিজা কাপড়ে পর্বতগাত্রে যে-সকল ফুল জন্মে তাহা তুলিয়া অমরনাথ শিবকে পূজা, স্পর্শন, আলিঙ্গন, প্রদক্ষিণ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডাগণ স্নানের ও পূজার সময় সকলকে মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন। অনেকে বাবা অমরনাথ মহাদেবের নিকট পুত্র কামনা করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। ২।৩ বৎসরের দোরধরা শিশুকে লইয়া অনেক জনকজননী এই তীর্থে আসিয়াছেন।

এই গুহাটির ঠিক সম্মুখে 'ভৈরব-ঘাটী' বা 'বৈরাগী-ঘাট' নামে পর্বত অবস্থিত। উহা উচ্চতায় ১৮,০০০ ফিট। উহার উপর দিয়া পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহায় আসিবার একটি পথ গিয়াছে। পথটি কঠিন, অভিজ্ঞ ও কষ্টসহিষ্ণু পর্যটক বা সাধুগণ ছাড়া কেহ বড় একটা ঐ পথে আসিতে সাহস করেন না।

অমরনাথ দর্শন করিয়া আমরা বেলা প্রায় দুই ঘটিকার সময় পুনরায় পঞ্চতরণীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। প্রাইমাস স্টোভে গরম জল চাপানো ছিল, আমরা তাহাতে স্নান সমাপন করিয়া ইক্‌মিক কুকারে সিদ্ধ অন্নব্যঞ্জন আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহা পর্যন্ত যাওয়া আসায় পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছিল, তাই এই কয়েকদিনের পর অদ্যকার দীর্ঘ বিশ্রামটুকু বড় মধুর বোধ হইতে লাগিল। এইদিনই কোন কোন যাত্রী পহেলগাঁও ফিরিয়া যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। পঞ্চতরণী হইতে পহেলগাঁও ২৯ মাইল। ঐরূপভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে এত দ্রুত তাঁহাদিগকে অশ্ব পরিচালনা করিতে হয় যে, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

স্বামীজী বলিলেন ঃ "এখানে এসে আজ আমার আমেরিকার কথা মনে পড়ছে। সেখানে একবার আমার বন্ধু প্রফেসর পার্কার ও আমি ক্যানেডিয়ান আল্পস্ চড়াই করেছিলাম। সে পাহাড়ও ১৮,০০০ ফিট উচ্চ, আর উপরে চারিদিকে তুষারনদী (গ্লেসিয়ার)। একদিনে ৪৮ মাইল পাহাড়ে-রাস্তায় হেঁটে গিয়ে আমরা পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এতদূর পথ লোকে ঘোড়ায় চড়ে তিন দিনে পার হয়। সেখানে একটি হ্রদ ছিল, তার নাম "এমারেল্ড লেক," তার ধারে একটা হোটেল ছিল। সন্ধ্যা হ'লে

স্বামীজীকে চিরাভ্যস্তের ন্যায় সহজভাবে উৎরাই করিতে দেখিয়া যাত্রীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ঃ "বড়া জোয়ান বাঙ্গালী, ইয়ে কোন্ হ্যায় ? শের্ কে মাফিক্ চল্ তো হ্যায়"।

—"কোই স্থান কা যুবরাজ হোগা"।

দুই ঘণ্টা পরে এই ভয়ানক বিপদসঙ্কুল গিরিসঙ্কট হইতে ক্রমে আমরা নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিলাম। এখনও বুকের ভিতরটা দূর দূর করিয়া কাঁপিতেছে! শেষে একবার কত উপর হইতে নামিলাম দেখিবার জন্য ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকাইলাম, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলাম না, বৃহৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া সেই স্থানকে আবৃত করিয়াছে।

ইহার পর একে একে যাত্রীদের সকলের নামা শেষ হইলে আমরা উত্তরাভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমাদের 'পড়াও'তে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইস্থানের আশেপাশে কতকগুলি তৃণশ্যামল ভূমিখণ্ড ও দুই-একটি গুজরদের কুটির দেখিতে পাওয়া গেল। অন্য কোন লোকালয় বা গ্রাম নাই। চারিদিকে এক মহানীরবতা বিরাজমান, কেবল অদূরে একটি ঝরণা তর্ তর্ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আস্থানমার্গ হইতে হরনাগ পর্বতে যাইবার পথ আছে। পাঁচ ঘণ্টায় ২,০০০ ফিট্ চড়াই করিলে রাবমার্গ হইয়া বরফের উপরে চলিয়া ঐ হরনাগ শৃঙ্গে উঠা যায়।

আস্থানমার্গে রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রত্যুষে আমরা পহেলগাঁও যাত্রা করিলাম। ঐ স্থান 'আস্থানমার্গ' হইতে পনেরো মাইল। পথ গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। চন্দনবাড়ীর নিকট একটি অরণ্যসংকুল খাড়া পাহাড় হইতে উৎরাই করিতে সকলেরই খুব পরিশ্রম হইল। স্থানে স্থানে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি সরাইয়া দিয়া যাইতে হওয়ায় আমাদের যাত্রার গতি মন্দ হইতে লাগিল। এই বনজঙ্গলপূর্ণ পর্বত হইতে নামিয়াই দেখি আমরা পূর্বে 'চন্দনবাড়ী'তে যে-স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম সেই স্থানেই আসিয়াছি ; কিন্তু এখানে থাকা হইল না। এইস্থানে আমরা পুনরায় পুরাতন পথটি প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা ধরিয়া পহেলগাঁও অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা বেলা প্রায় তিনটার সময় পহেলগাঁও আসিয়া পৌঁছিলাম।

পরদিন সকালে আমরা সেখান হইতে আইশমোকামে যাত্রা করিলাম। সেখানকার পূর্বোক্ত পরিচিত মাঠে রাত্রিবাস করিয়া আমরা তাহার পরদিন মার্তণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলাম। এইস্থান হইতে 'ভবন', 'ইসলামাবাদ', 'আচ্ছিবল' প্রভৃতি কাশ্মীরের কয়েকটি সুন্দর সুন্দর স্থান দর্শন করিবার বাসনায় আমরা যাত্রীদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পাণ্ডা সুদামার বাড়ীতে ৩।৪ দিন বাস করিবার ইচ্ছা করিলাম। অতুলবাবুর অফিসের ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছিল, তাই তিনি সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য এইস্থানে আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীনগর যাত্রা করিলেন।

ধর্মার্থ-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাশীরাম জু স্বামীজীর অভিপ্রায় জানিতে আসিলে, স্বামীজী তাঁহাকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন ঃ "তাঁবু প্রভৃতি নিষ্প্রয়োজন দ্রব্যগুলি তোমরা এইস্থান হইতে শ্রীনগরে ফেরৎ লইয়া যাও এবং চার দিন পরে 'খান্‌াবল' ঘাটে একখানি বজরা পাঠাইয়া দিবে, তাহাতে আমরা জলপথে শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন করিব।"

মার্তণ্ডকে কাশ্মীরের গয়াধাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কারণ, এইস্থানে কাশ্মীরবাসী হিন্দুগণ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিয়া থাকেন। এইস্থানে মার্তণ্ডদেবের একটি মন্দির আছে, তাহার জন্যই এইস্থানের উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। উক্ত মন্দিরটি রাজা ললিতাদিত্যের দ্বারা (৬৯৯-৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে) স্থাপিত হয়। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত আছে যে, উক্ত মন্দিরটি রাজা রামাদিত্য (৪৫০ খ্রীঃ) এবং উহার পার্শ্ববর্তী মন্দিরগুলি তাঁহার মহিষী রাণী অমৃতপ্রভা-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এইস্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়। মার্তণ্ডের অধিবাসীগণ সকলেই ব্রাহ্মণ। এতগুলি ব্রাহ্মণপূর্ণ শহর কাশ্মীরে আর নাই। অমরনাথের পাণ্ডারা সকলেই এইস্থানের অধিবাসী। যদিও এখন কাশ্মীর হইতে পাণ্ডিত্যগৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে তথাপি এখনও কোথাও যদি প্রাচীন আর্য ব্রাহ্মণত্বের কিছুমাত্রও নিদর্শন অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা ইঁহাদের মধ্যে আছে। কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণকে দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে, কাশ্মীরে সেরূপ নহে। সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ (কাশ্মীরী পণ্ডিত) ও মুসলমানের বাস। ব্রাহ্মণেরা মুসলমান চাকর রাখে, হিন্দু চাকর মিলে না। ঐ মুসলমান চাকর জল লইয়া আসে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই জলে পূজা, পাক, স্নান করিলে এবং উহা পান করিলে জাতিভ্রষ্ট হয় না।

কাশ্মীরীরা বাঙ্গালীর ন্যায় দুইবেলা ভাত খায়, এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলেই মাছ-মাংসভোজী। কিন্তু মুসলমানেরা গো-বধ করিতে অথবা গো-মাংস খাইতে পারে না। যদি কোন মুসলমান গো-বধ করে অথবা গো-মাংস খায়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার কারাবাস ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়। কাশ্মীরীরা পূর্ববঙ্গবাসীদের ন্যায় রান্নার তরকারীতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে লঙ্কা ব্যবহার করে। উহাদিগের প্রধান ব্যঞ্জন ওলকপির পাতা সিদ্ধ করা জলে এক মুষ্টি লঙ্কা ফোড়ন, একটু তৈল অথবা ঘৃতের সহিত দিলে যে সুপ হয় তাহার নাম "কড়ম্"। ইহাতে ভাত ভিজাইয়া খাইতে হয়।

সুদামা পাণ্ডার বাড়ীতে এই "কড়ম্" একটু খাইয়া মুখ, গলা ও পেট লঙ্কার ঝালে জ্বলিয়া উঠিল। বাংলাদেশের লোকেরা হয়তো শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, কাশ্মীরী হিন্দুরা পক্ষিমাংস, মুরগী, বন্য শূকরের মাংস খায়, এবং পিতৃশ্রাদ্ধে প্রাচীন আর্যদিগের ন্যায় দ্বাদশ প্রকার মাংস ব্যবহার করে।

কাশ্মীরীরা আলখাল্লা বা ফেরাঙ্গের ভিতরে কৌপীন পরে। ফেরাঙ্গের হাতাগুলি হাত অপেক্ষা প্রায় ৭।৮ ইঞ্চি বেশী লম্বা থাকে। ইহা দ্বারা দস্তানার (হ্যাণ্ড গ্লভ্স্) কার্য সাধিত হয়। ইহাদের প্রথা অনুযায়ী খাইতে খাইতে পরিবেশন করিতে হইলে এঁটো হাত ফেরাঙ্গের হাতা দিয়া ঢাকিয়া চামচ ধরিয়া পরিবেশন করিলে উচ্ছিষ্ট হয় না।

"মার্তণ্ড" হইতে দুই মাইল উত্তরে "ভবন" নামক একখানি গ্রাম অবস্থিত, তথা হইতে আধ মাইল দূরে "বুমজু" নামক স্থানের নিকট কয়েকটি পাহাড়ে আমরা গুহা দেখিতে গেলাম। যে গুহাটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ ফিট ; ভিতরটি অন্ধকার, দেশলাই জ্বালিতে জ্বালিতে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। কিছুদূর দাঁড়াইয়া যাইবার পর আমাদিগকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইল। গুহার শেষের দিক বেশ আলোকিত, গুহাটি ভিতরে আরো কিছুদূর পর্যন্ত রহিয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায় না, উপর হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়া ইহার প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এই গুহাতে একজন সাধু যোগ-অভ্যাস করিতেন। সম্প্রতি তিনি সমাধিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার দেহের অস্থিসকল তিনি যে স্থানে আসন করিয়া বসিতেন সেইস্থানেই পড়িয়া আছে। আমরা উহা দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।

এই গুহা হইতে বাহির হইয়া আমরা নিকটবর্তী আর একটি গুহা দেখিতে গেলাম। সেই গুহার মধ্যে একটি সুন্দর দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে পর্বতগাত্রে খোদাই-করা কতকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমূর্তি বিশেষভাবে দেখিবার।

'ভবন' হইতে 'ইসলামাবাদ' সাড়ে চারি মাইল। আমরা সেখানে ভ্রমণ করিতে গেলাম। কাশ্মীরে যে কয়েকটি বড় বড় শহর আছে তাহাদের মধ্যে শ্রীনগরের পরেই ইসলামাবাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এইস্থানের লোকসংখ্যা ২০,০০০। এই স্থান হইতে জম্মু রাজ্যে গমন করিবার পথ বাহির হইয়াছে। এই শহরে অনেকগুলি বস্ত্রশিল্পীর বাস, তাহারা কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, টেবিল-ক্লথ, ঝালর, পর্দা প্রভৃতিতে এরূপ সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ করিয়া থাকে যে, তাহা শিল্প-জগতে অতুলনীয়। এই শহরের বাহিরে 'জামনা চার্চ-মিশন হসপিট্যাল' নামে খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি মেয়ে-হাসপাতাল রহিয়াছে। চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত, নানাবিধ ফল এবং ফুলের বৃক্ষলতাপূর্ণ ও নদীবহুল এই শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। একস্থানে একটি পাহাড় হইতে দুইটি সুন্দর ঝরণা প্রবাহিত হইয়া দুইটি জলাশয়ে পতিত হইতেছে। ইহার নিকটে মহারাজা কাশ্মীরের একটি সুন্দর বাগানবাড়ী ও একটি দেবালয় আছে। শহরের মধ্যে আরও কতকগুলি ঝরণা রহিয়াছে, তাহাদের একটির জল গন্ধক-মিশ্রিত ও আর একটির উপর একটি সুন্দর মসজিদ কৌশলে বানানো হইয়াছে। ইসলামাবাদ হইতে নিম্নলিখিত রমণীয় স্থানগুলি দেখিতে যাইবার পথ আছে ঃ ফুলগাম, দণ্ডমার্গ, মঙ্গজাম, হরিবল, জলপ্রপাত, কঙ্গবত্তন, কংসরনাগ, শুপিয়ন, ভেরনাগ।

ভেরনাগে অনেক ঝরণা আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এইস্থানে রমণীয় উদ্যান ও প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এইস্থানটি তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে, তিনি তাঁহার

দেহত্যাগের পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে যেন তাঁহাকে এইস্থানে লইয়া আসা হয়।

মার্তণ্ডে তিনদিন বাসের পর আমরা আচ্ছিবল যাত্রা করিলাম। ঐ স্থান মার্তণ্ড হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইসলামাবাদ পার হইয়া এক মাইল আসিয়া আমরা পথে অর্পৎ নামক একটি নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব-দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। বাঙলাদেশের ন্যায় কাশ্মীরেও অপর্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য (শালি) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পথের দুপাশে স্থানে স্থানে উইলো গাছের শ্রেণী। আচ্ছিবল এইস্থান হইতে মাত্র ছয় মাইল। আমরা অবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই স্থানটি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্ভারে শোভিত। একটি পর্বতের পাদদেশে নবাবী আমলের একটি সুদৃশ্য প্রমোদ-উদ্যান রহিয়াছে। তাহাতে অসংখ্য মেওয়ার গাছ ফলভারে অবনত হইয়া উদ্যানের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। উদ্যান-বাটীতে কাশ্মীরের মহারাজার দীক্ষাগুরু বাস করেন। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম যে, তিনি কয়েকদিনের জন্য বাহিরে গিয়াছেন। সরকারী তরফ হইতে উদ্যানের ঝিলে মৎস্যের চাষ করা হইতেছে। এজন্য অনেক কর্মচারী এইস্থানে নিযুক্ত আছেন। এইস্থানের সমস্ত মৎস্যগুলিই ট্রাউট-জাতীয়। দেখিতে ঠিক বাঙলাদেশের মৃগেল মাছের ন্যায়। আচ্ছিবলে অনেক সাহেব, মেম ও দেশীয় ধনীলোক গ্রীষ্মবাস করিতেছেন। শিয়ালকোটের নওসেরা নামক স্থানের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এইস্থানে একটি তাঁবুতে বাস করিতেছেন, তিনি স্বামীজীকে চিনিতে পারিয়া নিজ শিবিরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে কাশ্মীরী রান্না এবং শিখদিগের প্রিয় তুন্দুলের রোটী, খোসাশুদ্ধ আস্ত ছোলার দাল প্রভৃতি পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু মহাশয়ের ভগ্নী এই সময় আচ্ছিবলে গ্রীষ্মবাস করিতেছিলেন ; তিনি স্থানীয় বাদশাহী উদ্যানে উৎপন্ন নানাবিধ মেওয়া ফল ও একটি ফুলের তোড়া স্বামীজীকে পাঠাইয়া দিলেন।

অপরাহ্নে স্বামীজী পুনরায় যাত্রা করিলেন। আচ্ছিবল হইতে কিছু দূরে আসিয়া আমরা 'খানাবল' নামক একখানি গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়া বিতস্তার তীরে উপস্থিত হইলাম। অর্পৎ, ব্রীং ও সান্দ্রিন নামক তিনটি নদী এইস্থানে মিলিত হইয়া 'বিতস্তা নদী' নাম ধারণ করিয়াছে। এইস্থানের ঘাটে আমাদের জন্য সরকারী বজরা প্রস্তুত রহিয়াছে। ঘোড়া, কুলি প্রভৃতি এইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া জলপথে শ্রীনগর যাত্রা করিলাম।

নদীর জল একটানা, কাজেই দাঁড় টানার কোনই হাঙ্গামা নাই। একজন স্ত্রী-মাঝি হাল ধরিয়া বজরা বাহিতে লাগিল। বিতস্তার উভয় তীরে সিদ্ধির বন, দূরে পর্বতমালা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ গ্রাম, ভগ্ন-দেবালয়, খোড়ো-মসজিদ প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমরা দেড় দিন পরে শ্রীনগর আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং 'লালমণ্ডি'

ঘাটে বজরা ছাড়িয়া পাঁচ নম্বর সরকারী হাউস বোট-এ (যাহা স্বামীজীর জন্য প্রস্তুত ছিল) স্বামীজী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহার দুই দিন পরে স্থানীয় আর্যসমাজীদের অনুরোধে হুজুরীবাগে স্বামীজী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শহরের প্রায় সকল আর্যসমাজীই এই সভায় উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতার বিষয় 'মাই এক্সপিরিয়েন্স্ ইন অ্যামেরিকা'। বক্তৃতা ইংরাজিতে হইল। সভাভঙ্গের পর বহু আর্যসমাজী স্বামীজীকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ধর্মবিষয়ে তাঁহার মতামত ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে প্রায় দেড়ঘন্টাকাল নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া হাউস বোট-এ ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার দুই দিন পরে জন্মাষ্টমীর দিন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায়, বাজারের নিকট একটি বিস্তৃত মাঠে, বৃহৎ পাল দিয়া ঘেরা মণ্ডপের মধ্যে স্বামীজী মহারাজের আর একটি বক্তৃতা হইল। এই সভার উদ্যোগী স্বয়ং কাশ্মীরের মহারাজ বাহাদুর প্রতাপ সিং। বিষয় ছিল, 'শ্রীকৃষ্ণ, দি ওয়ার্ল্ড টিচার'। কাশ্মীরের মহারাজা, পুঞ্চ রাজকুমার, স্টেট ও প্রাইভেট সেক্রেটারীদ্বয়, পুলিশের কোতোয়াল, মুতামিদ দরবার প্রভৃতি কাশ্মীরের যাবতীয় রাজকর্মচারী ও শহরের বহু গণ্যমান্য ও সুধী ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিলেন। স্বামীজী ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দুইঘন্টাকাল বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে খুব আনন্দিত হইলেন এবং অনেকে পরে নিয়মিতভাবে হাউস-বোট-এ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। শেষে এমন হইল যে, দর্শনার্থীদের সহিত দেখা করিতে করিতে স্বামীজীর স্নানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় বরোদার মহারাণী কাশ্মীরের মহারাজার অতিথি হইয়া চশমাসাহীর বাগানবাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজীর সহিত দেখা করিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি বরোদা মহারাজ সয়াজী রাও গায়কোয়াড়ের সহিত আমেরিকায় গিয়াছিলেন তখন নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটি তাঁহাদের এক সম্বর্ধনা সভায় অভিনন্দনপত্র দান করে। তখন স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয়। সেই সময় হইতে রাজা ও রাণী উভয়েই স্বামীজীকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। মহারাণী স্বামীজীকে বরোদায় আসিয়া একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং আবশ্যকীয় যাবতীয় খরচ নিজে বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই জার্মানী যাইবেন। কারণ তাঁহার পুত্র সেখানকার এক বাতুলালয়ে চিকিৎসাধীন আছেন। মহারাণী তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয়কে আদেশ করিলেন যে, স্বামীজী যখন বরোদায় আসিবেন তখন যেন তাঁহাকে রাজকীয় অতিথিরূপে থাকিবার ব্যবস্থা করা হয় ও তাঁহার সেবা-যত্নের কোনরূপ ত্রুটী না হয়। মহারাণীর সঙ্গে এইরূপ নানা কথাবার্তার পর স্বামীজী তাঁহার হাউস বোট-এ ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ ক্ষীরভবানীর পথে ॥

স্বামীজী অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন শুনিয়া কালোয়ান্ত সিং গুলমার্গে বেড়াইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। স্বামীজী সেই পত্র পাইয়া ২৩শে আগষ্ট তারিখে ভোর ৬টায় একখানি সরকারী রবার টায়ার টাঙ্গাতে শ্রীনগর হইতে গুলমার্গ যাত্রা করিলেন। গুলমার্গ শ্রীনগর হইতে ২৭ মাইল পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

শ্রীনগর ছাড়িয়া আমাদের টাঙ্গা হ্যাপি-ভ্যালি রোড ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। ঘোড়াটি বেশ বলবান, ঘন্টায় দশ মাইল বেগে ছুটিতেছে। টাঙ্গার পথের দুই ধারে অসংখ্য সফেদা গাছের বীথিকা এবং ডানদিকে ঝিলাম (বিতস্তা) নদী। বামদিকে অনতিদূরে পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি মাঠে কতকগুলি কাশ্মীরী সৈন্য তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা পেশোয়ারীদের মতো, কিন্তু ইহারা সকলেই 'দোগ্‌রা'-জাতীয় শিখ। ক্রমে শ্রীনগর হইতে আট মাইল আসিয়া আমরা এই পথ পরিত্যাগ করিয়া গুলমার্গের পথে প্রবেশ করিলাম। তে-মাথার মোড়ে একটি কাষ্ঠফলকে ইংরাজীতে 'গুলমার্গ' এই কথাটি লিখিত আছে। এই পথে কিছুদূর আসিয়া সুখনাথ নদ ও তাহার বন্যা-খালটি একটি সুন্দর সেতুর উপর দিয়া পার হইয়া আমরা 'মগম' নামক একখানি গ্রামে উপনীত হইলাম। এই গ্রাম শ্রীনগর হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে এবং গুলমার্গ ও শ্রীনগরের ঠিক মধ্যপথে অবস্থিত। স্থানীয় আইন অনুসারে রাজকর্মচারীগণ এইস্থানে আমাদের নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিলেন। আমরা এইস্থানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। সম্মুখে 'পীরপঞ্জল' পর্বত, ইহারই শীর্ষদেশে গুলমার্গ শহর অবস্থিত, আমরা সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম. পথ লাল রং-এর কাঁকরে পরিপূর্ণ। এক পার্শ্বে একটি পার্বত্য স্রোতস্বতী খরবেগে প্রবাহিতা, অপর পার্শ্বে পর্বতের পাদদেশে বহু দূর বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে কাশ্মীরী নারীরা কাস্তে লইয়া ধান কাটিতেছে এবং মধুর পাহাড়ী সুরে গান গাহিতেছে।

স্বামীজী বলিলেন,—"সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সব পাহাড়ী দেশের সুর শুনেছি, এই একই রকম।"

পথে স্ত্রী-পুরুষ অধিকাংশ পথিকই অশ্বারোহণে চলিয়াছে, পাঞ্জাবীর ন্যায় কাশ্মীরী নারীরাও অশ্বারোহণে সুপটু।

টনমার্গের পূর্ববর্তী ক্রমাগত চার মাইল পথ চড়াই পড়িল। আমাদের টাঙ্গার গতিবেগ ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। বেলা প্রায় দশ ঘটিকায় আমরা 'টনমার্গ'

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। 'গুলমার্গ' হইতে কালোয়ান্ত সিং, তেজা সিং প্রভৃতি কয়েকজন শিখ যুবক এইস্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 'গুলমার্গ' শহর এইস্থান হইতে তিন মাইল ঊর্ধ্বে ৮,৫০০ ফিট উচ্চ একটি পর্বতের মাথার উপর অবস্থিত।

টনমার্গ গ্রামটি ঠিক গুলমার্গ পর্বতের পাদদেশেই অবস্থিত। মোটর বা টাঙ্গা গুলমার্গ উঠিতে পারে না। কারণ এইস্থান হইতে পথের ১,৫০০ ফুট ক্রমাগত চড়াই। 'টনমার্গ' হইতে দুইজন কুলি ও দুইটি ঘোড়া লইয়া আমরা পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। এই সময় পাহাড়-চড়া লাঠি আমাদের খুব কাজে আসিতে লাগিল। পথ বরাবর দেওদার, সরলদ্রুম প্রভৃতির জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং বেশ ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত। মধ্যে মধ্যে এই উচ্চ পথ হইতে নিম্নের সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার বহু মাইল উন্মুক্ত দৃশ্য, দূরে 'ফিরোজপুর নালা', 'নাংগা পর্বত', 'পীরপঞ্জল' প্রভৃতি দেখা যাইতে লাগিল। নাংগা পর্বত ২৭,০০০ ফিট উচ্চ এবং বরফে সম্পূর্ণ আবৃত। উহা গুলমার্গ হইতে নব্বই মাইল দূরে উত্তরদিকে অবস্থিত হইলেও এইস্থান হইতে উহার দৃশ্য দার্জিলিং হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য অপেক্ষা মনোরম। আজ পর্যন্ত কেহ উহাতে আরোহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত পাহাড়ে মিষ্টার মামারী দুইজন গুর্খা পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া উহাতে চড়িতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা কুড়ালি দিয়া বরফের উপর সিঁড়ির মতো পথ কাটিতে কাটিতে বহুদূর উঠেন, কিন্তু হঠাৎ উপর হইতে কোটি কোটি মণের একটি অতিকায় বরফের চাঁই খসিয়া পড়ায় তাঁহারা সকলেই প্রাণ হারান।

প্রায় অর্ধপথ আসিয়া আমরা পথিপার্শ্বে একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নিকটেই কতকগুলি পাইন গাছের তলায় অনেক ফল পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামীজী দুই-একটি ফল কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—"এগুলিকে ইংরাজীতে 'পাইন কোন্' বলে। এর ভেতর বাদাম হয়, ওদেশে খুব খায়। সব ফলের দোকানে বিক্রী হয়। আমাদের দেশে এগুলোকে জলগোঁজা বলে, তেলের সঙ্গে ভেজাল দেয়।"

বেলা আন্দাজ একটার সময় আমরা গুলমার্গে রায়জাদার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রায়জাদা এইস্থানের বন বিভাগের প্রধান পরিদর্শক (ডেপুটি ফরেষ্ট অফিসার)। ইঁহার পুরা নাম রায়জাদা হুকমা সিং। ইনি কালোয়ান্ত সিং-এর খুড়া এবং একজন উদারচেতা ভদ্রলোক। স্বামীজীর বাসের জন্য ইনি নিজ বাসভবনের সংলগ্ন উদ্যানে একটি সুন্দর তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছেন। অমরনাথের পথে প্রত্যহ তাঁবুতে থাকিয়া স্বামীজী তাঁবুতে থাকার এমন পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এইস্থানেও সুন্দর তাঁবুর বন্দোবস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। সেদিন এইখানে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রভাতে স্বামীজী রায়জাদা, কালোয়ান্ত সিং প্রভৃতির সহিত গুলমার্গ শহরতলী বেড়াইয়া দেখিতে গেলেন। 'গুলমার্গ' কথাটির অর্থ 'গোলাপ মাঠ'। এইস্থানে নানা জাতীয় পাহাড়ী ফুল অজস্র ফুটিয়া থাকে। কথিত আছে, সেইজন্যই

সম্রাট সাজাহান এইস্থানের উক্ত নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রায় দুই মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া অধিত্যকার চতুর্দিকে ৫০০—৫৫০ খানি কাঠ ও টিন নির্মিত বাড়ীই এই শহরের প্রধান দৃশ্য। শহরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি অতি বিস্তৃত ময়দান; তথায় গলফ, পোলো, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি প্রত্যহ খেলা হয়। বাজারের নিকটেই লোকের বাস অধিক, ডাকঘর প্রভৃতিও সেইস্থানেই। রেসিডেন্ট সাহেবের বাংলো, রাজপ্রাসাদ, প্রভৃতি নিকটেই অবস্থিত। এই শহরের সুবৃহৎ নাইডু হোটেলটি পুড়িয়া যাওয়াতে বহু সাহেব-মেম ও দেশীয় ধনীলোকের থাকিবার বিস্তর অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মালিক হরি নাইডু মহাশয় শীঘ্রই উহা মেরামত করাইবেন। হরি নাইডু মহাশয়ের নাম দেখিয়া যেন কেহ এঁকে মাদ্রাজী হিন্দু মনে না করেন, কারণ তিনি হিন্দু তো মোটেই নন, তাহা ছাড়া একটি মুসলমান কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে যাইয়া, খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এখন রীতিমত রোজা-নমাজ করেন।

এই শহরে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা এত অধিক যে, প্রথম দেখিয়া স্বামীজী ইহাকে কোন সাহেবী শহর মনে করিয়াছিলেন। এই শহরে কাশ্মীর রাজকুমার হরি সিং বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাস। ইনি মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুরের স্বর্গতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমর সিংহের পুত্র। মহারাজা বাহাদুর অপুত্রক বলিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট ইঁহাকেই কাশ্মীরের যুবরাজ-রূপে মনোনীত করিয়াছেন।

জুন মাস হইতে 'গুলমার্গে' প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষ হইতে এইস্থানে এত অধিক তুষারপাত হয় যে, মে মাস পর্যন্ত কেহ এই শহরে বাস করিতে পারে না। সেই সময় চতুর্দিকে ৫/৭ ফুট বরফে আবৃত হইয়া যায়। অধিবাসীরা সেই সময় বরামূলা ও শ্রীনগরে নামিয়া যায়। কেবল গ্রীষ্মের এই কয় মাসের জন্য গুলমার্গে একটি সুসজ্জিত বাংলোর ভাড়া পাঁচশত হইতে ছয়শত টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। আসবাবপত্র কিছুই সঙ্গে আনিতে হয় না। সবই বাংলোতে পাওয়া যায়। ইহাই যাত্রীদের সুবিধা।

'গুলমার্গ' শহরের তিন মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে 'বাবা মাঝষি' নামক এক গ্রাম অবস্থিত। সেখানকার প্রাচীন জীয়ারতের নাম এইস্থানে সুপরিচিত। আমরা উহা দেখিতে গেলাম। গ্রামখানি ৭,০০০ ফিট উচ্চভূমিতে অবস্থিত। গুলমার্গের পূর্বদিক দিয়া 'ধোবীঘাট' হইয়া তথায় যাইতে হয়। দুই মাইল আসিয়া পথ খুব ঢালু বোধ হইতে লাগিল।

পথিমধ্যে অনেকগুলি পাহাড়ীদের কুটীর অতিক্রম করিয়া আমরা বরাবর সরলদ্রুমের জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেকে এইস্থানে আসিয়া বাবার নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করেন। কথিত আছে, মোগল রাজত্বকালে "বাবা পামদীন" নামক জনৈক সিদ্ধ ফকির এইস্থানে বাস করিতেন। তিনি খুব অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। এইস্থানে একখানি বৃহৎ বাড়ীতে

অনেকগুলি ফকির বাস করিতেছেন। নিকটেই যাত্রীদের থাকিবার জন্য ধর্মশালা আছে। অনেক সাহেব-মেম এখানকার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া এইস্থানে তাঁবুতে গ্রীষ্মবাস করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে বিস্তর জঙ্গলী ভল্লুক পাওয়া যায়।

'গুলমার্গ' হইতে আর একটি বিখ্যাত স্থান স্বামীজী দেখিতে গেলেন, উহার নাম 'আল্‌পাথর' হ্রদ। উহা ১৪,৮০০ ফিট 'অপর্বত' নামক এক অতি উচ্চ পর্বতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। কিলেন মার্গ নামক ১১,০০০ ফিট উচ্চ এক অধিত্যকার উপর দিয়া ঐস্থানে গমন করিতে হয়। এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে অপর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস জন্মাইয়া থাকে বলিয়া সেই সময় মেষপালকগণ এইদিকে ভেড়ার পাল লইয়া চরাইতে আসে। সেই হইতে এইস্থানের নাম 'ছাগলের মাঠ' বা 'কিলেন মার্গ' হইয়াছে।

আল্‌পাথরের উপর হইতে দূরে পুঞ্চ রাজ্যের সীমানা দেখা যায়। ঐ রাজ্যটিও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত। এইস্থানের রাজপুত্রকে মহারাজ প্রতাপ সিং বাহাদুর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে কাশ্মীরের যুবরাজরূপে মনোনীত করেন নাই। রায়জাদার আত্মীয়েরা কিলেনমার্গে বনভোজনের আয়োজন করিলেন। আমরা বনভোজন সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় গুলমার্গে প্রত্যাবর্তন করিলাম। শুনিলাম, সন্ধ্যার পর অনেকে এই পথে চলিতে গিয়া ভল্লুকের হাতে পড়িয়াছে।

এই সময় মিসেস মিত্র শ্রীনগর হইতে গুলমার্গে নিজ বাংলোতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। স্বামীজী এইস্থানে আছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামীজী তাঁহার বাংলোতে গেলেন। তাঁহার বাংলোর নম্বর ৩। তথায় তিনি স্বামীজীর জন্য নানাবিধ আহার্যের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইদিন একাদশী বলিয়া তিনি নিজে কিছুই আহার করিলেন না। স্বামীজীকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন। ডাক্তার এ. মিত্র মহাশয় গুলমার্গের একমাত্র বাঙ্গালী অধিবাসী ছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়ম অনুসারে শ্রীনগরে ও গুলমার্গে চিরস্থায়ীভাবে দুইখানি বাগান-বাড়ী কিনিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তেরো বৎসর হইতে এই নিয়মিটি উঠিয়া গিয়াছে। আজকাল কোন বিদেশী কুড়ি বৎসরের অধিক কাশ্মীরে স্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন না। কাশ্মীরীদের কথা স্বতন্ত্র।

পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত আজ্ঞারাম ও লালা চেৎরাম কোলে নামক জনৈক শিখ যুবক স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আট বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া কাগজ-প্রস্তুত বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যে সময় তিনি আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় স্বামীজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহার বাড়ী জম্মুতে। এক্ষণে শ্রীনগরে আছেন। গুলমার্গে বেড়াইতে আসিয়াছেন। একত্রে চা-পানের পর তাঁহার সহিত স্বামীজী একটি উৎসব দেখিবার জন্য পোলো গ্রাউণ্ডের দিকে গমন করিলেন, সেখানে মেজর স্ক্রিনারের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ

হইল।[১] তিনি সমাদরে স্বামীজীকে নিজের বাংলোতে লইয়া গেলেন এবং চা পান করাইলেন. কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁহার সহিত আমরা কাশ্মীরের দৃশ্যাবলীর ফটো কিনিবার জন্য গমন করিলাম। কয়েকটি দোকান দেখার পর আমরা এক দোকানে কাশ্মীরের নানাস্থানের বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র ও ফটো রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। দোকানদার জনৈকা মেম। তিনি আমাদিগকে নানাবিধ ছবি দেখাইতে লাগিলেন।

গুলমার্গে কাশ্মীর মহারাজের একটি প্রাসাদ আছে। ঐ স্থান হইতে সমস্ত শহরের দৃশ্য একদিকে এবং নাংগা পর্বতের চির-তুষারাবৃত চূড়া অপরদিকে দেখিবার জন্য স্বামীজী গেলেন। ঐ সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীজী প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহারাজের ঘরগুলি এবং বহুমূল্য আসবাবপত্র দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে চেৎরাম কোলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৈকালে চেৎরাম স্বামীজীর সহিত আলাপ করিতে তাঁবুতে আসিলেন।

পর দিবস চেৎরাম স্বামীজীকে লইয়া আফগানিস্থানের রাজপুত্র সর্দার আবদুল রহমান এফেণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। এফেণ্ডী সাহেব স্বামীজীকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে প্রায় একঘন্টা কথাবার্তার পর স্বামীজী পুনরায় তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এইরূপে গুলমার্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাশি পনেরো দিন উপভোগ করিবার পর স্বামীজী পুনরায় শ্রীনগর সরকারী হাউস-বোট-এ ফিরিয়া আসিলেন। পরদিবস লালা চেৎরাম কোলে গুলমার্গ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়া স্বামীজীর নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাসায় নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পরদিন ডাক্তার শ্রীরামের বাসায় এবং রাত্রে শার্প এণ্ড কোং-এর হোটেলে এবং তৎপরদিবস দ্বিপ্রহরে কর্নেল অনন্তরাম ও রাত্রে লালা দয়ালরামের বাড়ীতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ হইল। তাহার পরদিন এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ অনারেবল স্যার পি. সি. ব্যানার্জী স্বামীজীকে চা-পানের নিমন্ত্রণ করিলেন। কয়েকদিন শ্রীনগরে বাস করিয়া স্বামীজী বলিলেন,—"চলো 'ক্ষীরভবানী' দেখে আসি, বিবেকানন্দ স্বামী সেখানে গিয়েছিলেন।"

সরকারী হাউস-বোটটি অত্যন্ত কদাকার। এত বড় বোট লইয়া জলপথে চলাফেরা করা কঠিন ব্যাপার বলিয়া মিঃ কোলে একখানি মাঝারি হাউস-বোট সন্ধান করিয়া দিলেন। তাহাতে মালপত্র তুলিয়া এবং কয়েকজন অতিরিক্ত দাঁড়ি-মাঝি লইয়া স্বামীজী 'সদরবল' অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

আমাদের হাউস-বোটটি লম্বায় প্রায় ১০ হাত ও চওড়ায় ৬ হাত। ইহার ভিতরটি ঠিক বড়লোকের বৈঠকখানার ন্যায় আধুনিক ফ্যাসানে সজ্জিত। ইহাতে আছে সুসজ্জিত বৈঠকখানা, স্নানের ঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাইবার ঘর ও পায়খানা। বসিয়া হাওয়া খাইবার

১। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, ইতিপূর্বে রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর আসিবার সময় বাসের মালিক স্বামীজীকে যে সিটটি বাইশ টাকায় বেচিয়া অগ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহা পুনরায় ইঁহাকেই পঁয়ত্রিশ টাকায় বেচিয়াছিল।

জন্য ইহার ছাদের চতুর্দিকে রেলিং ও উপরে চন্দ্রাতপ দেওয়া আছে। ছাদে উঠিবার জন্য একটি সুন্দর কাঠের সিঁড়ি আছে। নৌকায় প্রায় পঞ্চাশখানি বিভিন্ন বিষয়ক ইংরাজী পুস্তক, দোয়াত, কলম, ব্লটিং প্যাড্ মায় ক্লিপটি পর্যন্ত, ছয়খানি বেতের ও তিনখানি গদি-আঁটা চেয়ার, দুইখানি পালং, দুইখানা বড় ও একখানা ছোট টেবিল, একটি আলমারি, চারটি ব্র্যাকেট, দুইটি আয়না, একটি বাথটাব, দুইটি কমোড্, একটি এনামেল জাগ ও বেসিন, প্রত্যেক ঘরের মেঝেতেই কার্পেট মোড়া ও সকল জানালা-দরজাতে পর্দা দেওয়া। রাত্রে আলো জ্বালিবারও বোটে সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। তিনটি হ্যারিকেন ল্যাম্প ও দুইটি ভাল টেবিল-ল্যাম্প আছে। এই সকল আসবাব বোট-এর মাঝির সম্পত্তি। ভাল হাউস-বোট মাত্রেই এইরূপ থাকে। এই প্রকারে সুসজ্জিত একটি হাউস-বোট-এর মাসিক ভাড়া পঁচাত্তর টাকা। রন্ধন করিবার, চাকরদের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র একটি বোট আছে, উহাকে 'কিচেন বোট' বলে। তাহার ভাড়া মাসিক কুড়ি টাকা ; ইহার ছাদ দেওয়াল প্রভৃতি সবই মাদুর দিয়া প্রস্তুত। ইহা লম্বায় একখানি বড় পানসির ন্যায় ও চওড়ায় চারি হাত। মাঝি তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি লইয়া এইখানিতেই থাকে। ইহারা পুরুষানুক্রমে নৌকাতেই বাস করে ও মাঝির কাজ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা সকলেই মুসলমান। কাশ্মীরে হিন্দু মাঝি নাই। পারাপারের জন্য আর একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আছে, ইহাকে 'শিকারা' বলে। ইহা দেখিতে বাংলাদেশের জেলে-ডিঙ্গির ন্যায়। ইহার ভাড়া মাসিক পাঁচ টাকা। নৌকার মাঝি বাজার করা, বাসন মাজা, হ্যারিকেন সাফ্ করা প্রভৃতি সকল প্রকার কাজকর্মই করিয়া থাকে, তজ্জন্য অতিরিক্ত কোন বেতন দিতে হয় না।

হাউস-বোট অপেক্ষা সস্তায় থাকিতে গেলে বোর্ডেড্-বোট লইতে হয়। ইহা হাউস-বোট অপেক্ষা অনেক ছোট, উহার ভিতরের আসবাবও হাউস-বোট অপেক্ষা অনেক কম। জলপথে ভ্রমণের পক্ষে ইহাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, কারণ ইহা খুব হাল্কা। বড় হাউস-বোট লইয়া বেড়াইতে দৈনিক প্রায় ১০।১২ টাকা খরচ পড়ে, কারণ উহা চালাইতে ১০।১২ জন অতিরিক্ত মাঝি-মাল্লার কমে হয় না। প্রত্যেক মাল্লাকে শ্রীনগরের ভিতরে আট আনা ও বাহিরে এক টাকা হিসাবে অতিরিক্ত মজুরী দিতে হয়। বোর্ডেড্-বোট-এ স্রোতের প্রতিকূলে চারজন ও স্রোতের অনুকূলে দুইজন মাল্লা হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, মাঝি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ইহার শেষের কামরাটিতে বাস করে। আলাদা কোন নৌকা থাকে না। ইহা অপেক্ষা আরও সস্তায় একপ্রকার নৌকা পাওয়া যায়, উহাকে 'ফার্স্ট ক্লাস ডুঙ্গা' কহে।[২] ইহা প্রায় বোর্ডেড্-বোট-এর মতোই, তবে ইহার দেওয়াল কাঠের নহে, মাদুরের। জানালা, দরজাও তদ্রূপ। কোন আসবাবপত্র নাই। ভিতরে একটা

২। কাশ্মীরের নৌকাগুলির ইংরাজি নাম দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না, কারণ পূর্বে কাশ্মীরের জলযানের মধ্যে একমাত্র মাদুরের ছাদবিশিষ্ট ডোঙ্গাই ছিল। পনেরো টাকা করিয়া উহা ভাড়া পাওয়া যাইত। এখন যে-সব হাউস-বোট, কিচেন-বোট প্রভৃতি হইয়াছে, এইগুলি সব ইংরাজ আমলে সৃষ্ট।

পার্টিসান্ আছে। মাঝি তাহার শেষের দিকে সপরিবারে বাস করে। এইপ্রকার একটি ডোঙ্গার মাসিক ভাড়া পঁয়ত্রিশ টাকা। অতিশয় সস্তায় কাশ্মীরে বাস করিবার পক্ষে এইগুলি উপযুক্ত, কিন্তু সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে এগুলি নিরাপদ নহে। কাশ্মীরে দাঁড়ের প্রচলন নাই। 'চাপা' বা 'চাঁপা' নামক একপ্রকার কাঠের তাড়ুর দ্বারা নৌকা চালানো হয়। হরতনের আকারবিশিষ্ট একটি কাঠের থালার সহিত একটি ২।৩ হাত লম্বা কাঠের লাঠি জোড়া দিয়া এইগুলি নির্মিত হয়। উপরোক্ত যাবতীয় নৌকার তলাই চ্যাপ্টা। বাংলাদেশের নৌকার ন্যায় কাশ্মীরের কোন নৌকার তলাই গোলাকার নহে। শীতকালে যখন এই দেশের নদীগুলিতে জল খুব কমিয়া বা জমিয়া বরফ হইয়া যায়, তখন তলা চ্যাপ্টা বলিয়াই এইসকল নৌকা তাহার উপর দিয়া চালানো সম্ভবপর হয়। তলা গোল হইলে বরফ ঠেলিয়া একপেশে হইয়া যাইত, কিন্তু ঝড়ের সময় বা প্রবল স্রোতযুক্ত জলে এইগুলি আদৌ উপযোগী নহে, সহজেই উল্টাইয়া যায়।

স্থানীয় রাজ্যের আইন অনুসারে প্রত্যেক বোট-এর এক একটি নাম ও নম্বর আছে। আমাদের পূর্বের সরকারী হাউস-বোটটির নম্বর ছিল ৫, এখনকারটির ৫৪৭ এবং নাম কিউকাম্বার। যে ঘাটে হাউস-বোট থাকে সেই ঘাটের ঠিকানায় চিঠিপত্রাদি আসিয়া থাকে। সমগ্র কাশ্মীরে প্রায় পনেরো শত বিভিন্ন আকারের হাউস-বোট আছে। শ্রীনগর শহরতলীর মধ্যে প্রথম সেতুর নিকট হাউস-বোট রাখিলে মাসিক তিন টাকা হারে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হয়। এক মাসের কম থাকিলেও এক মাসের খাজনা দিবার নিয়ম। যিনি হাউস-বোট ভাড়া লন তাঁহাকেই এই খাজনা দিতে হয়। শ্রীনগরের ভিতর থাকিলে বোট-এ ইলেকট্রিক আলো পাইবার সুবিধা পাওয়া যায়। ইহাতে খরচও খুব অল্প। প্রত্যেক ইলেক্ট্রিক আলোটির মাসিক ব্যয় আট আনা মাত্র। মাসে এক টাকা দিলে হাউস-বোটে দু'বেলা মেথর পাওয়া যায়। সঙ্গে একটি প্রাইমাস স্টোভ, একটি ইক্‌মিক কুকার এবং কিছু অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র থাকিলেই রন্ধনের সকল কার্য অতি সহজে সম্পন্ন হয়। শ্রীনগরের বাহিরে বেড়াইতে যাইবার সময় রন্ধনাদির যাবতীয় আয়োজন নৌকায় সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, কারণ পথে-ঘাটে সকল দিন সকল সামগ্রী সুবিধামত পাওয়া যায় না।

প্রাতে আট ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া বৈকালে তিন ঘটিকার সময় আমাদের নৌকা সাদিপুরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। শ্রীনগর হইতে সাদিপুর পর্যন্ত নৌকা বেশ সহজেই আসিল, কারণ এই দিকটা স্রোতের অনুকূলে। শ্রীনগর হইতে সাদিপুর স্থলপথে এগারো মাইল এবং জলপথে তদপেক্ষা কিছু অধিক। সাদিপুরের চতুর্দিকস্থ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি বরফে চিক্-চিক্ করিতেছে ; নানাবিধ পার্বত্য পক্ষীসকল উড়িতেছে ; চানার গাছগুলি লাল, সবুজ ও হল্‌দে পাতায় দিক আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; বহু দূর হইতে এইসকল দেখিতে দেখিতে আমরা গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি ঘাটের নিকট হাউস-বোট নোঙ্গর করা হইল। সিন্ধুনদ ও বিতস্তা নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া লোকে এই স্থানকে চলিত কথায়

সাদিপুর বলে। এই স্থানের প্রাচীন নাম 'পরিত্রাণপুর'। অষ্টম শতাব্দীতে এইস্থানে রাজা ললিতাদিত্যের রাজধানী ছিল। পরের ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শঙ্কর বর্মণ এইস্থান হইতে রাজধানী উঠাইয়া 'পত্তন' নামক স্থানে লইয়া যান। অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখনও এইস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাদিপুর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। স্বামীজী এইস্থানে একরাত্রি বাস করিয়া চারিদিক বেড়াইয়া দেখিতে গেলেন। ঘাটের নিকটেই একটি সরকারী বিশ্রামাগার আছে। উহাতে সকলেই বিনা ভাড়ায় তিনদিন থাকিতে পারে। গ্রামের চারিধারেই শালিধান্যের ক্ষেত্র। গ্রামখানি নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। ঘাটের অল্প দূরে একটি বাজার আছে। তথায় আলু, মৎস্য, আটা, মাখন, চাউল-ডাল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পাওয়া যায়। কয়েকজন সাহেব-মেম নদীর অপর পারে হাউস-বোট-এ বাস করিতেছেন। অনেকে সারাটি গ্রীষ্মকাল এইস্থানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

বিতস্তার জল শ্রীনগর শহরের ময়লা ও আবর্জনাতে এরূপ দূষিত যে, কেহই উহা পান করিতে পারে না। ঝরণার জল তীর হইতে আনিয়া পানের জন্য নৌকায় রাখিতে হয়, কিন্তু সিন্ধুনদের জল অতি উৎকৃষ্ট, সকলেই উহা পান করে। এই জল বরাবর পাহাড় হইতে আসিতেছে বলিয়া খুব স্বচ্ছ ও নির্দোষ। এত নির্মল জল অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জলের ৭।৮ হাত তলার ক্ষুদ্র নুড়ি ও মৎস্যগুলির আকৃতি সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বোট-এর মাঝি 'মামদু' অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকটি মৎস্য বল্লম দিয়া গাঁথিয়া ফেলিল। মৎস্যগুলি মৃগেল জাতীয় (হোয়াইট ট্রাউট), খুব সুস্বাদু ও রাঁধিলে বেশ নরম হয়। তুষার-গলা বলিয়া এই নদের জল অত্যন্ত শীতল। এমনকি দুই মিনিটকাল জলে দাঁড়াইয়া থাকিলে পা অসাড় হইয়া যায়। প্রাতঃকাল অপেক্ষা অপরাহ্ণে নদের জল বৃদ্ধি পায়, কারণ পাহাড়ের উপর রাত্রে যে-সকল বরফ পড়ে সেগুলি দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপে গলিয়া নদে আসিয়া মিলিত হয়।

'সাদিপুর' হইতে আমরা 'মানসবল' নামক একটি রমণীয় হ্রদ দেখিতে গেলাম। জলপথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা নদীতীরস্থ 'সম্বল' নামক একখানি বৃহৎ গ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। এইস্থান হইতে একটি একটি নালা দিয়া 'মানসবল' যাইতে হয়। গ্রামখানির এক পার্শ্বে 'আহা তেঙ্গ' নামক একটি পাহাড় রহিয়াছে। সেতুর নিকটস্থ কতিপয় চানার বৃক্ষের শোভা অতি মনোহর দেখাইতেছে। সম্বলে অনেক মৎস্যজীবীর বাস। আমাদের মাঝি এইস্থান হইতে কিছু মৎস্য কিনিল। এইমাত্র ধরা কতকগুলি মৃগেল জাতীয় ছোট ছোট মাছের ওজন আন্দাজ দেড় সের, মূল্য তিন আনা মাত্র।

'মানসবল' হ্রদটি দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল। ইহার একদিকে 'আহা তেঙ্গ' পাহাড় ও অন্যদিকে একটি উচ্চ অধিত্যকাভূমি। হ্রদটির গভীরতা অত্যন্ত অধিক, সেইজন্য ইহার জল বেশ পরিষ্কার। উত্তরদিক দিয়া সিন্ধুনদের এক শাখা আসিয়া এই হ্রদে পতিত হইয়াছে। ঐ স্থান দিয়া পদব্রজে 'গন্ধরবল' যাইবার এক পথ আছে। উহা সাত মাইল

দীর্ঘ। অন্যদিকে একটি মুসলমান ফকিরের কবরস্থান ও গুহা আছে। উহার নিকটেই এক পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। মন্দিরের অন্যান্য সকল অংশই জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, কেবল উহার প্রাণ সাক্ষীস্বরূপ ছাদটির কিয়দংশ এখনও জলের উপরিভাগে জাগিয়া আছে। 'আহা তেঙ্গ' পাহাড়ের পাদদেশে 'কুন্দবল' নামক একখানি গ্রাম রহিয়াছে। সেখানে অনেকে পাথর পুড়াইয়া চুন তৈয়ারী করে। 'আহা তেঙ্গ' পাহাড়ে বিস্তর চুনাপাথর (লাইমস্টোন) পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাধের প্রমোদ-উদ্যান 'দারোগা বাগ'-এর ধ্বংসাবশেষ। তিনি নূরজাহানের জন্য এই বাগান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই উভয় স্থানেই আপেল, নাশপাতি, আলুবোখারা, আখরোট, পীচ, আঙ্গুর প্রভৃতি কাশ্মীরী মেওয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানি গ্রামে বিস্তর পতিত জমি রহিয়াছে। তথায় ভ্রমণকারী ও শিকারীগণ আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া বাস করেন। এইস্থানের কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, ঝরণা ও পুষ্করিণী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইহার নিকটবর্তী পাহাড়গুলিতে কাশ্মীরের রাজপুত্র মধ্যে মধ্যে সদলবলে ভল্লুক শিকার করিতে আসেন। অন্য কোন শিকারী বিনা অনুমতিতে পশু শিকার করিতে পারে না, এমনকি, হ্রদের বা খালের মধ্যে মৎস্য ধরিবারও নিয়ম নাই। মৎস্য ধরিবার খাজনা মাসিক পাঁচ টাকা। কাশ্মীরের হ্রদগুলিতে মাইলের পর মাইল স্থান লইয়া যেরূপ অজস্র পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে, ভারতে আর কোথাও সেরূপ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় না। এই মনোহর দৃশ্য যিনি একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কাশ্মীর যে ভূস্বর্গ সে সম্বন্ধে তাঁহার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। পূর্বে বলা হইয়াছিল যে, কাশ্মীরের মহারাজা-বাহাদুর প্রত্যহ ১০০৮টি পদ্মফুল দিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এইসকল হ্রদ হইতে সংগ্রহ করা হয়। মহারাজার দৈনিক পূজার পদ্মফুল সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত আছে। অন্য কোন ব্যক্তি এইসকল পদ্ম তুলিতে পারে না, তুলিলে জরিমানা হয়। আমরা দুই পয়সায় অনেকগুলি বড় বড় পদ্ম-বীজ কিনিলাম। এইগুলির শাঁস খাইতে অতি উপাদেয়। এই হ্রদের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে পদ্ম-মধু যথেষ্ট পাওয়া যায়। কাশ্মীরের হ্রদগুলির মধ্যে 'মানসবল' সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভূবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, শ্রীনগরের আশেপাশে 'দাল,' 'উলার,' 'মানসবল' প্রভৃতি পাশাপাশি যে-সকল হ্রদ আছে এইগুলি প্রাচীনকালে একটিমাত্র বৃহৎ হ্রদ ছিল। উহার নাম ছিল 'সতি সাগর', কালক্রমে উহা শুকাইয়া গিয়া এই সকল হ্রদে পরিণত হইয়াছে।

আমরা 'দাল' ও 'মানসবল' হ্রদ দেখিলাম। বাকি রহিল 'উলার' হ্রদ দেখা। এইবার আমরা এইস্থান হইতে উহা দেখিতে চলিলাম। সিন্ধুনদে প্রবেশ না করিয়া নৌকা বরাবর বিতস্তার উপর দিয়া যাইতে লাগিল এবং প্রাতঃকালে 'সাদিপুর' হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় 'উলার' হ্রদে আসিয়া পৌঁছিলাম। বিতস্তা নদী এখানে বরাবর 'উলার' হ্রদে পতিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ক্ষীরভবানী দর্শন ॥

শ্রীনগর হইতে 'বন্দীপুর' যাইবার পথে 'সম্বল'-এর নিকট নদী পার হইয়া 'মানসবল' হ্রদের নিকট দিয়া স্থলপথে 'উলার' হ্রদে গমন করা চলে। 'সম্বল' হইতে 'মানসবল' দুই মাইল। পথ উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। কতকগুলি মাঠ ও পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যাইয়া 'অজস' ও 'সদরকোট' নামক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইলেই উলার হ্রদে পৌঁছানো যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে হ্রদটি জলে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে, উক্ত গ্রামের অনেকাংশই ডুবিয়া যায়, কিন্তু শীতকালে জল কমিয়া যাওয়াতে হ্রদটি গ্রাম হইতে বহু মাইল দূরে সরিয়া যায়। এই হ্রদের জল অত্যন্ত অপরিষ্কার, আদৌ পানের উপযুক্ত নয়। হ্রদের সমস্ত জলই বিতস্তার জল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালে হ্রদের জল অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়াতে কুলের কোন সীমার ঠিক থাকে না, ১৫।১৬ মাইল বিস্তৃত জলরাশি অসংখ্য পর্বতমালার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে। সেই সময়ে হাউস-বোট ও শিকারা লইয়া উহার উপর দিয়া গমন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতি প্রত্যুষকাল ব্যতীত অন্য সময়ে কেহ উহার উপর দিয়া নৌকা চালায় না, কারণ বেলা নয়টার পর হইতে সমস্তদিন হ্রদের উপর প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। সময় সময় পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলি হইতে হঠাৎ সাইক্লোনের মতো প্রবল ঘূর্ণিবায়ু নামিয়া আসিয়া নৌকাদি যাহা সম্মুখে পায় উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। এই প্রকারে বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন এই প্রবল ঝড় পার্শ্ববর্তী 'হরমুখ' পর্বতের উপত্যকা হইতে আসিয়া থাকে।

যে স্থানে বিতস্তা (বিয়াস) নদী হ্রদের সহিত মিশিয়াছে তাহার অনতিদূরেই পূর্বদিকে হ্রদের উপর প্রায় পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ একটি গোলাকার দ্বীপ আছে। শীতকালে যখন হ্রদের জল একেবারে কমিয়া যায় তখন এই হ্রদের নানা স্থানে চড়া পড়িয়া যাওয়াতে পদব্রজেই ঐ দ্বীপে যাওয়া যায়, নচেৎ অন্য সময় নৌকায় যাইতে হয়। দ্বীপটির চারিদিকের জল পানিফল গাছের জঙ্গলে পূর্ণ। ইহার নাম 'সোনা লংকা'। ইহার চারিদিকে চারিটি প্রাচীন পাথর-বাঁধানো ঘাটের উপরে একটি শিব-মন্দির ও একটি মসজিদের এবং ৪ কোণে ৪টি গৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহা ছাড়া উপরে প্রাচীন পাথরের থাম, ঘরের মেঝে প্রভৃতি অসংখ্য চিহ্নসকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বকালে এইস্থানে সুন্দর অট্টালিকা, স্নানের ঘাট প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। এখন এইস্থানে কেহ বাস করে না। শিব-মন্দিরটি মসজিদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের ছাদ ও ভিতরের মূর্তি নাই। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির দেওয়ালের এবং খিলানগুলির কারুকার্য এখনও অল্প-স্বল্প

বর্তমান আছে দেখিলাম। ইহার খিলানগুলি ঠিক ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের গির্জার খিলানের মতো। মন্দিরটি দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা নির্মাণ করিতে কোন মশলার ব্যবহার হয় নাই। কেবল পাথরের উপর পাথরগুলি কৌশলে সাজাইয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে। এখন মন্দিরের সকল দিকের দেওয়ালই অল্প অল্প বিদ্যমান আছে। পূর্বে এইস্থানে একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর পড়িয়াছিল, এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া শ্রীনগরের যাদুঘরে রাখিয়া দিয়াছেন।

অনেকে বলেন, 'জৈনুলাবদীন' এইস্থানের মসজিদটি নির্মাণ করান। পূর্বে লোকে ইহাকে 'বারদ্বারী' কহিত। ইহার বিপরীত দিকে 'বাবা শুকুর-উদ্দীন' নামক এক পাহাড় আছে। হ্রদের গভীরতা এইস্থানেই সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐ পাহাড়ের মাথার উপর 'নুরউদ্দীন' নামক কোন বিখ্যাত মুসলমান গুরুর শিষ্যের এক 'জয়ারৎ' বিদ্যমান রহিয়াছে। এইস্থানের অনতিদূরেই হ্রদের জলে অনবরত বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঐস্থানের নিম্নে এক স্বাভাবিক ঝরণা (নেচারেল স্প্রিং) আছে। কাশ্মীরীরা উহাকে 'নাগ দেবতা' বলে। গ্রামবাসী হিন্দুগণ উহাকে 'বিষ্ণুর চক্র' বলিয়া পূজা করেন।

হ্রদের পশ্চিম-উত্তর কোণে বিখ্যাত 'হরমুখ' পর্বত অবস্থিত। পর্বত সমুদ্রতল হইতে ১৬,৯০০ ফিট উচ্চ। ইহার আটটি চূড়া, প্রত্যেক চূড়াই তুষারে চির-আবৃত। ইহার সর্বনিম্ন চূড়ার উচ্চতা ৬,০০০ হাজার ফিট। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ ই. এফ. নেভে ও মিঃ জি. ডবলিউ. মিলেইস্ ব্যতীত আজ পর্যন্ত অন্য কোন ভ্রমণকারী ইহার সর্বোচ্চ স্থানে উঠিতে সক্ষম হন নাই। এই পর্বতের দক্ষিণে বন্দীপুর শহর। এই শহরে বহু সাহেব-মেম হাউস-বোট লইয়া গ্রীষ্মবাস করেন। শহরটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক। নিম্নে গভীর জলরাশির গাম্ভীর্যময়ী শোভা দেখিয়া মুগ্ধ ভাবুক-হৃদয় অনন্তের কানে কানে কত কথা কহিতে থাকে। বহু শ্বেতাঙ্গ নরনারী হ্রদের তীরে ও পর্বতের পাদদেশে বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতেছে দেখিতে পাইলাম। তাহাদের ছেলেমেয়েরা বন্দুক হস্তে পক্ষী শিকার করিয়া ফিরিতেছে। দূরে তাহাদের বন্দুকের আওয়াজ মধ্যে মধ্যে পার্বত্য নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

বন্দীপুরে ডাকবাংলো, সরাই, ডাকঘর ও সাহেবদের খেলিবার স্থান প্রভৃতি আছে। ইহা ছাড়া এই স্থানে তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার সুন্দর সুন্দর জায়গাও আছে। হ্রদের নিকটে বলিয়া এইস্থানে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। বন্দীপুর হইয়া 'গিলগিট্' শহরে যাইবার পথ। ঐ স্থান বন্দীপুর হইতে ১৯৩½ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত, যাইতে তেরো দিন লাগে। প্রত্যহ সাড়ে এগারো হইতে আঠারো মাইল পথ গমন করিতে হয়। পদব্রজে না হয় ঘোড়ায় যাইতে হয়। প্রত্যেক দিনের গন্তব্য স্থানে ডাকবাংলো আছে এবং পথও যতদূর সম্ভব সহজ করা আছে। পথে বিশেষ কোন কঠিন চড়াই বা উৎরাই নাই। কেবল বন্দীপুর হইতে 'ত্রগ্‌বল' নামক একটি

৯,১৬০ ফিট উচ্চ পাহাড়ে নয় মাইলে মোট ৪,০০০ ফিট ক্রমাগত চড়াই করিতে হয়। অনেকে 'উলার' হ্রদের ও ইহার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য খুব ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ত্রগ্‌বলে গমন করেন। উপর হইতে পীরপঞ্জল ও হরমুখ পর্বতের দৃশ্য অতি মনোরম।

গ্রীষ্মকালে 'গিলগিট্'-এর পথে গরমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইতে হয়, কারণ পথ সাধারণতঃ ৪।৫ হাজার ফিট উচ্চস্থান দিয়া, যাতায়াতে শীত তত বেশী হয় না। কিন্তু শীতকালে এই পথে 'মণি' (য়্যাভালান্‌স্) খসিয়া পড়ার সম্ভাবনা অধিক। অতিকায় বরফখণ্ড পাহাড় হইতে মহাশব্দে খসিয়া পড়ে ও নিমেষের মধ্যে শত শত পথিককে লইয়া তীব্রগতিতে বহু নিম্নে চলিয়া যায়। এই প্রকারে কত লোকের যে প্রাণ গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা হয় না। সেইজন্য শীতকালে কেহ এই পথে প্রায় বড় একটা চলাচল করে না।

বন্দীপুরের পূর্বদিকে 'হাপ্ কিলেনমার্গ', 'নাগমার্গ' প্রভৃতি কতকগুলি অনতি-উচ্চ অধিত্যকাভূমি ও চিরতুষারাবৃত পাহাড় (গ্লেসিয়ার) বিশেষ দ্রষ্টব্য। বন্দীপুর শহরের পানীয় জল হাপ্ কিলেনমার্গের উপরের ঝরণা হইতে পাইপ দ্বারা নিম্নে আনীত হয়।

কাশ্মীরে গুলমার্গ, সোনমার্গ, কিলেনমার্গ, নাগমার্গ, টান্‌মার্গ প্রভৃতি বহু 'মার্গ'-ভাগান্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'মার্গ' শব্দের কাশ্মীরী অর্থ মালভূমি বা টেব্‌ল্ ল্যাণ্ড। ইহা ছাড়া 'শেষনাগ', 'অনন্তনাগ', 'হরনাগ', 'ভেরীনাগ' প্রভৃতি বহু 'নাগ'-ভাগান্ত নামও দেখিতে পাওয়া যায়। 'নাগ' শব্দের অর্থ সর্প। পর্বতের মাথায় যে তুষার জন্মে তাহা ক্রমশঃ চাপে চাপে নিম্নদিকে বাড়িতে বাড়িতে একেবারে মাটিতে আসিয়া ঠেকে। তখন দেখিলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে এক অতিকায় শ্বেত সর্প শুইয়া রহিয়াছে। ইহা হইতেই এই সকল চিরতুষারাবৃত পর্বতের নাম সর্প বা 'নাগ' হইয়াছে। অনেকে শিবের মাথার জটা ও সাপের সহিত ইহার তুলনা করেন।

গিলগিট্ শহর কাশ্মীররাজ্যের সৈন্যাবাস। ঐ স্থানে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ সর্বদা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে। ইহা কাশ্মীর তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তপ্রদেশ। এইস্থান দিয়া মধ্য-এশিয়া এবং রুশীয় তুর্কিস্থানে গমন করিবার সহজ পথ আছে। সেইজন্য কাশ্মীররাজ বহিঃশত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এইস্থানে প্রভূত সৈন্য ও নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া দিয়াছেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে গিল্‌গিট্ ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল না। ঐ বৎসর যখন ইয়াসিন-প্রদেশের রাজা গিল্‌গিট্ আক্রমণ করেন, তখন গিল্‌গিটের রাজা শিখ রাজের সাহায্য প্রার্থনা করায় শিখ সেনাপতি 'নাথু শাহ' আসিয়া গিল্‌গিট্ জয় করেন ও ইয়াসিন, হুনজা ও নাগির নামক তিনটি প্রদেশের তিনজন রাজার তিনটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হুন্‌জা রাজা গিল্‌গিট্ আক্রমণ করিয়া নাথু শাহকে

হত্যা করেন। পরে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসিন রাজা পুনরায় গিল্‌গিট্ আক্রমণ করিলে হুনজা-রাজের সাহায্যার্থ আষ্টররাজ যে সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট হয় ও তিনি নিজেও পরাজিত হইয়া হৃতরাজ্য হন। অতঃপর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে শিখ-সর্দার দেবী সিং গিল্‌গিট, আষ্টর, ইয়াসিন, হুন্‌জা[1] প্রভৃতি রাজ্যসকল জয় করেন ও সেই দিন হইতে এই সকল প্রদেশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। পরে এইসকল স্থানে নানাবিধ বিদ্রোহের সূচনা হওয়াতে ১৮৯১—৯২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ডিউরাণ বহু সৈন্য সমভিব্যহারে ঐ-প্রদেশে যাইয়া সকলকে পরাজিত করেন ও পামীর অধিত্যকা ও চীন-সীমান্ত পর্যন্ত কাশ্মীরের সীমানা নির্দেশ করিয়া দেন।

গিল্‌গিট প্রদেশ অত্যন্ত অনুর্বর, এমনকি এইস্থানের উৎপন্ন যব দ্বারা এই স্থানের সকল লোকের খাদ্যসংস্থান হয় না। তজ্জন্য এই দেশবাসীদিগকে সর্বদা কাশ্মীরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই প্রদেশবাসীদিগকে 'দার্দ' কহে। ইহাদের মুখ-চোখের গঠন ঠিক আর্যদের মতো, অন্যান্য পাহাড়ীদের মতো থেবড়া নহে। ইহারা দেখিতে অনেকটা পাঠানদের মতো, কিন্তু পাঠানদের মতো ততটা উগ্র প্রকৃতির ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নহে। কাফ্রিস্তান ব্যতীত এদিকের সকলেই সিয়া মুসলমান। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার সময় এই দুর্গম পথ দিয়া চিত্রলে আগমন করিয়াছিলেন। এইস্থান অপেক্ষা নিম্নতর গিরিবর্ত্ম কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ পর্বতমালায় আর নাই।

উলার হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে স্থান দিয়া বিতস্তা নদীটি বাহির হইয়া যাইতেছে তাহারই অনতিদূরে শিউপুর নামক একখানি সুন্দর গ্রাম আছে। গ্রামখানি পাহাড়ের পাদদেশে ও হ্রদের তটের উপর অবস্থিত বলিয়া এইস্থানের চারিদিকের দৃশ্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর। অনেক সাহেব-মেম হাউস-বোট লইয়া এইস্থানে গ্রীষ্মবাস করিয়া থাকেন। নিকটেই বরামূলা শহর থাকাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই তথা হইতে আনা যায়।

উলার হ্রদ দেখিয়া আমরা পুনরায় সাদিপুরে ফিরিয়া আসিলাম ও গন্ধরবল অভিমুখে রওনা হইলাম। সাদিপুর হইতে গন্ধরবল প্রায় সাত মাইল। সমস্ত পথ গুন টানিয়া স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে হইল। দূর হইতে গন্ধরবল গ্রামখানির ছবির মতো সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া কবিকল্পিত অতুল সৌন্দর্যময়ী গন্ধর্ব নগরীর কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সকল স্থানের অপূর্ব শোভারাশি সত্যই নিমেষে পর্যটকের

১। হুন্‌জা ও নাগির প্রদেশ দুইটি চারিদিকে তুঙ্গ-পর্বতমালা ও খরস্রোতা নদীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে বৈদেশিক শত্রু হঠাৎ এইস্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাতেই এই দেশবাসীরা নিরুপদ্রবে বাস করে। এই প্রদেশের মাটি খুব উর্বর ও নানা স্থানে খণ্ড খণ্ড জমিতে গম, যব, মূলা, ভূট্টা প্রভৃতির চাষ-আবাদ হয়। হুন্‌জারা 'মূলাই' সম্প্রদায়ের মুসলমান। নাগিররা সিয়া। এই প্রদেশের লোকসংখ্যা মোট ১৫,০০০ মাত্র। একজন ব্রিটিশ রাজস্ব-সচিব হুনজাতে থাকিয়া এই প্রদেশ শাসন করেন। এই প্রদেশের যাবতীয় নদীতেই অল্পাধিক সোনা পাওয়া যায়।

মন হরণ করে ও প্রবাসের সকল কষ্ট সার্থক করিয়া দেয়। শ্রীনগর হইতে গন্ধরবল সাড়ে বারো মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং এইস্থানের উচ্চতা শ্রীনগর অপেক্ষা ১০০০ ফিট অধিক। সেইজন্য জলপথে শ্রীনগর হইতে গন্ধরবলে আসিতে হইলে গুন টানিয়া আসিতে হয়। স্থলপথে যাতায়াতের জন্য শ্রীনগর হইতে গন্ধরবল পর্যন্ত একটি পাকা সড়ক আছে। উহাতে টাঙ্গা ও মোটর বেশ চলিতে পারে। মারলালা ও আঞ্চর হ্রদের পথেও এইস্থানে আসা চলে এবং ইহাতে দূরত্ব সাড়ে চৌদ্দ মাইল পড়ে। গন্ধরবলের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম তিনদিকে পাহাড় ও দক্ষিণ দিকে সিন্ধুনদ প্রবাহিত। সিন্ধুনদের উপর একটি পুরাতন ধরনের বিস্তৃত কাঠের সেতু। ইহার উপর দিয়া টাঙ্গা, মোটর প্রভৃতি বেশ চলিতে পারে। সেতুটির আগাগোড়াই কাঠ দিয়া প্রস্তুত, এমনকি জলের উপরিস্থিত থামগুলি পর্যন্ত। এই প্রকার সেতু কেবল কাশ্মীরেই দেখা যায়। এইস্থানে স্থলপথে শ্রীনগরে যাইবার একটি পাকা রাস্তা আছে। একটি ডাক ও তার ঘর, একটি ডাকবাংলো এবং একটি কাছারি আছে। একটি ছোট বাজার আছে, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মোটামুটিভাবে পাওয়া যায়।

জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত এইস্থান লোকে ভরপুর থাকে। নানা দেশ-বিদেশ হইতে বহু সাহেব-মেম ও দেশীয় ধনী লোকেরা শ্রীনগর হইতে হাউস-বোট লইয়া এই স্থানে আসিয়া গ্রীষ্মবাস করেন। এই সময় প্রায় এক শত হাউস-বোট সিন্ধুনদের তীর বেষ্টন করিয়া বিরাজ করে। সাহেবদের অশ্বের হ্রেষা রব, মোটরের বংশীধ্বনি ও বাবুর্চি-খানসামাদের হাঁকডাকে এইস্থানের পথঘাট সর্বদা মুখরিত থাকে। ক্ষুদ্র বাজারটি গ্রীষ্মকালে সাহেবদের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া একটু বৃহদাকার ধারণ করে। চৌকিদারেরা দিনে ও রাত্রে নিয়মমতো পাহারা দিতে থাকে। পাউরুটি, ফল ও খবরের কাগজওয়ালারা এই সময় নিয়মিতভাবে শ্রীনগর হইতে আসা-যাওয়া করিতে থাকে। কেবল এই কয় মাসের জন্য একটি সরকারী হাসপাতালও বসে। দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীনগর খুব গরম হইয়া উঠিলেও এই স্থান বিশেষ ঠাণ্ডা থাকে এবং ব্যারোমিটারে তাপ কদাচ ৮০ ডিগ্রীর অধিক উঠে না। চানার গাছগুলির পাতা এই সময় সম্পূর্ণ সবুজই থাকে ও পাহাড়ের উপরিস্থিত তুষারসকল ক্রমশঃই গলিতে থাকে।

গন্ধরবল হইতে তিন মাইল উত্তরে ক্ষীরভবানীদেবীর মন্দির অবস্থিত। পথ একটি খালের ধার দিয়া গিয়াছে ও বেশ চওড়া। টাঙ্গা বেশ চলিতে পারে। পথের দুই ধারে নীল, লাল, সবুজ, হল্‌দে প্রভৃতি নানা বর্ণের বন্যফুলসকল অসংখ্য ফুটিয়া থাকে। রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃহৎ ও পুরাতন চানার গাছের শ্রেণী। যে সকল পুরাতন চানার গাছের বয়স দুই শত বৎসরের অধিক হয় সেইগুলির গুঁড়ির ভিতরের কাঠ পচিয়া বাহির হইয়া যায়, কেবল খুব মোটা ছালের উপর বৃহৎ গাছটা দাঁড়াইয়া থাকে। তখন সেই গহ্বরের ভিতর ৩।৪ জন মানুষ অনায়াসে বসিতে পারে। চানার গাছগুলি ঠাণ্ডাদেশেই জন্মে। ইহার পাতা ও ফল অনেকটা এরণ্ডের পাতা ও ফলের মতো।

ইহার ফল কোন কাজে আসে না। বড় গাছগুলি লম্বায় প্রায় ৮০।৯০ ফিট হয় ও গুঁড়িটি ৩।৪ জন লোকেও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ইহার নূতন পাতা হয় ও সেই সময় রং সবুজ থাকে। শীত পড়িতে থাকিলে ক্রমে পাতাগুলি প্রথমে হল্‌দে ও গোলাপী, পরে ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে। স্বামীজী বলিলেন, "নভেম্বর মাসে তুষারজনিত ঠাণ্ডার জন্য এই প্রকার পরিবর্তন হয়। আমেরিকার ম্যাপ্‌ল্‌ প্রভৃতি গাছের পাতাও এইরূপ হয়।" সেই সময় গাছগুলির দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়, অনেকে শুধু এই দৃশ্য দেখিবার জন্যই কাশ্মীরে আসিয়া থাকেন। মনে হয় ঠিক যেন চানার বাগানে আগুন লাগিয়াছে। ক্রমে পাতা এত ঝরিতে থাকে যে রাস্তা, বাগানসুদ্ধ চানার পাতায় ভরিয়া উঠে। শীতকালে আগুন তাপিবার জন্য গ্রামবাসীরা এই সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখে।

গন্ধরবল হইতে তিন মাইল আসিলে একখানি গ্রাম পাওয়া যায়। গ্রামখানির নাম 'তুল-মুল'। গ্রামখানিতে প্রবেশ করিলেই ঠিক বাংলাদেশের একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিয়া ভ্রম হয়। পথের দুইধারে পচা জলপূর্ণ নর্দমা, ভাঙা বেড়া, বন-জঙ্গলপূর্ণ বাগান ও ভাঙা বাড়ী। বাড়ীগুলি কাঠের নির্মিত ও ছাদের উপর ঘাস, ফুল গাছ প্রভৃতি রোপিত। এই সকল ছাদ এক অদ্ভুত উপায়ে নির্মিত। প্রথমে ২।৩ হাত পুরু ভূর্জপত্র রাখিয়া তাহার উপর আধহাত পুরু ছোট ছোট ডালপালা রাখিয়া তদুপরি মাটি দেওয়া হয়। এদেশে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না, তাই পাকা ছাদের দরকারও কখন হয় না। অবশ্য শ্রীনগর, গুলমার্গ প্রভৃতি অনেক শহরে ধনীলোকেরা ইট, চূণ, সুরকি ও টিন প্রভৃতি দিয়া আধুনিকভাবে ছাদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা এখনও তাহা শিখে নাই। এই সকল বাড়ীর প্রায় চারিদিকই খোলা। ভীষণ শীতকালে বরফের ভিতর কিরূপে ইহারা এই খোলা ঘরে বাস করে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। ইহাদের যথেষ্ট গরম কাপড়ও নাই। একটি মোটা আলখাল্লা মাত্রই তাহাদের সম্বল ; পায়ে জুতা খুব কম লোকেই পরে, তবে খড়ম সকলেই ব্যবহার করে, এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত। মস্তকে একটি সাদা চাদরের পাগড়ী, কপালে একটি জাফ্রানের টিপ, গায়ে আলখাল্লা ও পায়ে খড়ম—এই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পোশাক। এই দেশের ব্রাহ্মণকে 'পণ্ডিত' বলে। ব্রাহ্মণীদের 'পণ্ডিতানী' বলে। পণ্ডিতানীদের পোশাকও এই একই প্রকার, কেবল মাথায় পাগড়ী না দিয়া ইহারা সাদা রুমাল বাঁধে ও তাহাতে ৪।৫টি লম্বা ঝুমকা ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষরা রন্ধন, পরিবেশন প্রভৃতি পবিত্র কার্যের সময় আলখাল্লা (ফেরাঙ্গ) ও পাগড়ি খুলিয়া রাখেন, কেবল কৌপীন ও খড়ম পরিয়া থাকেন এবং কখন কখন বা একটি ছোট কুর্তা গায়ে রাখেন। মুসলমানদিগের পোশাকও প্রায় একই প্রকার, কেবল তাহারা কপালে টিপ পরে না ও তাহাদের পাগড়ি বাঁধিবার কায়দা সম্পূর্ণ আলাদা। অধিকাংশ মুসলমানের মাথাই চুলশূন্য ও ঘায়ে ভরা। অনবরত ময়লা টুপি পরিয়া থাকার দরুন ইহাদের এইরূপ দুর্দশা হইয়া থাকে। হঠাৎ ইহাদের কথা শুনিলে মনে হয় ঠিক যেন

কাবুলীওয়ালা কথা কহিতেছে, কিন্তু ইহাদের ভাষা বহু অংশে সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। "কোথায় যাইতেছ" বলিতে ইহারা বলেন "কুতর গচ্ছ" ; ইহা সংস্কৃত 'কুত্র গচ্ছতি'র সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত। ব্যাঙকে ইহারা বলেন 'মণ্ডুক'—সংস্কৃতেও তাহাই। কিন্তু ইহাদের বর্ণমালা বহু অংশে মাড়োয়ারী ও নাগরীর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। দুই একটি অক্ষরে সংস্কৃত ব্রাহ্মী বর্ণমালারও সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিত ও পণ্ডিতানীদের গায়ের রং শুভ্রবর্ণ। একটিও কালো বর্ণের ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী কাশ্মীরে নাই।

এই প্রদেশে হিন্দু বলিলে একমাত্র ব্রাহ্মণই বুঝায়। কারণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি অন্যান্য জাতি কাশ্মীরে নাই। এই দেশে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা তিন জন মাত্র। অবশিষ্ট সমুদয় মুসলমান। ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেন না[২] ; করিলে ইহাদিগকে সমাজের চক্ষে হীন হইতে হয়। দেশের বাকী যাবতীয় কাজই মুসলমানগণ করিয়া থাকেন। মুসলমানগণের গায়ের রং ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা ময়লা। এই দেশের মুসলমানগণের পূর্বপুরুষগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান বাদশাহের তরবারীর প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর হইতেই এই প্রদেশে মুসলমান ধর্মের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। আলাউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান শাসনকর্তা এই ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী হন। ইঁহারা যে পূর্বে হিন্দু ছিলেন তাহা এখনও স্বীকার করেন। এখনও তাহার চিহ্ন ইঁহাদের অনেকের নামের সহিত বর্তমান রহিয়াছে। এখানকার একজন বিখ্যাত মুসলমান শালওয়ালার নাম পণ্ডিত আমাদুল্লা। মুসলমান হইয়া নানা জাতীয় মুসলমানের সহিত সামাজিক মিশ্রণে ইঁহারা দৈহিক আকৃতির পূর্ব গৌরশ্রী হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। যথেষ্ট শীতবস্ত্রশূন্য কাশ্মীরী হিন্দু-মুসলমানগণ একমাত্র 'কাংড়ি'-কেই অবলম্বন করিয়া ভীষণ শীতে আত্মরক্ষা করেন। 'কাংড়ি' ইঁহাদের একটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। বেতের ছোট চুপড়ির ভিতর একটি ছোট মাটির মালসা, ইহাতে আগুন থাকে। ইহা ধরিবার একটি হাতল আছে। উঠিতে, বসিতে, শুইতে জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ একটি 'কাংড়ি' মেয়ে পুরুষ সকলের আলখাল্লার (ফেরাঙ্গ) ভিতর গলা হইতে ঝুলান থাকে। ইঁহাদের অভ্যাস এমনই সুন্দর যে, নিদ্রাকালে অসাবধান হইয়া ইঁহারা কখনও কাংড়িটি উল্টাইয়া ফেলেন না। যদিও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুর্ঘটনা শুনা গিয়া থাকে তথাপি তাহা খুবই কম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই প্রায় ঐরূপ করিয়া থাকে। ফেরাঙ্গের ভিতর অনবরত আগুনপূর্ণ কাংড়িটি রাখার ফলে ইহাদের বক্ষস্থল ও তলপেটের চর্ম ঝলসাইয়া বিবর্ণ হইয়া যায়।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইঁহাদের আহার বাঙ্গালীর ন্যায় দুই বেলাই ভাত। রুটি ইঁহারা খুব কমই খান। ওলকপির পাতাকে ইঁহারা কড়ম শাক বলেন। ইহার

২। অবশ্য কাশ্মীর মহারাজা বাহাদুরের খাজনা, তহশীল প্রভৃতি বিভাগে দুই-চারিজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

ঝোল ইঁহাদের অতি উপাদেয় ও প্রিয় তরকারী। ইহা ছাড়া প্রায় সকল প্রকার শাকসব্জীই এই দেশে অল্পাধিক পাওয়া যায়। ইঁহারা ডাল তরকারীতে লবণ ও লঙ্কা অত্যন্ত অধিক দিয়া থাকেন। শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ডুবিয়া থাকে, তখন এই দেশে কোন টাট্‌কা শাকসব্জী পাওয়া যায় না। শুষ্ক বেগুন, শালগম, ওলকপি, শুষ্ক টমেটো প্রভৃতি তখন তাঁহাদের অবলম্বন হয়। প্রত্যেক পরিবারই শীতের প্রারম্ভে তরকারী শুকাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। চা, মেয়ে-পুরুষ সর্বদাই পান করিয়া থাকেন। গাডুর মতো একপ্রকার পিতলের জাগের ভিতর একটি ক্ষুদ্র পাত্রে আগুন রাখিয়া ইঁহারা চা প্রস্তুত করেন ও এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতলের বাটিতে ইঁহারা চা পান করেন। হাত দিয়া কোন খাইবার জিনিস ধরা ইঁহাদের দেশাচার-বিরুদ্ধ। আলখাল্লার লম্বা হাতার দ্বারা বাটি ধরিয়া ইঁহারা চা পান করেন। মাটি বা মেজের উপর পাত্র রাখিয়া আহার করাও ইঁহাদের দেশাচার-বিরুদ্ধ। আহারের সময় পাঞ্জাবীদের ন্যায় মেজেতে মাদুর বা চাদর পাতিয়া তাহার উপর পাত্র রাখিয়া ইঁহারা আহার করিয়া থাকেন।

গ্রীষ্মকালের ২।৩ মাস ছাড়া এই প্রদেশের লোকেরা বৎসরের অন্যান্য সময় স্নান করে না। ঘাটে ফেরাঙ্গ রাখিয়া নদীতে বিবস্ত্র হইয়া গলা অবধি জলে অবগাহন করে, মাথা ভিজায় না। মেয়ে পুরুষ সকলেরই এই অভ্যাস। অনেক সময় পুরুষদিগের পরিধানে একটি কৌপীন থাকে, কিন্তু মেয়েদের তাহাও থাকে না। ইহারা স্নান করিয়া গা মুছে না এবং তৈল, সাবান, তোয়ালে অথবা গামছার ব্যবহার জানে না।[৩] কেবল কৌপীনটা বদলায়। পোশাক কদাচিৎ ধৌত করে, সেইজন্য ইহাদের প্রত্যেকের গা, মাথা আলখাল্লা (ফেরাঙ্গ) "ধুঁয়া" নামক একপ্রকার শ্বেত বর্ণের উকুনে পরিপূর্ণ। এইসকল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন,—"হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে কেন যে স্নানের এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে ও শীতকালে কয়েকটি পর্বে স্নান করিলে শতজন্মের পাপক্ষয়, শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ, স্বর্গ গমন প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া লোককে স্নান করাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ইহাদের দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"

তুলমুল গ্রামের প্রান্তভাগেই ক্ষীরভবানীদেবীর মন্দির অবস্থিত। একটি ৮০।৯০ হাত লম্বা ত্রিকোণ জমির তিনদিকে ১০।১২ হাত চওড়া একটি খাল দ্বারা বেষ্টিত। ইহারই মধ্যস্থলে একটি ১৫।১৬ হাত চওড়া জলের কুণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র শ্বেতপাথরের মন্দির অবস্থিত।

এই মন্দিরটির ভিতরেই ক্ষীর ভবানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্তি। এইস্থানের তিন দিকে যে খাল রহিয়াছে তাহাকে ক্ষীরসাগর বলে। খালের জল বেশ পরিষ্কার ও স্রোতযুক্ত। ইহা তিন মাইল দক্ষিণে যাইয়া সিন্ধুনদে পড়িয়াছে। অনেকে নৌকা করিয়া এই খাল দিয়া এইস্থানে আসিয়া

৩। কাশ্মীরের প্রাচীন প্রথাসমূহ পালনকারী ও আধুনিক যুগের সংস্পর্শহীন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে উক্ত। শ্রীনগর, গুলমার্গ প্রভৃতি শহরে যাঁহারা আধুনিকভাবে শিক্ষিত তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

থাকেন। মন্দিরটি কাশ্মীর রাজ্যের ধর্মার্থ বিভাগের অধীনে। ইহার প্রবেশদ্বারে একটি সাইন বোর্ডে লিখিত আছে ঃ 'কেহ ভিতরে জুতা পরিয়া যাইতে পারিবেন না।' মহারাজ প্রতাপসিংহ বাহাদুর অত্যন্ত সাধু-সন্ন্যাসীপ্রিয় ছিলেন। তিনিই এইস্থানের মর্মর পাথরের মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, মন্দিরের ভিতরের মূর্তিটি এই কুণ্ডের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কুণ্ডের চারিদিকের পাড় পাথরে নির্মিত ও রেলিং দিয়া ঘেরা। অনেকগুলি নিশান কুণ্ডের চারিদিকে বাঁধা আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে মানুষ সর্বব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। শুনিলাম এই কুণ্ডের জলের রং মধ্যে মধ্যে বদলাইয়া থাকে। কোন কোন ধনবান যাত্রী আসিয়া এই কুণ্ডে এক মণ দেড় মণ ক্ষীর বা দুধ ঢালিয়া যান। সেই দুধ পচিয়া গেলে বুদ্‌বুদ্ উঠে, তাহাতে সূর্যকিরণ পড়িলে রং বদলায়।

ক্ষীরভবানীর মন্দিরের আশেপাশে কতকগুলি চানার, আমলকী প্রভৃতি গাছ ও ৩।৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। সেগুলিতে মহাবীর, দুর্গা, বুদ্ধ প্রভৃতির প্রাচীন প্রস্তর-মূর্তি আছে। একপাশে সাধুদিগের থাকিবার একটি ধর্মশালা ও একটি ছোট মুদির দোকান আছে। তথায় ফুল, বেলপাতা, বাতাসা প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়।

ক্ষীরভবানীর মন্দির হইতে ফিরিয়া হাউস-বোটে আসিয়া স্বামীজী বলিলেন ঃ "এই পথে গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তিব্বত থেকে ফিরে এসেছিলেন। আমারও ইচ্ছা যে, এই পথ দিয়ে তিব্বত দেখে আসি।"

এই কথার পর স্বামীজী তিব্বত যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। কাশ্মীরের প্রধান রাজকর্মচারী মুতাবিদ্ দরবার মহাশয় এই সময় গন্ধরবলে বাস করিতেছিলেন। তিনি পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামীজীকে দেখিবার জন্য আমাদের বোটে আসিলেন। আমরা তিব্বত যাইতেছি শুনিয়া তিনি একজন বিশ্বাসী মুসলমান দোভাষী পথ-প্রদর্শকের নাম, ধাম, লিখিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং বোটের মাঝিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমরা যেসকল দ্রব্যাদি তাহার নৌকায় রাখিয়া যাইতেছি তাহা যেন আদৌ নষ্ট না হয়। গ্রামের চৌকিদারকেও হুকুম দিলেন, সে যেন আমরা যতদিন না ফিরিয়া আসি প্রত্যহ আসিয়া আমাদের বোটের খবর লইয়া যায় এবং তিব্বতের 'লে' শহরের উজির ও 'কার্গিল' শহরের তহশীলদার মহাশয়ের নামে দুইখানি পরিচয়পত্র স্বামীজীর হস্তে প্রদান করিলেন।

প্রবাসে অপরিচিতের নিকট এতখানি উপকার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে আমরা দুইটি মালবাহী ঘোড়ায় একটি তাঁবু ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাপাইয়া শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে সিন্ধুনদের ধার দিয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা পদব্রজেই বাহির হইলাম। পূজনীয় স্বামীজী বলিলেন ঃ "আমার হেঁটে হিমালয় পার হবার ইচ্ছা আছে, দেখা যাক্ কত দূর হেঁটে যেতে পারা যায়, তারপর কোথাও থেকে ঘোড়া ভাড়া করা যাবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ হিমালয় অতিক্রম ॥

আমাদিগের অদ্যকার 'পড়াও'[১] কংগণ নামক গ্রাম। ঐ গ্রামটি গন্ধরবল হইতে সাড়ে এগারো মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ঐ স্থানে আজ আমাদিগকে পৌঁছাইতেই হইবে, কারণ পথে অন্য কোন স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা নাই। এই পথে ভ্রমণকারীগণ কোন্ দিন কোন্ স্থান পর্যন্ত গমন করিবেন তাহা ঠিক পর পর পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট করা আছে। তাঁহাদের সুবিধার জন্য ঘোড়া, কাষ্ঠ, খাদ্যাদিরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকে। এই কার্যের জন্য প্রত্যেক গ্রামে ঠিকাদার বা কনট্রাক্টার নিযুক্ত আছে। ভ্রমণকারীগণ 'পড়াও'তে উপস্থিত হইয়া গ্রামের ঠিকাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিলে ঠিকাদার শীঘ্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকে। কংগণ আসিবার জন্য গন্ধরবলে মালবাহী ও সোয়ারি ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। মালবাহী ঘোড়ার দৈনিক ভাড়া বারো আনা ও সোয়ারি ঘোড়ার এক টাকা। ঘোড়াওয়ালা ঘোড়ার সঙ্গে থাকে ও বাসনাদি মাজা, জল তোলা, কিছু মাল বহন করা ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাকে কিছু দিতে হয় না। যাঁহারা অধিক উত্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে একেবারে ততদূর যাতায়াতের জন্য ঘোড়া ভাড়া করা উচিত, কারণ পথে ঘোড়া পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই। গন্ধরবলের ঘোড়াগুলি দ্রাস পর্যন্ত গমন করে, তাহার উত্তরে আর যায় না। যতগুলি মালবাহী সোয়ারি ঘোড়ার প্রয়োজন তাহা পূর্ব দিনে গন্ধরবলের ঠিকাদার বা নায়েব মহাশয়কে সংবাদ দিতে হয়, তাঁহারাই সব ঠিক করিয়া দেন। ভাড়া করিবার সময় ঘোড়াগুলি খোঁড়া, বৃদ্ধ, অবাধ্য বা বৎসযুক্তা না হয় তাহা দেখিয়া লইতে হয়, নচেৎ পথে বিপদের সম্ভাবনা। নিজেরা ঘোড়াওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া ঘোড়া ভাড়া করা উচিত নহে, কারণ পথে তাহারা যদি ভাড়ার টাকা সম্বন্ধে কোনরূপ গোলমাল করে তবে তাহার কোন বিহিত করার পথ থাকে না। গন্ধরবলে এইপ্রকার ভাড়ার ঘোড়া প্রায় ২৫০টি আছে।

গন্ধরবল হইতে অল্প কিয়দ্দূর আসিতেই পথে সিন্ধুনদের উপর একটি ঝোলানো পুল পার হইতে হইল। পুলটি লোহার মোটা তার ও কাঠ দিয়া প্রস্তুত। ইহার উপর দিয়া কোন প্রকারের গাড়ী চলিতে পারে না। একটি কাষ্ঠফলকে ঐ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা

১। যে গ্রামে ডাকবাংলো ও সরাই আছে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায় এইরূপ স্থলে আসিয়া যাত্রিগণ রাত্রে বাস করেন। এইপ্রকার স্থানকে 'পড়াও' বলে। 'পড়াও' ব্যতীত অন্য গ্রামে ভ্রমণকারীগণের রাত্রিবাস করিবার সুবিধা নাই। সাহেব ও শিকারীরা তাঁবু খাটাইয়া গ্রামের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

লিখিত আছে। পুল পার হইয়া আসিয়া 'শিপুর' গ্রামের নিকট দুইজন সাহেব শিকারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা দ্রাস পর্যন্ত গিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহারাও আমাদের মতো গন্দরবলের ঘাটে হাউস-বোটে মালপত্রাদি রাখিয়া এই পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পার্বত্য-পথগুলি সব ভাল আছে কিনা আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে খবর জানিলাম। এই সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমরা ঘোড়ার পিঠ হইতে বাক্সটি লইয়া বর্ষাতি জামা বাহির করিয়া গায়ে দিলাম। আমাদের সম্মুখস্থ পথ বেশ চওড়া ও সমতল। পথের দুই ধারে অল্প দূরে উচ্চ পাহাড় দেখা যাইতেছে। পথ বরাবর সিন্ধুনদের ধারে ধারে উপত্যকার মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। পথের উভয় ধারে শালিধান, ভুট্টা, ক্রমবা[২] (ব্ল্যাক্ হুইট) প্রভৃতির ক্ষেত্র ও আখরোট, নাশপাতি, আপেল, বাদাম, আঙ্গুর প্রভৃতির গাছ আছে।

গন্দরবল ছাড়িয়া চার মাইল আসিয়া আমরা 'নুন্নর' গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। একস্থানে একটি মেওয়ার বাগানে অনেকে নাশপাতি ও আপেল পাড়িতেছে দেখিয়া স্বামীজী আমাদের পথপ্রদর্শক গণিয়াকে দুই আনা পয়সা দিয়া কিছু ফল কিনিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। অল্পক্ষণ পরে যখন গণিয়া এক কোঁচড় ফল আনিয়া হাজির করিল তখন আমরা যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না এবং মনে মনে কলিকাতার মেওয়ার দোকানের দুর্মূল্যতা স্মরণ করিতে লাগিলাম। গ্রাম ছাড়িয়া কিয়ৎদূর আসিয়া 'ওয়াইল' নামক স্থানে সিন্ধুনদ পার হইতে হইল। এইস্থান হইতে পথে দুই তিন মাইলের মধ্যে কোন বৃক্ষাদি নাই। মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার পথ চলিয়া গিয়াছে এবং তাহা বালি ও পাথরে পূর্ণ বলিয়া খুব গরম বোধ হইতে লাগিল।

বেলা চারটার সময় কংগণ ডাকবাংলোয় পৌঁছিলাম। বাংলোটি বাজারের নিকটেই অবস্থিত ও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উহাতে চারিটি বড় বড় কামরা আছে। প্রত্যেক কামরাতে স্বতন্ত্র স্নানাদির ঘর সংলগ্ন আছে এবং প্রত্যেক কামরাই পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, বড় আয়না প্রভৃতির দ্বারা বেশ সাজানো। স্নানের ঘরে বাথটব, বেসিন, জাগ, কমোড প্রভৃতিও আছে। প্রত্যেক জানালা ও দরজাতেই সুন্দর চিক ও পরদা দেওয়া ও মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা। প্রত্যেক কামরাতেই আগুন জ্বালাইবার জন্য 'বোখারি' বা চিমনি আছে। শীতকালে সমস্ত রাত উহাতে আগুন রাখা যায়। বারান্দায়

২। 'ক্রমবা' গাছগুলি দেড় বা দুই হাত উচ্চ হয় ও দেখিতে অনেকটা তুলসীগাছের মতো, ইহার কৃষ্ণবর্ণের ত্রিকোণবিশিষ্ট একপ্রকার শস্য হয়। সেগুলি মুগ বা কলাই অপেক্ষা বড় হয় না। আমাদের দেশের কৃষ্ণকলি ফুলের কালো বীচির ভিতর যেমন একপ্রকার ময়দার মতো পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার ভিতরও তদ্রূপ থাকে। এই প্রদেশবাসীগণ ইহার আটা হইতে পিঠা প্রস্তুত করে। ইহা জলে গুলিয়া কড়াইয়ে একটু তৈল বা মাখন দিয়া ভাজিয়া খায়। উহা ঈষৎ তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। ইহার আটা জল দিয়া মাখিলে গমের আটার মতো শক্ত হয় না, অল্পেই গুঁড়া হইয়া যায়, কারণ ইহার আঠা-আঠা ভাব খুব কম।

একখানি চেয়ার বাহির করিয়া স্বামীজী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ডাকবাংলোর চৌকিদার আসিয়া আমাদিগকে সকল রকমে সাহায্য করিতে লাগিল। বারান্দায় একখানি মূল্য-তালিকা টাঙ্গানো রহিয়াছে, উহাতে আটা, মাখন, কাঠ, দুধ প্রভৃতির মূল্য এবং ঘোড়া ও ডাকবাংলোর ভাড়া প্রভৃতি লিখিত রহিয়াছে। দ্রব্যের মূল্যাদির জন্য বিক্রয়কারীর সহিত বেশী কথা বলিতে হয় না। তালিকা দেখিয়া দাম চুকাইয়া দিলেই হইল।

বাংলোর এক পার্শ্বে রন্ধনগৃহ ও সরাই এবং অন্য পার্শ্বে প্রায় পঞ্চাশ হাত পূর্বদিকে সিন্ধুনদ খরবেগে ছুটিতেছে। এইস্থানে সিন্ধুনদটি ১৫।১৬ হাতের বেশী চওড়া না হইলেও খুব গভীর। নদের উপরস্থ উচ্চ পর্বতমালা 'চীড়' জঙ্গলে আবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ডাকবাংলোয় থাকিলে জনপিছু দৈনিক আট আনা হিসাবে ঘর ভাড়া দিতে হয়, কিন্তু সরাই-এ থাকিলে বিনা ভাড়াতেই থাকা যায়। সরাই-এ আসবাবপত্র কিছুই নাই এবং অত্যন্ত ধূলায় মলিন ও অপরিষ্কার। ডাকবাংলোয় বা সরাই-এ আহারের যোগাড় নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। গ্রামটিতে বিস্তর আখরোট গাছ রহিয়াছে। এইস্থানে একটি ডাক ও তার ঘর এবং একটি এই দেশীয় স্কুল আছে। গ্রামটির লোকসংখ্যা প্রায় একশত। অধিকাংশই মুসলমান। মাত্র ২।৩ ঘর ব্রাহ্মণের বাস।

এইস্থান হইতে অনেকে 'গঙ্গাবল হ্রদ' দেখিতে যান। উহা এইস্থান হইতে নয় মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দিন ভাল হইলে প্রাতে যাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসা যায়। হরমুখ পর্বতের গায়ে ছোট-বড় অনেকগুলি হ্রদ আছে। তন্মধ্যে যেটি বড় সেটির নাম গঙ্গাবল। উহা সমুদ্রতীর হইতে ১৩,০০০ ফিট উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এইস্থানে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাইবার পথ এতই খারাপ যে, সামান্য বৃষ্টিপাত হইলেই অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া যায়, তখন তাহার উপর আরোহণ করা নিরাপদ নহে। বৃষ্টির সময় এই পথে চলিতে গিয়া বহুবার বহু যাত্রী হতাহত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে এইস্থানে একটি মেলা বসে ও প্রায় শতাধিক যাত্রী সমবেত হইয়া পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিয়া থাকেন।

কংগণ হইতে ওয়াংগৎ যাইবারও এক পথ আছে। ঐ গ্রামটি নানাবিধ পার্বত্য-দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। বহু ভ্রমণকারী ঐ স্থানে গমন করেন। স্থানটি ৬,৮০০ ফিট উচ্চ পর্বতময় স্থানে অবস্থিত। গ্রামটির তিন মাইল দূরে দুইটি বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রথম মন্দিরটি দ্বিতীয়টি হইতে প্রায় ২৫০ গজ দূরে অবস্থিত। প্রথমটিতে ছয়টি ও দ্বিতীয়টিতে এগারোটি ঘর আছে। ঘরগুলিতে পূর্বে বৌদ্ধভিক্ষুগণ বাস করিতেন। মন্দির দুইটির ছাতার মতো খিলানগুলি দেখিবার জিনিস। ঐগুলি নির্মাণ করিতে এইরূপ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল ব্যবহৃত হইয়াছে যে,

তাহা দেখিলে প্রকৃতই অমানুষিক কার্য বলিয়া অনুমান হয়। ইহার নিকটে নাগবল ও রাজোদ্যানবল নামক দুইটি সুমিষ্ট জলের ঝরণা আছে।

কংগণের পর আর কোথাও নাশপাতি, আপেল প্রভৃতির গাছ নাই। যাঁহারা আরও উত্তরে যাইতে চান তাঁহারা এইস্থান হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। কারণ, পার্বত্য-পথে চলিতে চলিতে তৃষ্ণার্ত হইলে জল পান না করিয়া ২।১টি ফলের রস পান করিলে শরীরে বিশেষ বল পাওয়া যায় ও বেশ তৃপ্তি লাভ হয়। ইহার পরের পড়াও 'গুণ্ড' নামক গ্রামে কদাচিত দুই-একটি ক্ষুদ্র ফল পাওয়া যাইলেও দাম খুব বেশী ও খাইতে তত সুস্বাদু নহে। এই পথে ভ্রমণের নাম 'সিন্ধ ভেলি ট্রিপ'। এই পথে যাঁহারা ভ্রমণে বাহির হন তাঁহাদের যাবতীয় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শ্রীনগর হইতে কিনিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কারণ, এই দিকে ইহার পর যতদূর যাওয়া যায় ততই জিনিসপত্র দুর্লভতর হইতে থাকে। কংগণ ডাকবাংলোয় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে আমরা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম, এমন সময় দুইজন পুলিশের লোক আসিয়া আমাদের নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখিতে লাগিলেন। স্বামীজী কাশ্মীর মহারাজার অতিথি (স্টেট গেস্ট) শুনিয়া তাঁহারা স্বামীজীকে বিশেষরূপে সম্মান করিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, এই পথে যাহাতে রুশিয়ার বলশেভিকগণ ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য এই দিকে 'বলশেভিক লাইন' নামক একদল গোয়েন্দা কর্মচারী বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন। ইঁহারা সেই দলেরই লোক। আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া দ্বিপ্রহরের খাবার বাঁধিয়া লইলাম এবং সমস্ত মালপত্র যথাযথভাবে ঘোড়ার পিঠে বাঁধিয়া পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম।

অদ্য ২০শে সেপ্টেম্বর, নির্মল মেঘমুক্ত আকাশ। রৌদ্রের তেজ এখনও প্রখর হয় নাই। আমরা অদ্যকার গন্তব্য স্থান 'গুণ্ড' নামক পড়াও-এর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্থানটি কংগণ হইতে তেরো মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে মাইল-কাষ্ঠ দেখা যাইতেছে। পথে তিন স্থানে অল্প চড়াই-উৎরাই করিতে হইল। পাহাড়গুলি সবই নুড়ি ও মাটি মিশ্রিত, দেখিলে মনে হয় এককালে জলমগ্ন ছিল। পথে আসিতে সিন্ধুনদের উপর এক পুরাতন ধরনের সেতু দেখিলাম। উহা অদ্ভুত উপায়ে প্রস্তুত। একটি মোটা দড়ি উপরে ও দুইটি দড়ি নীচে রহিয়াছে। যে দড়িটি উপরে তাহাতে একটি মজবুত চুবড়ি বাঁধা। যিনি নদী পার হইতে চান তিনি ঝুড়ি বা চুবড়িতে বসেন ও নীচের দড়ি দুইটি দুই হাতে টানিতে টানিতে নদীর অপর পারে চলিয়া যান। এই পুলের অল্প দূরেই সালেমার বাগ হইয়া শ্রীনগর যাইবার এক পথ রহিয়াছে। পথটি এক উচ্চ পাহাড়ের গা বাহিয়া আঁকাবাঁকাভাবে উঠিয়াছে। পাহাড়টির পরপারে দালহ্রদ অবস্থিত। নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানির নাম 'হায়ান'। তথায় মাত্র ৮।১০ ঘর পাহাড়ী মুসলমানের বাস। গ্রামে অনেকগুলি

ভুট্টা ও যবের ক্ষেত্র রহিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটি মাচা আছে। তাহার উপর খড় বিছাইয়া চাষা শুইয়া শুইয়া রাত্রে ক্ষেত্র হইতে ভাল্লুক তাড়ায়। এক পার্শ্বে একটি খালি টিন ঝোলানো আছে, ভাল্লুক আসিলে সে উহা বাজায়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত শিকারী ছাড়া অন্য কেহ এইসব পাহাড়ে ভাল্লুক মারিতে পারে না—সরকারের নিষেধ। গ্রামবাসীরা কেহ বা ক্ষেত্রে ভুট্টা সংগ্রহ করিতেছে, কেহ বা 'উইলো' গাছের[৩] পাতা সমেত ছোট ছোট ডাল সংগ্রহ করিতেছে। ইহারা যবের খড়, ভুট্টার গাছ, ক্রুম্বা ও উইলোর কচি ডাল প্রভৃতির বড় বড় তাড়া বাঁধিয়া উচ্চ বৃক্ষের উপরে তুলিয়া রাখিয়া দেয় ও শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ঢাকিয়া যায় এবং অন্য সকল প্রকার খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয় তখন ইহারা এই সমস্ত খাওয়াইয়া ঘোড়া, গরু ও ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকে রক্ষা করে। পথের দুই ধারে উইলো গাছের শ্রেণী। কিছুদূর আসিয়া পথটি মামুর গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া চলিয়াছে। গ্রামবাসীরা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও শুভ্রবর্ণ। নিকটেই একটি গ্রাম্য-মুদির দোকানের কাছে একটি ছোট মাঠ রহিয়াছে। মাঠটিতে অনেক ভ্রমণকারী তাঁবু খাটাইয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন। মাঠের চারিদিকে পাহাড় দেখা যাইতেছে ; নিকটেই সিন্ধুনদ তরতর বেগে ছুটিয়াছে। আমরা এক গাছের ছায়ায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। এইস্থান অদ্যকার গন্তব্যস্থানের অর্ধ পথ। একটি পতিত বৃক্ষের গুঁড়ির উপর বসিয়া আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। ইহার এক মাইল দূরে যাইয়া 'গঞ্জন' নামক গ্রামের নিকট সিন্ধুনদ পার হইতে হইল। এইবারের স্থানীয় দৃশ্য সত্যই বড় চমৎকার, মনে হইতে লাগিল যেন কলিকাতার ইডেন গার্ডেন-এর ভিতর দিয়া চলিয়াছি। আরও দুই মাইল যাইয়া আমাদের সিন্ধুনদটি পুনরায় পার হইতে হইল। এই স্থান হইতে গুণ্ড গ্রাম চারি মাইল দূরে অবস্থিত। বেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমরা তথায় পৌঁছিলাম। ছোট ডাকবাংলোটি একেবারে পথের ধারেই অবস্থিত ও নিকটেই একটা ঝরণা উইলো গাছের বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে জঙ্গলপূর্ণ পাহাড় ও বাংলোর নিকটেই নীলতোয়া সিন্ধু প্রবাহিত। ৫০০ ফিট অধিক উচ্চ বলিয়া এইস্থান গন্ধরবল্ অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা।

ডাকবাংলোয় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এই প্রদেশের বন-বিভাগের পরিদর্শক (ফরেস্ট রেঞ্জার) মহাশয় ইতঃপূর্বেই এইস্থানে আসিয়া প্রাঙ্গণে তাঁহার তাঁবু খাটাইয়া

৩। 'উইলো' গাছগুলি দেখিতে অনেকটা ঘোড়ানিম গাছের মতো। ইহার পাতাগুলি ঠিক সোনামুখী (সিনা) পাতার মতো। কাশ্মীরে সর্বত্রই অসংখ্য উইলো গাছ জন্মে। ইহার কাঠ হইতে ক্রিকেট, টেনিস, হকি প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ব্যাট প্রস্তুত হয়। অনেক মহাজনেরা এই কাঠ চালান দিয়া বিস্তর টাকা উপার্জন করেন। কাশ্মীরের চারিদিকে যেসকল ভাসমান-উদ্যান আছে তাহাতে অজস্র উইলো গাছ জন্মিয়া থাকে।

বাস করিতেছেন[৪], তিনি একজন শিখ ভদ্রলোক। আলাপ-পরিচয়ে দেখিলাম বেশ বিদ্বান। নানা কথাবার্তার পর স্বামীজীর সহিত তাঁহার খুব ভাব হইয়া গেল। শ্রীনগর ও গুলমার্গের যে সকল ভদ্রলোকের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইয়াছিল তিনি তাঁহাদের সকলকেই জানেন। স্বামীজী এই কষ্টকর ও বিপজ্জনক পথে স্বেচ্ছায় পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন শুনিয়া তিনি খুব বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার পরিচিত 'কার্গিল' ও 'লে' শহরের তহশীলদার মহাশয়ের নামে দুইখানি পরিচয়-পত্র প্রদান করিলেন। এই সুদূর ও দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তাঁহার এই অযাচিত উপকার, ঈশ্বরের অহেতুক করুণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আহারাদি করিয়া আমরা এইস্থানেই রাত্রি যাপন করিলাম ও প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি চা-পান সমাপ্ত করিয়া বেলা নয়টার সময় পুনরায় যাত্রা করিলাম। পরিদর্শক মহাশয় কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে বিদায় দিয়া গেলেন।

অদ্য আমাদিগকে যাইতে হইবে সোনমার্গ গ্রামে। ঐ স্থানটি গুণ্ড হইতে সাড়ে চৌদ্দ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। গুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আমরা বরাবর পাথরকাটা পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং আড়াই মাইল পথ যাইয়া রেবিল ও তাহার দুই মাইল পরে কুলান নামক দুইখানি গণ্ডগ্রাম অতিক্রম করিলাম। সোনমার্গের লোকেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি এই সকল গ্রাম হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। এইস্থান হইতে দেড় মাইল আসিয়া একটি নূতন সেতুর উপর দিয়া সিন্ধুনদ পার হইলাম। কিছুদূর আসিয়া পুনরায় নদ পার হইয়া গোচারণমাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথের ধারে অসংখ্য জঙ্গলী আখরোট গাছ রহিয়াছে। এইগুলির ফল কেহ খায় না। পাহাড়ীরা ইহার শাঁস বাটিয়া তৈল তৈয়ারী করে। সপ্তম মাইল-কাষ্ঠটির নিকট পুনরায় একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পাইলাম, ইহার নাম গগনগিরা। এই গ্রামে অনেক শিকারী সাহেব আসিয়া থাকেন। নিকটের পাহাড়ে যথেষ্ট ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থানের পর হইতেই উপত্যকাভূমি ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইয়া গিয়াছে এবং পথের দুই ধারে ৯০০০ ফিট উচ্চ খাড়া পাহাড় দেওয়ালের মতো উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই-একখানি অতিকায় প্রস্তরখণ্ড নীচে পড়-পড় হইয়া পাহাড়ের মাথার উপর রহিয়াছে, দেখিলেই ভয় হয়। এইস্থানে উচ্চ পর্বতগাত্রে একটি সুদৃশ্য জলপ্রপাত রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে ও পথের ধারে অসংখ্য র‍্যাম্প-বেরী গাছের জঙ্গল, সেখানে থোলো থোলো সুপক্ব 'বেরি' ফল লাল, হলদে ও গোলাপী রংয়ে পথ আলো করিয়া রহিয়াছে। ইহা খাইতে ঈষৎ অম্লমধুর স্বাদ ও দেখিতে ঠিক ছোট ছোট টেঁপারির মতো। ইহা ব্যতীত পথের দুই ধারে শত শত ভূর্জপত্র, নাট, আখরোট প্রভৃতি গাছের বন।

৪। ডাকবাংলোর উঠানে তাঁবু খাটাইয়া থাকিলে দৈনিক চার আনা ভাড়া দিতে হয়। বাংলোর চৌকিদার কোনপ্রকার সাহায্য করিতে বাধ্য নহে।

চীড় গাছগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের বিলাতী ঝাউ-এর মতো। এইগুলির মূলদেশ অল্প কাটিয়া একটি পাত্র বাঁধিয়া দেওয়া হয় ও সেই পাত্রে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় দেড় পোয়া রজন রস জমে। এই রস ঘন ও তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। ইহা হইতে টার্পিন তৈল প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে প্রতিমার গাত্রে, ডাকের সাজে যে আঠা ব্যবহৃত হয় তাহাও এই রস হইতে প্রস্তুত হয়। অল্পবয়স্ক গাছের রস বাহির করিয়া লইলে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক গাছের সেরূপ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। চীড়ের কাঁচা কাঠ, ডাল ও পাতা অল্পেই জ্বলিয়া উঠে। ইহা শুষ্ক করিয়া লইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কোনক্রমে চীড় বনে আগুন লাগিয়া গেলে হাজার হাজার কাঁচা গাছ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। চীড়ের হাওয়া যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। চীড় বনের একটি বিশেষত্ব এই যে, সেখানে অন্য কোন গাছ জন্মিলে মরিয়া যায়। সমুদ্রতল হইতে ৭।৮ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে চীড় গাছ জন্মিয়া থাকে। চীড়ের ফলকে 'চীড় গোঁজা' (পাইন কোনস্) বলে। অনেকে ইহার বীচি খায়। ইহা খাইতে অনেকটা বাদামের মতো। চীড় গাছগুলির গাঁইট গুণিয়া গাছের বয়স সহজেই বলা যায়। ইহার এক এক বৎসরে একটি করিয়া নূতন গাঁইট জন্মে। এই প্রদেশের চীড় গাছগুলি ক্ষুদ্র পাতাবিশিষ্ট। লম্বা পাতা (লঞ্জি-ফেলিয়া)-বিশিষ্ট চীড় এইদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের এক-একটি ডাঁটায় পাঁচটি করিয়া পাতা (পাইন-নীডলস্) থাকে। চীড় কাঠ হইতে দেশলাই-এর উৎকৃষ্ট কাঠি প্রস্তুত হইতে পারে।

হ্যাজেল প্রভৃতি ঔষধের গাছের পাতা, শিকড় ও ছাল শুষ্ক করিয়া বিদেশে প্রেরিত হয় ও উইচ্ হ্যাজেল প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া এই দেশে আসে।

মেপ্‌ল গাছের পাতা চানারের পাতার মতো। এই দুই গাছের মধ্যে প্রভেদ এই যে চানারের পাতার ডাঁটা সবুজ হয়, কিন্তু মেপ্‌লের পাতার ডাঁটা ঈষৎ লাল হয়। চানারের পাতায় পাঁচটি আঙুল থাকে কিন্তু ইহার পাতায় চারিটি আঙুল থাকে। মেপ্‌ল পাতাগুলি চানার পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়। শীতকালে চানার গাছের মতো মেপ্‌ল গাছের সমস্ত পাতার রং বদলায় ও ঝরিয়া পড়িয়া যায় এবং সমস্ত অংশ হইতে রস নামিয়া আসিয়া মাটির তলায় শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লয়। সেই সময় গাছের ডাল কাটিলে বিন্দুমাত্র রস বাহির হয় না, ঠিক শুষ্ক গাছের মতো দাঁড়াইয়া থাকে। পরে বসন্তকালে গরম হাওয়া বহিলে যখন পাহাড়ের বরফ গলিতে আরম্ভ হয় তখন শিকড় হইতে সমস্ত রস ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে এবং সমস্ত শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়। স্বামীজী বলিলেন, আমেরিকায় এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মায়। এই সময় গাছের মূলদেশ অল্প কাটিয়া একটি পাত্র বাঁধিয়া দিলে খেজুর রসের মতো ইহার রস বাহির হইতে থাকে। ইহাকে ফুটাইয়া ঘন করিলে মেপ্‌ল সিরাপ হয়। ইহা খাইতে অনেকটা পয়রা গুড়ের মতো। স্বামীজী আমেরিকায় বার্কশায়ার হিলের বেদান্ত

আশ্রমে ইহা হইতে চিনি প্রস্তুত করিতেন। তাহাকে 'মেপ্‌ল-সুগার' বলে। ভূর্জপত্র গাছগুলি (বার্চ-ট্রি) চারি প্রকার—হলদে, কালো, গোলাপী ও সাদা, এবং তাহারা দেখিতে অনেকটা বড় পেয়ারা গাছের মতো। গাছের ও ডালের ছালকে ভূর্জপত্র বলে। ছুরি দিয়া উপরের খারাপ ছালগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিলে ভিতরে ভাল ছাল পাওয়া যায়। শীতের প্রারম্ভেই ইহার ছাল সংগ্রহ করিবার উৎকৃষ্ট সময়। পাহাড়ীরা অনেকে ইহার ছাল সংগ্রহ করিয়া শহরে বিক্রী করে।

আখরোট গাছগুলি প্রথমে দেখিলে বিলাতী আমড়ার গাছ বলিয়া ভ্রম হয়। এই পথে দুই প্রকার আখরোট গাছ দেখিতে পাওয়া যায়—একপ্রকার ছোট ও একপ্রকার বড়। যেগুলি ছোট সেগুলি কেহ খায় না, সেগুলি হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। আখরোট কাঠ হইতে অতি সুন্দর ও মূল্যবান আসবাব এবং 'পাপিয়ে ম্যাসা' প্রস্তুত হয়। আখরোট কাঠের উপর কাগজ জড়াইয়া তদুপরি নানাপ্রকার রং করিয়া ও বিবিধ প্রকার চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া পাপিয়ে মাসা প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে পুস্তকাধার, পুস্তকের সুন্দর মলাট, টিপয়, ছবির ফ্রেম, ট্রে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরে ইহার ব্যবসায়ই সর্বপ্রধান। এইসব জিনিস কলিকাতায় কাশ্মীরীদের দোকানে পাওয়া যায়। এইসকল জঙ্গলগুলি কাশ্মীর-রাজ্যের বন-বিভাগের অধীন। ইহা হইতে বাৎসরিক বিস্তর টাকা আয় হয় এবং এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

এই গভীর অরণ্যময় স্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এইস্থানে সিন্ধুনদ ১৫।১৬ হাতের অধিক বিস্তৃত না হইলেও জল খুব গভীর। নদে 'স্নো ট্রাউট' মাছ খুব পাওয়া যায়। নদের স্রোতে হাজার হাজার বাহাদুরী কাঠের টুকরো ভাসিতে ভাসিতে শ্রীনগরের দিকে চলিয়াছে। যেগুলি পাথরে আটকাইয়া যায়, কর্মচারীরা সেইগুলি লম্বা বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া দেয়। গভীর জঙ্গল হইতে কাঠ কাঠিয়া বহু দূরে লইয়া যাওয়া এই প্রথাতেই সম্ভব ; অন্যথা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পথে যথাক্রমে তিনটি জলপ্রপাত ও নানাবিধ পার্বত্য সৌন্দর্যরাশি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরেই সোনমার্গ গ্রামে পৌঁছিলাম।

সিন্ধুনদের তীরেই সোনমার্গ অবস্থিত। ইহা শ্রীনগর হইতে পঞ্চাশ মাইল। কথিত আছে, প্রাচীনকালে সিন্ধুনদের বালুতে সোনার কণা পাওয়া যাইত।[৫] তাহা হইতেই

৫। ভারতবর্ষ-ভ্রমণকারী প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনির বা হিরোডোটাস্-এর বর্ণনায় জানা যায়, অতি প্রাচীনকালে পিপীলিকা গর্ত করিয়া যে মাটি তোলে তাহা হইতে এই প্রদেশের লোকে সোনার কণা পাইত। ক্রমে তাহারা ঐ সকল স্থানে গর্ত করিয়া সোনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে সোনার খনি খোঁড়ার সূত্রপাত হয়। সিন্ধুনদের গর্তেও অনেক গুপ্ত সোনার খনি ছিল, তাহাতেই লোকে উহার বালুতে সোনার রেণুকা দেখিতে পাইত। এই প্রদেশের সোনার রং খুব হলদে ছিল। উপরোক্ত দুইজন গ্রীক ঐতিহাসিক ব্যতীত টিসিয়াস প্রভৃতির লিখিত ইতিহাসেও এই প্রদেশের সোনার খনির কথা বর্ণিত আছে।

গ্রামখানির ঐপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। সোনমার্গ গ্রামখানি চারিদিকে পার্বত্য সৌন্দর্যরাশি লইয়া বিরাজ করিতেছে। এইস্থানে সিন্ধুনদ অর্ধচন্দ্রাকারে গ্রামটিকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পারাপারের জন্য একটি লৌহের সুন্দর সেতু আছে। সোনমার্গই কাশ্মীরের শেষ সুন্দর স্থান। ইহার পর আর কোন স্থানে এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ উপত্যকাভূমি দেখা যায় না। বহু সাহেব মেম এই দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার জন্য গ্রীষ্মকালে এইস্থানে আসিয়া থাকেন। গ্রামবাসীরা নদীর পরপারে পাহাড়ের নিম্নে অবস্থিত গ্রামে বাস করে। নদীর এই পারে সরাই, ডাকবাংলো ও পোস্ট অফিস আছে। কোন দোকান বা বাজার নাই। ডাকবাংলোয় চৌকিদারের নিকট আটা, মাখন, জ্বালানি কাঠ, মুরগী প্রভৃতি পাওয়া যায়। ভাড়াটিয়া ঘোড়া মধ্যে মধ্যে অতিকষ্টে পাওয়া যায়। সোনমার্গের গ্লেসিয়ার ভ্যালি, থাজবাস ও ঝাবার নামক চিরতুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই সকল পর্বতের তুষার নদী হাজার হাজার বৎসর একইভাবে থাকিতে থাকিতে ঠাণ্ডায় ও চাপে ইহার বরফ এইরূপ কঠিন হইয়া যায় যে, তাহা আর কিছুতেই গলানো যায় না। এমনকি আগুনের নিকট রাখিলে ফাটিয়া যাইবে, তথাপি গলিবে না। ইহা হইতে স্ফটিক (ক্রিষ্টাল) হইয়া থাকে। স্ফটিক হইতে মালা, চশমার পাথর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

গ্রামটি সমুদ্রতল হইতে নয় হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টিপাত হয়। সেইজন্য ভ্রমণকারীগণের সঙ্গে তাঁবু থাকার বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ ডাকবাংলো বা সরাই খালি না থাকিলে বিশেষ অসুবিধা ও বিপদের সম্ভাবনা। গ্রামে যে ২০।২১ ঘর মুসলমান বাস করে তাহারা সকলেই অত্যন্ত গরীব, তাহাদের বাড়ীতে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না। এই পথ দিয়া সওদাগরগণ মালবাহী চমরী গাই ও ঘোড়া লইয়া গমনাগমন করিবার সময় প্রায়ই গ্রামের সন্নিকটস্থ ময়দানে রাত্রি যাপন করে। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে তুষার বৃষ্টি হয় ও তাহারা নির্বিবাদে তাহা সহ্য করে। তাহাদের দলে প্রায় ৩০।৪০টি গাই ও ঘোড়া এবং ১২।১৩ জন লোক থাকে। কোন সরাই বা বাংলোতে এতগুলি লোকের থাকিবার মতো স্থান থাকে না। তাহাদের সহিত কোন তাঁবুও থাকে না। তুষারপাত আরম্ভ হইলেই তাহারা ঘোড়া ও গাইয়ের গা হইতে চট ও সাজগুলি খুলিয়া নিজেরা গায়ে চাপা দিয়া শুইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের সর্দি হওয়া বা ঠাণ্ডা লাগার কোনটাই হয় না। ইহাকেই বলে 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'। সোনমার্গের পরেও যাঁহারা যাইতে চান তাঁহাদিগকে খাদ্যাদি সমস্তই এইস্থান হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। কারণ ইহার পরবর্তী বালতাল গ্রামে জ্বালানি কাষ্ঠ ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না।

রজনী প্রভাতে আমরা প্রাতরাশ সমাপন করিয়া পুনরায় যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অদ্য আমাদিগকে মাত্র নয় মাইল যাইতে হইবে। কারণ অদ্যকার

গন্তব্যস্থান বালতাল গ্রাম নয় মাইল দূরে অবস্থিত। সেইজন্য বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই। গন্ধরবল হইতে যে মালবাহী ঘোড়া দুইটি আনা হইয়াছিল, তাহার একটির পায়ে ঘা হইয়া পড়াতে ভাল চলিতে পারিতেছিল না। তাহার বোঝা কিছু কমাইবার জন্য আমরা অন্য একটি ঘোড়ার সন্ধান করিতে লাগিলাম। ডাকবাংলোর চৌকিদার ও গণিয়া অনেক খোঁজাখুজির পর বহু বিলম্বে এক পাহাড়ী বিধবার নিকট হইতে একটি অল্পবয়স্ক ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিল। অগত্যাপক্ষে সেইটিকেই সঙ্গে লইতে হইল। বিধবার পুত্রটি রুটি ও ছাতু কোমরে বাঁধিয়া ঘোড়ার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ঠিক হইল সে দ্রাস পর্যন্ত যাইবে ও ঘোড়ার ভাড়া মোট আড়াই টাকা দিতে হইবে। সোনমার্গ হইতে দ্রাস তিন দিনের পথ—প্রায় আটত্রিশ মাইল। বিধবা অনেক কাঁদিয়া আমাদিগকে অনুরোধ করিল যেন তাহার পুত্রটির পথে কোনরূপ কষ্ট না হয়। স্বামীজী তাহাকে অভয় দিয়া শ্রীদুর্গা স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন।

অদ্যকার পথটির দুইধারে অসংখ্য ভূর্জপত্র গাছের বন। পাহাড়ীরা নানা স্থানে ভূর্জপত্র সংগ্রহ করিতেছে, কাশ্মীরে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিবে। সোনমার্গ হইতে পাঁচ মাইল আসিয়া সিরবল নামে একস্থানে পানীয় জল নিকটে পাইয়া আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত করিলাম। সিরবল হইতে কোলোহাই-এর বিখ্যাত তুষার নদী দেখিতে যাইবার একটি পথ রহিয়াছে। আমরা পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় সেখানে একজন অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁহার নিকট আমরা সংবাদ পাইলাম লে শহরের উজির ওয়াজিরৎ সাহেব এই দিকে আসিতেছেন। আগামীকাল পথে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে। লোকটি উজির মহাশয়ের একজন নায়েব। সরকারী কাজে সোনমার্গ যাইতেছেন।

এইস্থান হইতে সিন্ধুনদ ও উপত্যকাভূমি ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। যোজিলা নামক একটি প্রায় ১৬ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে বালতাল গ্রামটি অবস্থিত। যোজিলা গিরিবর্ত্ম পার হইলেই তিব্বতরাজ্য আরম্ভ। পথটি প্রায় ১২ হাজার ফিট উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহাই মধ্য-এশিয়াবাসীগণের ভারতে প্রবেশের প্রাচীন পথ। অনেক পর্যটক এই গিরিবর্ত্ম দেখিবার জন্য বালতালে আসিয়া ২।১ দিন বাস করিয়া যান। স্থানটি অতি নির্জন ও বেশ নিস্তব্ধ। বন্যজন্তু প্রভৃতির কোন ভয় নাই। পাহাড়ীরা বালতালকে শিংখাং নামে অভিহিত করে।

বালতাল হইতে অমরনাথের গুহা মাত্র নয় মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। এই দিক দিয়া অধিক লোক ঐ স্থানে গমন করেন না। কারণ সেখানে তত ভাল পথ নাই। পর্বতারোহণে অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী ব্যতীত সাধারণ তীর্থযাত্রীদের পক্ষে এই দিক দিয়া যাওয়া বিপজ্জনক। পথে বরফের সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়। গ্রীষ্মকালে তুষার গলিয়া যাইলে পথ নষ্ট হইয়া যায় ও এই দিক দিয়া গমনাগমনের কোনও উপায় থাকে না। অমরনাথের নিকটবর্তী অমরগঙ্গা নামক নদীর জল এইস্থানে

আসিয়া সিন্ধুনদে পড়িতেছে। এই নদীর ধারে ধারেই ঐ পথ অবস্থিত। এইস্থানের পাহাড়গুলি প্রায় অধিকাংশই অমরনাথের পাহাড়ের মতো খড়ি-পাথরের। এই জাতীয় পাথর হইতে হাতে-খড়ির পাথর, তিলক-মাটি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

বালতাল ডাকবাংলোয় পৌঁছিয়া দেখিলাম, বোম্বাই-এর এক রেলের সাহেব সপরিবারে আসিয়া সেখানকার উভয় কামরাই অধিকার করিয়া আজ তিনদিন হইতে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে আমাদের জন্য একটি কামরা ছাড়িয়া দিতে বলাতে তিনি রাজী হইলেন না। শেষে স্বামীজী আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলে তিনি একটি কামরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

এইস্থানে স্থানীয় জেলদার মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম শ্রীসাধু সিং। তিনি পাঞ্জাবী শিখ। হুকুমনামাখানি দেখিয়া তিনি স্বামীজীকে এক ঘটি দুধ দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। বালতালে কোন লোকের বসবাস নাই এবং কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। সেইজন্য সামান্য এক ঘটি দুধ এই সময় আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা ডাকবাংলোর ভাড়া প্রভৃতি চৌকিদারকে প্রদান করিয়া 'ভিজিটরস্ বুক'-এ নাম দস্তখত করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। বালতাল হইতে সিন্ধুনদ ভিন্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। তিব্বতযাত্রীদের বালতাল হইতে সিন্ধুনদের উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে গমন করিতে হয়।

আজ আমাদিগের গন্তব্যস্থল মেচোহী নামক পর্বত। ঐ স্থান বালতাল হইতে নয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। বরবার যোজিলা গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। গিরিবর্ত্মের দুই ধারে সিজন্ ফ্লাওয়ারস্, এডেলভিস্, ফরগেট-মি-নট প্রভৃতি নানা বর্ণের ও নানা জাতির বিচিত্র সৌন্দর্যময় রাশি রাশি দুষ্প্রাপ্য ফুল ফুটিয়া মানুষের নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করিতেছে। স্বামীজী বলিলেন, "এইসকল ফুলের অধিকাংশই য়ুরোপের আল্পস পর্বত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য ইহাদিগকে অ্যালপাইন ফ্লাওয়ারস্ বলে"। এডেলভিস্ ফুলগুলি আল্পস্ পর্বতের সর্বোচ্চ স্থানে একেবারে চিরস্থায়ী তুষার-নদীর নিকট আশেপাশে ফুটিয়া থাকে। সেইজন্য এইগুলি তোলা অনেক সময় বিপজ্জনক হইয়া উঠে। এইগুলির রং সাদা ও ধূসর হইয়া থাকে—দেখিতে ছোট ছোট তারার ন্যায় এবং মখমলের মতো নরম। স্বামীজী বলিলেন : "য়ুরোপের ধনীগণের নিকট ইহার আদর পারস্য দেশের গোলাপের অপেক্ষা বেশী। অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, টিরোল প্রদেশের সাহসী ও দৃঢ়চেতা সৈন্যগণ গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ধাতুনির্মিত এডেলভিস্ ফুল কোটের বুকে ধারণ করেন।" এইস্থানে কত প্রকার ফুল রহিয়াছে যে, তাহাদের অধিকাংশেরই নাম আমাদের জানা নাই ও এত প্রকারের ফুল একস্থানে ফুটিয়া থাকিতে আমরা অন্যত্র কখনও দেখি নাই। ডাণ্ডিলিয়ন্ ফুলগুলি হইতে উৎকৃষ্ট হলুদ রং প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে যে সকল হল্‌দে রং এদেশে আমদানি হয় তাহার অধিকাংশ এই ফুল হইতে

প্রস্তুত। ফরগেট-মি-নট-এর উৎকৃষ্ট বেগুনী রং অতিশয় নয়নরঞ্জক। পথে রাশি
রাশি বিষাক্ত ঘাস হইয়া রহিয়াছে। নবীন মঞ্জরিত তৃণরাজির স্নিগ্ধ-শ্যাম-সৌন্দর্য
চিত্তকে মুগ্ধ করে। ঘোড়া বা গরু ইহা দেখিলেই খাইতে চায়। কিন্তু খাইলেই মরিয়া
যায়। সেইজন্য আমাদের ঘোড়াওয়ালারা খুব সাবধানে ঘোড়াগুলি চালাইতে লাগিল।
এই ঘাসগুলির আকৃতি অনেকটা কুশ ঘাসের মতো, কিন্তু ইহাতে কাঁটা নাই। পথে
একটি বৃহৎ জলপ্রপাত রহিয়াছে, তাহা একেবারে সোজা পাহাড়ের চূড়া হইতে নিম্নে
সিন্ধুনদে যাইয়া পড়িতেছে। আমরা জলপ্রপাতের নিকট খানিকক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম
করিলাম ও জলপ্রপাতের সুশীতল জল পান করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম।

কিছুদূর যাইতেই হঠাৎ দুটি পাথরের টুকরা তীরবেগে আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ঘোড়াওয়ালারা পূর্ব হইতেই পাথর দুইটিকে পাহাড়ের মাথা হইতে গড়াইয়া নীচের দিকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার শব্দে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিল। এই পর্বতে প্রায়ই এই প্রকার পাথরের টুকরা উপর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়ে, সেইজন্য পথিককে বিশেষ সাবধান হইয়া গমনাগমন করিতে হয়। অনেক ভ্রমণকারী, চমরী গাই ও ঘোড়া ঐরূপ পাথরে আহত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। এই পর্বতের চারিদিকের মনোহর দৃশ্যাবলী দর্শকের মানসপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। এই গিরিবর্ত্মের নিম্নে একটি পথ আছে। শীতকালে যখন বরফ পড়িয়া উপরের পথ বন্ধ হইয়া যায় তখন লোকে সেই পথটি দিয়া গমনাগমন করে।

যোজিলা পর্বতের উচ্চতা ১১,৩০০ ফিট। ইহার দক্ষিণ অংশের ঝরণাগুলি কাশ্মীরের দিকে ও উত্তর অংশের ঝরণাগুলি তিব্বতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। স্বামীজী বলিলেন ঃ "যেখান হইতে দুইটি জলস্রোত দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় ইংরাজীতে তাহাকে 'ওয়াটার সেড' বলে।" 'ওয়াটার সেড' মানে নদীর বিকীর্ণ প্রবাহ। যোজিলার 'ওয়াটার সেড'-এর নাম কানি পাত্রী। অনেকে কাশ্মীর হইতে আসিয়া ইহা দেখিয়া ফিরিয়া যান। এইস্থানটি বালতাল হইতে সাড়ে তিন মাইল।

যোজিলার এই পথটি কেবল গ্রীষ্মকালে খোলা থাকে। কারণ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে এইস্থান বরফে এইরূপ আবৃত হইয়া যায় যে, ৫।৬ মাস কাল পর্যন্ত এই পাহাড়ের উপর দিয়া গমনাগমন বন্ধ হইয়া থাকে। জুন মাসের পূর্বে মালবাহী ঘোড়া চলিতে পারে না। সময় সময় বরফ বেশী পড়িলে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া ও থাম ভাঙিয়া সংবাদ আদান-প্রদানও বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময়ে ডাক চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য এই পর্বতের নীচে দুই দিকে দুইটি অস্থায়ী ডাকঘর আছে। একটি বালতাল ও একটি মেচোহীতে।

যোজিলা অতিক্রম করিলেই দেশের যাবতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। পর্যটকমাত্রেই তখন আপনা হইতেই অনুভব করেন যেন কোন নূতন দেশে তিনি প্রবেশ করিতেছেন। কোথাও কোন পাহাড়ের গায়ে একটিও গাছ দেখা যায় না। অধিকাংশ পাহাড়ের মাথা চিরতুষারাবৃত। যাবতীয় স্থানের উচ্চতা ১১ হাজার

ফিট হওয়াতে অতি উচ্চ পর্বতগুলিকেও ক্ষুদ্র ঢিপির মতো মনে হয়। ১২ হাজার ফিট উচ্চ পর্বতকে মাত্র ১ হাজার ফিট উচ্চ বলিয়া ভ্রম হয়। চারিদিকের পাহাড়ের উপর বরফ থাকাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর হইলেও দ্বিপ্রহরে যখন সেই সকল বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়ে তখন সেইগুলি এইরূপ উজ্জ্বল হয় যে, অনবরত সেইদিকে তাকাইতে তাকাইতে চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া ওঠে ও ৭।৮ দিন পর্যন্ত চক্ষে ভাল দেখা যায় না। ইহাকে 'স্নো-ব্লাইণ্ডনেস্' (তুষার-অন্ধতা) বলে। সেইজন্য এই পথে দিবসে সর্বদা নীল চশমা ব্যবহার করিতে হয়। স্বামীজী বলিলেন ঃ "কানাডার পর্বতে আরোহণ করিবার সময় তিনি একবার এই প্রকার চক্ষুপীড়ায় বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন।"

এই যোজিলা পর্বত প্রথমে তিব্বত ও ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। জম্মুর মহারাজা গোলাপ সিংহ ১০,০০০ ডোগ্রা সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহসী ডোগ্রা সেনাপতি জোরোয়ার সিংকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। সৈন্যাধ্যক্ষ বীরদর্পে এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া বাস্‌গো ও লে-র রাজা সেপাল নামজালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আসকার্দু (লিট্‌ল-টিবেট), কার্গিল (বাল্টিস্টান) এবং লাদাক (ওয়েস্টার্ন-টিবেট) নামক তিনটি প্রদেশ জয় করেন ও সেই সময় হইতে প্রায় মানসসরোবরের নিকট পর্যন্ত তিব্বত প্রদেশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এই তিন প্রদেশের লোকসংখ্যা মোট ১,৮৬,৪৪৬ ; তন্মধ্যে আসকার্দুতে ১,০৬,৮০৫, কার্গিলে ৪৭,৭২৭ ও লাদাকে ৩১,৯১৪। এই প্রদেশ তিনটির পরিমাণ মোট ৩০,০০০ বর্গ মাইল।

রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়, কনিষ্ক (খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী) মিহিরকুল (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং ললিতাদিত্য (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) তিব্বতের এই প্রদেশগুলি শাসন করিয়াছিলেন।

হৃতরাজ্য হইয়া এই প্রদেশের লামা-রাজা কাশ্মীররাজের শরণাপন্ন হন ও কাশ্মীররাজ তাঁহাদিগের জন্য বাৎসরিক পাঁচশত টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন এবং লাদাকের রাজধানী লে শহরের নিকট স্তোগ নামক গ্রামে বাস করিতে অনুমতি দেন।

পশ্চিম তিব্বত প্রদেশ জয় করিয়া জোরোয়ার সিং লাসা জয় করিতে চেষ্টা করেন ও ঐ প্রদেশের বহু প্রাচীন মঠ, গুম্ফা, ছোর্তেন, অট্টালিকা ও গ্রাম ধ্বংস করেন। কিন্তু মানস-সরোবরের কাছে রুদোখ নামক স্থানে চীন সৈন্যের নিকট এইরূপ সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হন যে, তাঁহার যাবতীয় সেনা হত হয় ও তিনি নিজেও ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর যুদ্ধে হত হন। তারপর দেওয়ান হরিচাঁদ ও রতনের অধীনে ৭,০০০ হাজার ডোগ্রা সৈন্য কাশ্মীর হইতে আসিয়া জিগস্‌মেদ নামজালকে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করেন ও লাদাক প্রদেশে আসিয়া সৈন্যদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। কাশ্মীররাজ সেই সময় তাড়াতাড়ি লাসারাজ্যের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলেন

ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর লাসাতে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার ভেটস্বরূপ পাঠাইতে অঙ্গীকার করেন। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহারা ঐ অঙ্গীকার পালন করিয়া আসিতেছেন। ভেটের অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে আঠারোটি শ্বেত চামর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যোজিলা পার হইয়া আসিয়া আমরা এক ঝরণার নিকট উত্তম স্থান দেখিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও মধ্যাহ্ন-ভোজনের যোগাড় করিতে লাগিলাম। চারিদিকেই বরফ। কোথাও একটু ঘাস বা অল্প মাটিও দেখা যাইতেছে না। এক উচ্চ প্রস্তরখণ্ডে স্বামীজী বসিলেন। উহাই তাঁহার আহার্য রাখিবার স্থান হইল। স্থানাভাবে গরম চা-পূর্ণ থার্মস বোতলটি বরফের উপরই রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে উহা তুলিয়া লইয়া তিনি গণিয়া ও ঘোড়াওয়ালাদের সহিত রং-তামাসা করিতে লাগিলেন। "দেখ, বরফের ওপরে আছে তবুও এর ভেতরে চা এত গরম আছে যে, খুললেই ধোঁয়া বার হচ্ছে।" উহারা সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে তাকাইল। এমন সময় হঠাৎ পাহাড়ের উপর ঘোড়ার পদশব্দ শুনা গেল। আমরা সকলে সচকিত হইয়া সেই দিকে চাহিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ মেচোহী হইতে সিমসে খর্বু॥

দেখিতে দেখিতে লে শহরের উজির ওয়াজিরৎ সাহেব সদলবলে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমরা কে ও কোথায় যাইতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী দুইখানি পরিচয়-পত্রই তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও তিব্বতের পথের সমস্ত জেলদার, দারোগা ও চৌকিদারগণের নামে একখানি সাধারণ হুকুমনামা লিখিয়া স্বামীজীকে দিলেন, যেন পথে তাঁহারা সকলে আমাদিগকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। স্বামীজী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, তিনিও প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। বেলা আন্দাজ পাঁচটায় আমরা মেচোহী ডাকবাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বালতালের ন্যায় মেচোহীতেও কোন লোকের বসতি নাই। একটি ডাকঘর ও একটি সরাই আছে। ডাকবাংলোর চৌকিদারের নিকট শুষ্ক ঘাস ও জ্বালানি কাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। জ্বালানি কাষ্ঠের মূল্য প্রতি মণ চৌদ্দ আনা ও ঘাসের পাঁচসিকা মাত্র। এই প্রদেশের অধিকাংশ ডাকবাংলোতেই কাঠ ও ঘাসের মূল্য একই প্রকার।

মেচোহীর ডাকবাংলোটি অতি উচ্চস্থানে একেবারে পাহাড়ের চূড়ার নিকট চিরস্থায়ী তুষারনদীর (গ্লেসিয়ার) কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। সেইজন্য রাত্রে এইস্থানে অত্যন্ত শীত বোধ হয়। সর্বদা প্রবল বেগে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে থাকে। জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সময়ে সময়ে জলপাত্র ফাটিয়া যায়। কারণ জল বরফ হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে সকল জলপাত্রের মুখ বড় যেমন বালতি, গামলা, প্রভৃতি সেগুলির কোনও ক্ষতি হয় না।

সন্ধ্যা হইতেই চারিদিক অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া প্রবল ঝড় আসিল ও খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন ঃ "তুষার বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ।" অল্প পরেই ভীষণ তুষারপাত আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক বরফে ঢাকিয়া গেল। যেরূপ ভীষণ শীত বোধ হইতে লাগিল, ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কাহাকেও তাহা বুঝানো অসম্ভব। আমরা সমস্ত রাত্রে মোট আড়াই মণ কাষ্ঠ ঘরের চিমনিতে পুড়াইয়াও ঘর কিছুতেই গরম করিতে পারিলাম না। এমনকি আগুনের দুই হাত দূরে যাইলেই শীতে জমিয়া যাইতে হয়। খাটিয়াখানি আগুনের অতি নিকটে রাখিয়াও সমস্ত রাত্রি শীতের কাঁপুনিতে এক মুহূর্তের জন্যও চক্ষের দুই পাতা এক করিতে পারিলাম না। মনে হইতে লাগিল আগুনের আজ তেজ নাই। জ্বলন্ত আংরা হাতে তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রি শেষ হইয়া গেলে প্রভাতে আমরা শ্রীনগর হইতে যে তাঁবু ভাড়া করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা নিষ্প্রয়োজন বোধ হওয়াতে, বাংলোর চৌকিদারদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। ঠিক করিলাম, আমাদের ঘোড়াওয়ালা দ্রাস পর্যন্ত আমাদের সহিত যাইয়া যখন গন্ধরবল ফিরিবে তখন তাঁবুটি এইস্থান হইতে লইয়া গিয়া আমাদের হাউস-বোট-এর মাঝি মামদুকে প্রদান করিবে। মামদু উহা শ্রীনগরে লইয়া গিয়া আমরা যে দোকান হইতে উহা আনিয়াছিলাম সেখানে ফিরাইয়া দিবে। তাঁবুটির মাসিক ভাড়া বারো টাকা।

আহারাদি করিয়া আমরা বেলা সাড়ে নয়টার সময় মেচোহী হইতে বাহির হইলাম। অদ্য আমাদিগকে দ্রাস নামক গ্রামে যাইতে হইবে। ঐ স্থানটি মেচোহী হইতে একুশ মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। পথ সমস্তই তুষারাবৃত, পর্বতের উপর দিয়া গিয়াছে। পথে বাহির হইতেই পুনরায় এক পসলা তুষারপাত হইয়া গেল, তুষারগুলি ঠিক পেঁজা তুলার মতো বাতাসে উড়িতে ও পড়িতে থাকে। অল্প তুষার হাতে লইয়া ফুঁ দিলে উড়িয়া যায়। কাপড়ে বা জামায় তুষার পড়িলে কাপড় ভিজিয়া যায় না। কাপড় ঝাড়িয়া ফেলিলেই তুষার সব পরিষ্কার হইয়া যায়। মেচোহী হইতে ছয় মাইল উত্তরে আসিয়া আমরা মাটায়ন নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামে একটি ডাকবাংলো ও সরাই আছে। এই গ্রামখানিকে কাশ্মীর হইতে তিব্বতে আসিতে প্রথম তিব্বতীয় গ্রাম বলা চলে। তথায় ১০।১২ ঘর পাহাড়ী মুসলমানের বাস। এইস্থানে জ্বালানি কাষ্ঠ ও দুগ্ধ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। গ্রামটি প্রায় মেচোহীর মতোই ঠাণ্ডা।

গ্রীষ্মকালেও দুইটি গরম জামা, টুপি, দস্তানা, মোজা ও পট্টি পরিয়া না থাকিলে শীতে জমিয়া যাইতে হয়। ধুতি পরিয়া এই দেশের আবহাওয়ায় বাস করা চলে না। গরম পায়জামা ছাড়া এই দেশে আসা কাহারও পক্ষে নিরাপদ নহে। মাটায়ন গ্রামটি প্রায় দেড় মাইল লম্বা একটি ময়দানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। গ্রামের নিকটেই ২।৩টি ঝরণা আছে। প্রাতঃকালে বেলা ন'দশটা পর্যন্ত এই সমস্ত ঝরণার উপর বরফের একটি কঠিন আবরণ পড়িয়া থাকে। এইস্থান হইতে চার মাইল গমন করিয়া আমরা 'পানদাস' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট পৌঁছিলাম। সেখানে ঘোড়াগুলিকে কিয়ৎক্ষণের জন্য খুলিয়া দিয়া সকলে বিশ্রাম করিলাম।

পরে বেলা প্রায় ছয়টার সময় আমরা দ্রাসের ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্রাস গ্রামটি ছোট-বড় চারি-পাঁচটি গ্রামের সমষ্টিবিশেষ। গ্রামগুলি এতই নিকটে অবস্থিত যে, দূর হইতে দেখিলে একখানি বড় গ্রাম বলিয়া মনে হয়। গ্রামের নিম্নে বহুদূর বিস্তৃত ময়দান। ময়দানে শিখগণের একটি প্রাচীন দুর্গ আছে। গ্রামে অনেক সফেদা গাছ আছে। ইহার জমি খুব উর্বর। এইস্থানে প্রচুর যব উৎপন্ন হয়। স্থানটি ১০,০০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও সর্বদা এইস্থানে ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত

হইয়া থাকে। দ্রাসকে তিব্বতীয়গণ 'হেম বাব্‌স্' বলেন। এই স্থানের অধিবাসীগণ অধিকাংশই দার্দ ও কিয়দংশ বালটিক জাতীয়। লোকসংখ্যা সর্বসমেত প্রায় একশত। তাহাদের মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অল্প। মুসলমানগণকে ভাটিয়া ও বৌদ্ধদিগকে লামা কহে। এই প্রদেশে সর্বত্রই দুই প্রকার লামার বাস। তাহাদের মধ্যে একদল লোহিতবর্ণের পোশাক ও অপর দল পীতবর্ণের পোশাক পরে। ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য লামারা এই দুই দলে বিভক্ত। লামারা শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইঁহারা মুসলমানদিগের মতো হিংসাপরায়ণ নহে। লামাদিগের মস্তক মুণ্ডিত।

আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ যে প্রকার কানঢাকা টুপি ব্যবহার করেন তিব্বতীয় লামারাও সেইরূপ টুপি পরেন। একটি মোটা আলখাল্লাই ইঁহাদের প্রধান পরিচ্ছদ। ইঁহারা হাঁটু পর্যন্ত উঁচু একপ্রকার লোম-জমানো নামদার বুট জুতা তৈয়ারী করিয়া পরিধান করেন। লাদাকীদের জুতার তলায় চামড়া। ইহার গোড়ালি বা ফিতা থাকে না। ইঁহারা অনেকেই নিজের হাতে আপনাদের জুতা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। মোজার ব্যবহার ইঁহাদের মধ্যে নাই, মোজার বদলে তাঁহারা গরম পটি ব্যবহার করেন। লাদাকী মুসলমান ছাড়া প্রত্যেকের মাথাতেই লম্বা চুলের বিননি (পিগটেইল) পৃষ্ঠদেশে ঝুলানো থাকে।

এই দেশের স্ত্রীলোকেরা দুই কানের দুই দিকে দুইটি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাথার মধ্যস্থলে প্রায় সওয়া হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া ঐপ্রকার চামড়ার একটি রুমাল বাঁধে। ঐ চামড়াতে নীলা, স্ফটিক, ফিরোজা প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের প্রস্তরখণ্ডসকল গাঁথা থাকে এবং লোমসমেত একটি ভেড়ার চামড়া পিঠের উপর বাঁধিয়া রাখে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন, মাথার দুই দিকে দুইটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-লোকেরা উক্ত প্রকারের বুট জুতা পরে, কিন্তু টুপি পরে না। একটি লম্বা আলখাল্লা ও কোমরে ঘাঘরা তাহাদের প্রধান পরিচ্ছদ। লাদাকী স্ত্রী ও পুরুষগণ সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, খর্বাকৃতি ও শ্যামবর্ণ। দ্রাস গ্রামে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি যথা—ছাতু, আটা, মাখন, ডিম ও দুধ প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহাদের মূল্য এইরূপ ঃ—আটা ছয় আনা সের, মাখন দশ আনা পোয়া, ডিম সাত আনা ডজন, ছাতু তিন আনা সের ও দুধ তিন আনা সের ইত্যাদি। এই সকল জিনিস ছাড়াও এই পথের প্রত্যেক ডাকবাংলোতেই মুর্গি পাওয়া যায়। উহার মূল্য আট আনা হইতে এক টাকার ভিতর। দ্রাসে প্রায় পঞ্চাশটি ভাড়াটিয়া ঘোড়া আছে। এইস্থানে একটি বড় সরাই, একটি কাছারী, কতকগুলি সরকারী বাংলো এবং একটি ডাক ও তার-ঘর আছে। এই প্রদেশের যাবতীয় ডাক ও তার-ঘর ইংরাজ-সরকারের অধীনে। টেলিগ্রাফের তার বরাবর শ্রীনগর হইতে লে পর্যন্ত আছে। ডাকবাংলোয় রাত্রে আমরা গভীর নিদ্রা উপভোগ করিয়া খুব তৃপ্তিলাভ করিলাম। কারণ, গত

রাত্রে মেচোহীতে মোটেই ঘুম হয় নাই। দ্রাসে মেচোহী বা মাটায়ন অপেক্ষা শীত অনেক কম। প্রাতে আমরা পুনরায় যাত্রার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

গন্দরবল ও সোনমার্গ হইতে আনীত ঘোড়াগুলির ভাড়া ও বকশিস চুকাইয়া দিয়া আমরা নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। দ্রাস পর্যন্ত পদব্রজে আসিয়া আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঠিক হইল এইস্থান হইতে আমরা অশ্বারোহণে যাইব। গ্রামের ঠিকাদারকে বলিয়া তিনটি সোয়ারী ঘোড়া ভাড়া লওয়া হইল। ঘোড়াগুলির জিন কাষ্ঠের তৈয়ারী। চামড়ার জিন এই দেশে পাওয়া যায় না। লাগামগুলি ঘোড়ার বালামচি বিনাইয়া প্রস্তুত। রেকাবগুলিও ঐপ্রকার দড়ি দিয়া বাঁধা। আমাদের ও গণিয়ার ঘোড়াতে অল্প অল্প মাল বাঁধিয়া লওয়া গেল। সোয়ারী-ঘোড়ার উপর কিছু কিছু মাল চাপাইয়া লওয়া এই প্রদেশের রীতি। টাট্টুর দুই দিকে মাল বাঁধা ও মধ্যস্থলে সোয়ারী উপবিষ্ট, দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের ধোপার গাধার মতো। ঘোড়ায় চড়িয়া পায়ের অনেকটা বিশ্রাম হইল, কারণ এই কয়দিন পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় পার হইতে হইতে পায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বেলা সাড়ে আটটার সময় দ্রাস হইতে আমরা রওনা হইলাম। আমাদিগের পড়াও-এর নাম সিম্‌সে খর্বু। দ্রাস হইতে সিম্‌সে খর্বু প্রায় একুশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। রাস্তা বরাবর পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে ও বেশ চওড়া। দুইটি অশ্বারোহী পাশাপাশি যাইতে পারে। পথে বহুসংখ্যক চমরী গাই-এর পিঠে চরসের ও নামদার বস্তা চাপাইয়া বহু ইয়ার-কান্দি সওদাগর কাশ্মীরের দিকে চলিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে পার্বত্য পথগুলি সব ভাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম।

চরসের বস্তাগুলি তিব্বতীয় ছাগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ায় প্রস্তুত। চরস ও নামদা ইয়ারকান্দের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এইগুলি ইয়ারকান্দ হইতে আসিয়া কাশ্মীরের ভিতর দিয়া বরাবর রাওলপিণ্ডি যায় ও তথা হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র রপ্তানী হয়। এই প্রদেশে এক বস্তা চরসের মূল্য পঞ্চাশ টাকা হইতে ষাট টাকার মধ্যে, কিন্তু যখনই উহা রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছায় তখনই উহার মূল্য দুই হাজার টাকা হইয়া যায়। এই লাভজনক ব্যবসাটি সম্পূর্ণ ইংরাজ সরকারের আবগারী বিভাগের হস্তগত।

ইয়ারকান্দ মধ্য-এশিয়ার একটি পার্বত্য মুসলমান-রাজ্য। ইহা পশ্চিম তুর্কীস্তান-এর অন্তর্গত। কারাকোরাম পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া বাইশ দিন গমন করিলে ঐ প্রদেশে পৌঁছানো যায়। সঙ্গে তাঁবু, খাদ্য, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্তই লইয়া যাইতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মকালই ঐ স্থানে যাইবার প্রশস্ত সময়। বৎসরের অন্যান্য সময় বরফ পড়িয়া রাস্তা ৭।৮ মাসের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ঐ প্রদেশে যাইবার জন্য ঘোড়া, কুলী ও চমরী গাই যথেষ্ট পাওয়া যায়। চমরী গাই-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, পাহাড়ে

যতই বরফ পড়ুক না কেন, ইহারা ঠিক তাহার উপর দিয়া পথ খুঁজিয়া গমন করিবে, কখনও পা পিছলাইবে না। সেইজন্য পার্বত্য পথে বরফের উপর দিয়া রাস্তা খুলিবার জন্য প্রথমে ২০।২৫টি চমরী গাই সেই পথে চালানো হয়। তাহাদের পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া ঘোড়া ও মানুষ নির্বিঘ্নে গমন করে। নচেৎ নূতন তুষারের উপর পা দিলে তুষার ভাঙিয়া বা পা পিছ্‌লাইয়া একেবারে পাহাড়ের নীচে পড়িয়া যাইবার ভয়। পুরাতন তুষার পাথরের ন্যায় শক্ত হয়। তাহার উপর দিয়া চলিলে কোনই বিপদ হয় না। চমরী গাই নূতন ও পুরাতন তুষার মনুষ্য অপেক্ষা অধিক চিনিতে পারে।

নামদা একপ্রকার লোম-জমানো মোটা ও সাদা কম্বল। ইহা লম্বায় প্রায় তিন হাত ও চওড়ায় প্রায় দুই হাত হয়। এই প্রদেশে ইহার মূল্য আড়াই টাকা, কিন্তু শ্রীনগরে এক-একখানি চার টাকার কম পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে নানাবিধ ফুল, লতা, পাতা প্রভৃতি সূচীকার্য-করা নামদাও পাওয়া যায়। ইহার মূল্য আরও দুই-তিন টাকা অধিক। ইহা কলিকাতায় কাশ্মীরীদের দোকানে বিক্রয় হয়।

পথে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ পাথরের পাহাড় আছে। এইগুলিকে কষ্টিপাথর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পার্বত্য নদীগুলি বহুকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া কিরূপে স্তরে স্তরে পাথর কাটিয়া নিজ পথ সরল করিয়া লইয়াছে তাহা প্রকৃতই দেখিবার জিনিস। অনেক ভূবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সকল স্তর দেখিয়া নদীর বয়স বলিয়া দিতে সক্ষম হন।

এই পথে কিছুদূর আসিয়া দুন্‌-দুল খাঙ্গ নামক গ্রামে আমাদের সহিত একদল লামার দেখা হইল। তাঁহারা নানা স্থানে বেড়াইয়া ধর্মপ্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সহিত মাল-বোঝাই ঘোড়া, তাঁবু ও ধর্মপুস্তক এবং তাঁহাদের দলে পাঁচজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক আছে। পুরুষদের প্রত্যেকের হাতে 'মণিচক্র' (মণি—প্রেয়ার হুইল) আছে। আমরা অনেকবার তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম, 'একটি মণি আমাদিগকে দাও, যাহা দাম চাও দিতেছি', কিন্তু তাহারা কিছুতেই দিতে স্বীকৃত হইল না।

একটি গোল তামার কৌটার মধ্যস্থলে একটি প্রায় আধ হাত লম্বা ও নানাবিধ কারুকার্য-করা হাতল দিয়া মণিচক্রগুলি প্রস্তুত। ইহাতে একটি ছোট শিকলে একটি তামার ছোট গোলা বাঁধা থাকে। কৌটার ভিতর তুলট কাগজে একলক্ষবার লামাদের ধর্মের 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' (ওঁ মণিপদ্মকে নমস্কার) মন্ত্রটি লেখা থাকে। হাতল ধরিয়া ঘুরাইলেই কৌটাটি ঘুরিতে থাকে। ইঁহাদের বিশ্বাস একবার ইহা ঘুরাইলে একলক্ষবার মন্ত্রটি জপ করার ফল হয়। লামাদের ইহাই জপমালা। আমাদের মতো রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর জপমালা ইহাদের নাই। কেহ কেহ স্ফটিকের বা হাড়ের মালাও গলায় পরেন।

বেলা প্রায় শেষ হইতেছে, এমন সময় পনেরো মাইল আসিয়া আমরা তাসগাম নামক স্থানে পৌঁছিলাম। পূর্বে এই স্থানে ডাকের রানার বদলি হইত। এইস্থান হইতে শিঙ্গো নদী পার হইয়া ছয় মাইল যাইলে সিম্‌সে খর্বু পৌঁছানো যায়। এই লম্বা পড়াও-এ আসিবার জন্য ঘোড়া ও কুলির ভাড়া কিছু বেশী লাগে। অবশেষে সিম্‌সে খর্বুর ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাকবাংলোটি বন্ধ ছিল। গণিয়া চৌকিদারের বাড়ী গেল। চৌকিদার আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এই সকল ডাকবাংলোয় প্রত্যহ যাত্রী আসেন না। যাত্রীরা পার্বত্য পথে সমস্ত দিন চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যার সময় পড়াও-এ আসিয়া পৌঁছান ও তাঁহাদের অধিকাংশই চটিতে আশ্রয় লন। সেইজন্য চৌকিদারগণ দিবসে আপন আপন বাড়িতে বা ক্ষেত্রে কাজ করে এবং সন্ধ্যার সময় আসিয়া ডাকবাংলোয় হাজিরা দেয়। ডাকবাংলোর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ২৫।৩০ হাত নিম্ন দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং উত্তর পার্শ্বে সরকারী তরফ হইতে ২০।২৫টি বেদ, সফেদা (পপ্‌লার) প্রভৃতি গাছের একটি বাগান করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে উত্তমরূপে জল সেচনেরও বন্দোবস্ত আছে। সফেদা গাছগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের অশ্বত্থ গাছের মতো এবং বেদ গাছগুলি উইলো গাছের মতো হয়। এই প্রদেশের যাবতীয় ডাকবাংলোয় ও গ্রামে এই প্রকার বাগান আছে। এই সকল সরকারী বাগান ছাড়া এই প্রদেশে অন্য কোথাও কোন গাছ নাই। ডাকবাংলোর পার্শ্বেই একটি চটি অবস্থিত।

ডাকবাংলোর চৌকিদারের নিকট আটা, মাখন, দুধ, কাঠ প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়, কোন দোকান নাই।

এই গ্রামখানি সমুদ্রতল হইতে ৮০০০ ফিট উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এই প্রদেশে এই স্থান ছাড়া এত নিম্নে অবস্থিত আর অন্য কোন গ্রাম নাই। আমরা অনেক উপর হইতে আসিতেছি বলিয়া এখানে আসিয়া আমাদের বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল, প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস আমাদিগের নিকট বসন্তকালের গরম হাওয়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল। গ্রামখানি অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১৪।১৫ ঘর লামা ও মুসলমানের বাস।

এই প্রদেশের লামারা হেঁট হইয়া জলে মুখ দিয়া জল পান করে। ইহা দেখিতে অতীব কৌতূহলপ্রদ। ইহারা কখনও জলে হাত দেয় না, ইহাদের আলখাল্লার বুকের ভিতর এক-একটি কাঠের ছোট বাটি থাকে, ইহার দ্বারাও তাহারা জল তুলিয়া পান করে। ইহারা যব হইতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত করে, তাহাকে ইহারা 'ছাং' বলে। কানারির ছাতু, ছাং ও চা ইহাদের খাদ্য। কানারি একপ্রকার যব। ইহার আটা হইতে লামারা খুব মোটা ও ছোট ছোট পিঠার মতো রুটি প্রস্তুত করে।

এই প্রদেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। নিজের মাতৃভাষা লাদাকী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা তাহারা জানে না। আমরা কাশ্মীর হইতে একজন দোভাষী পথপ্রদর্শক

সঙ্গে না আনিলে এই প্রদেশে আসিয়া অত্যন্ত কষ্টে পড়িতাম। দৈনিক এক টাকা বেতনে এইপ্রকার লোক কাশ্মীরে যথেষ্ট পাওয়া যায়। যাহাকে পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইতে হইবে সে লোকটি যাহাতে বিশ্বাসী ও বহুদর্শী হয় এবং তাহার এই কর্মের লাইসেন্স ও প্রশংসাপত্র থাকে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আবশ্যক। সর্বদা দোভাষীর উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া নিজেরাই ইহাদের দুই-একটি কথা যাহাতে বুঝিতে পারা যায় সেজন্য ইহাদের ভাষা কিছু শিক্ষা করিয়া লইলে ভ্রমণকারীগণের খুবই সুবিধা হয়। যে কয়টি কথা এই প্রদেশে আমাদিগের জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল তাহা এই ঃ—

লইয়া আইস	...	গ্রাংমো	নাই	...	মেৎ
ঠাণ্ডা	...	খোঁ	আছে	...	ইউৎ
গরম	...	দ্রোন্‌মো	রাস্তা	...	লাম্প
কাঠ	...	শিং	ভাল	...	ঘেলা
দুধ	...	অর্জন	চল	...	শোঁ
ডিম	...	ঠুল	আস্তে আস্তে	...	কুলে কুলে
ঘোড়া	...	তা	শীঘ্র শীঘ্র	...	সোক্‌মো সোক্‌মো
ছাতু	...	ফে	এক	...	চিক্
আগুন	...	মে	দুই	...	নিস্
কত	...	সিম্‌সে	তিন	...	সুম
আধ	...	ফেৎ	চার	...	আগা
পশ্চিম	...	চাং	উত্তর	...	সার
কটি	...	টাকি	দক্ষিণ	...	লো
খাওয়া	...	ঝোন্ত	পূর্বে	...	নুপ

ইহারা মাইল কাহাকে বলে তাহা জানে না। দূরত্ব বুঝাইবার জন্য ইহারা 'ডাক' শব্দ ব্যবহার করে। এক ডাক অর্থাৎ চার মাইল। চার মাইল অন্তর এক মেল রানার বদলি হয় বলিয়া চার মাইলকে এক ডাক বলে।

রাত্রে এক মণ কাঠ লইয়া আমরা ডাকবাংলোর চিমনি প্রজ্জ্বলিত করিলাম ও উহাতেই স্নানের জল গরম করিয়া লইলাম। সারাদিন পথে আসিতে আসিতে গা ও জামাকাপড় ধুলায় এবং ঘোড়ার উপর বসিয়া 'গা জুঁয়া' নামক একপ্রকার উকুনে ভরিয়া গিয়াছিল। এই দেশের ঘোড়ার গায়ে অসংখ্য জুঁয়া থাকে। স্নানাদি করিয়া ও কাপড়গুলি গরম জলে ধুইয়া রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই যাহাতে সেগুলি শুকাইয়া যায় সেজন্য চিম্‌নির নিকট দড়ি টাঙাইয়া সেগুলি শুকাইতে দিলাম। ঘোড়ায় চড়া বা পাহাড় চড়াই-উৎরাই করার দরুন শরীরে যে বেদনা হয়, গরম জলে স্নান করিবামাত্র তাহা সম্পূর্ণরূপে দূর হয় এবং শরীরে নূতন শক্তি ফিরিয়া আসে।

চিম্‌নির আগুনে আমরা চা, পরোটা, তরকারি প্রভৃতি বন্ধন করিয়া রাত্রের আহার সমাপ্ত করিলাম ও তাহা হইতে কিছু কিছু পরের দিন সকাল ও দুপুরের জন্য থার্মফ্লাস্ক ও ইকমিক্ কুকার-এ ভরিয়া রাখিলাম। এই পথে খাদ্যাদি সকল সময়ের জন্য একেবারেই রাঁধিয়া ফেলিতে হয়। কারণ সকালে জলযোগ শেষ করিয়া যতশীঘ্র মালপত্রাদি বাঁধিয়া পড়াও হইতে বাহির হওয়া যায় ততই সুবিধা, রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিলে পার্বত্য পথে তাড়াতাড়ি চলিতে পারা যায় না ও পরবর্তী পড়াওতে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আমরা সিম্‌সে খর্বু হইতে পুনরায় রওনা হইলাম। অদ্য আমাদিগের গন্তব্য স্থান কার্গিল নামক শহর,—সিম্‌সে খর্বু হইতে পনেরো মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত।

হিমিশ্ গুম্ফার সম্মুখে স্বামিজী ও গনিয়া
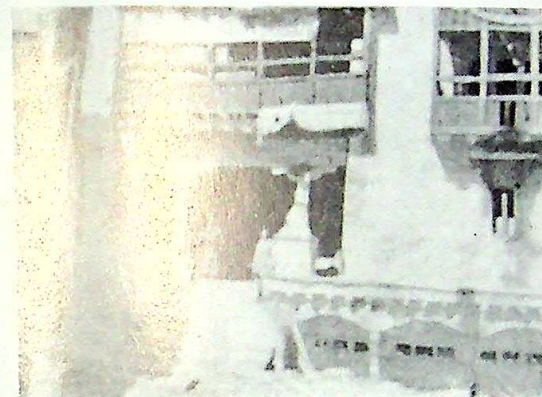
হিমিশ্ মন্দিরের দ্বারে স্বামিজী ও কোষাধ্যক্ষ লামা

গন্ধরবলঘাট
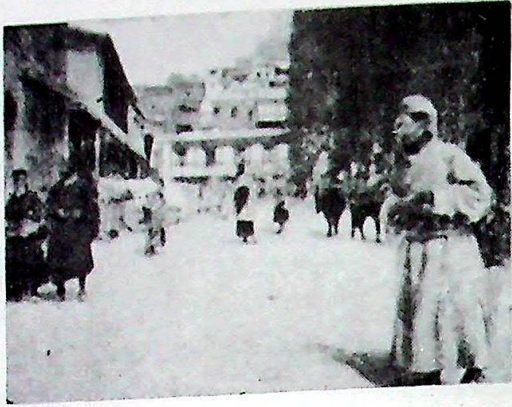
'লে' বাজার। সম্মুখে লামা ও চামরী গরু
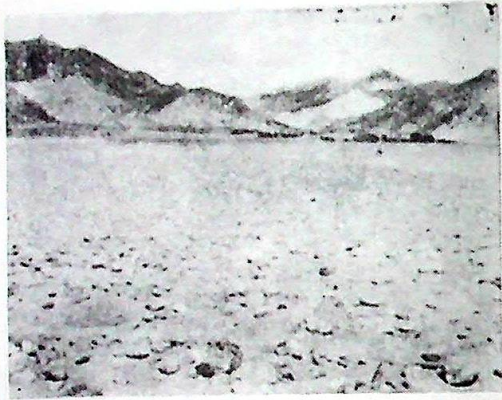
ফিয়াঙ্গ গুম্ফা, দূরে তুষারাবৃত পর্বত
সম্মুখে মরুভূমি
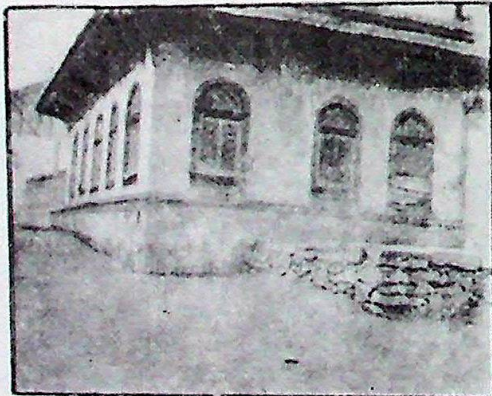
খানা-ইয়ারীতে যীশুখ্রীষ্টের সমাধি মন্দির

শেষনাগ তুষার-নদী
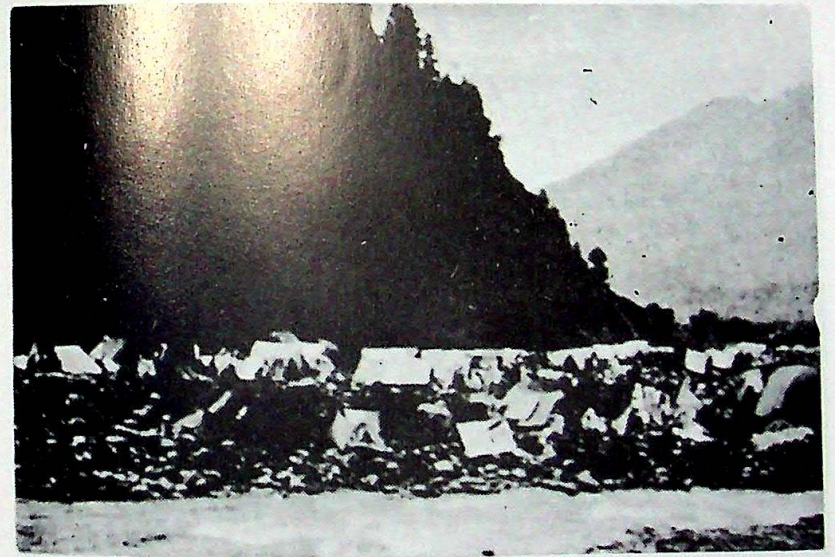
পহেলগাঁও
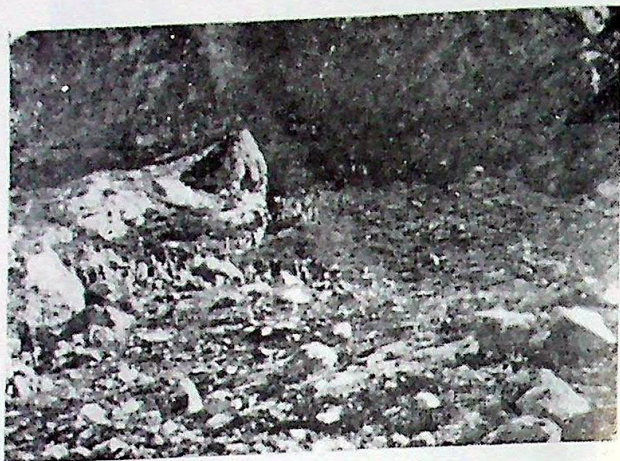
অমরনাথের গুহা ও অমরগঙ্গা
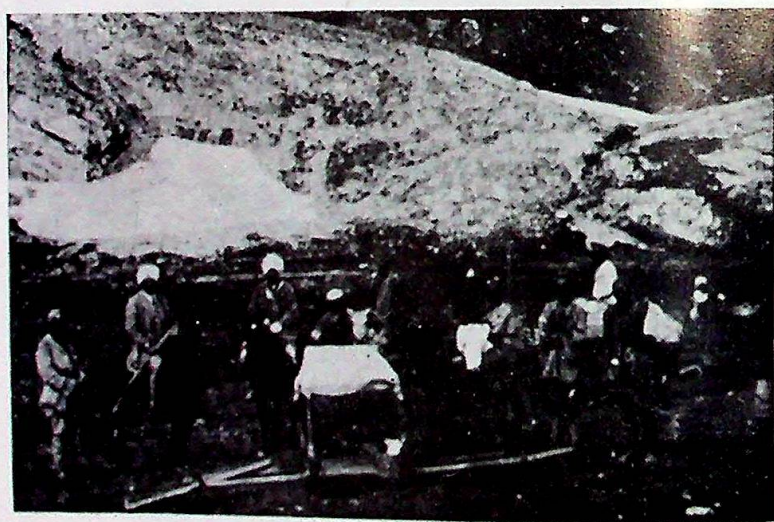
সাচ্‌কাটীর পথে আমাদের দল
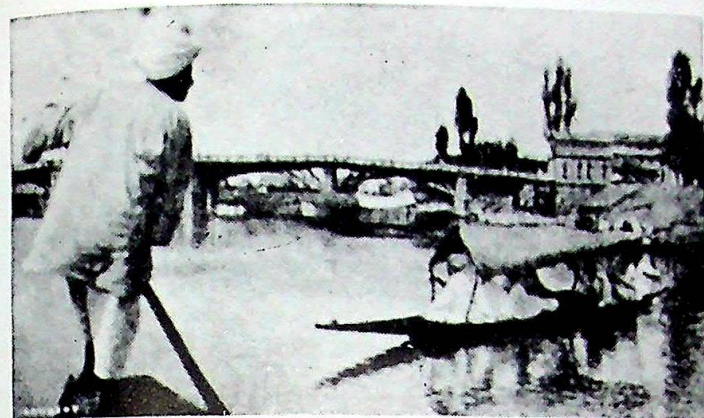
শ্রীনগর—বিতস্তা নদীর প্রথম সেতুর নিকট আমাদের 'শিকারা'
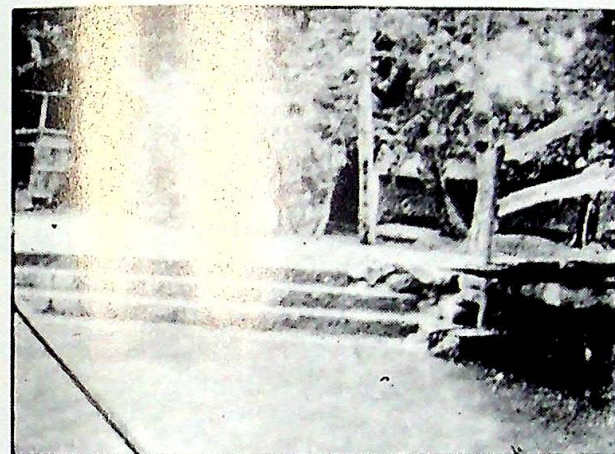
ক্ষীর-ভবানীদেবীর মন্দির

দূরে বাগ্‌গো-দুর্গ। সম্মুখে আমাদের দল
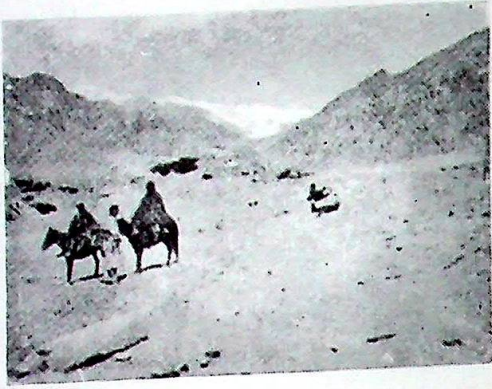
লিকির গুম্ফা। আমাদের গনিয়া ও কুলী।
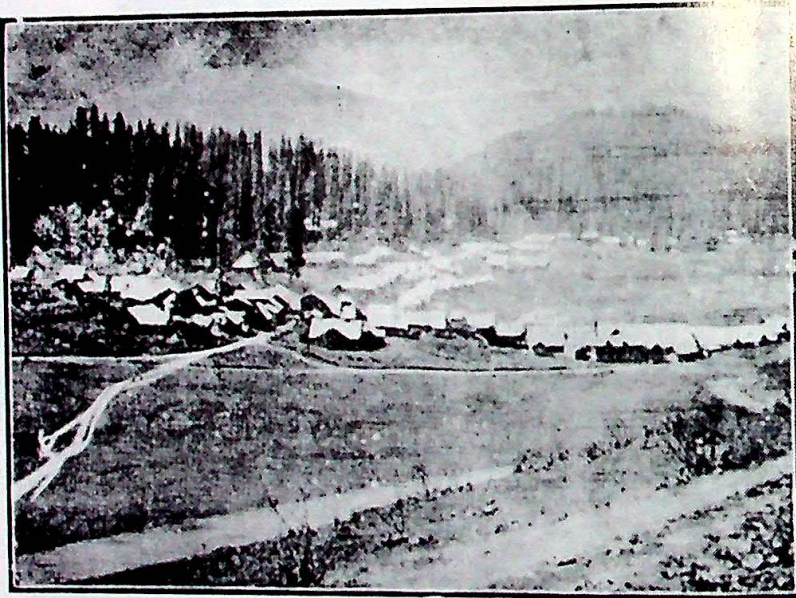
গুলমার্গ-বাজার।
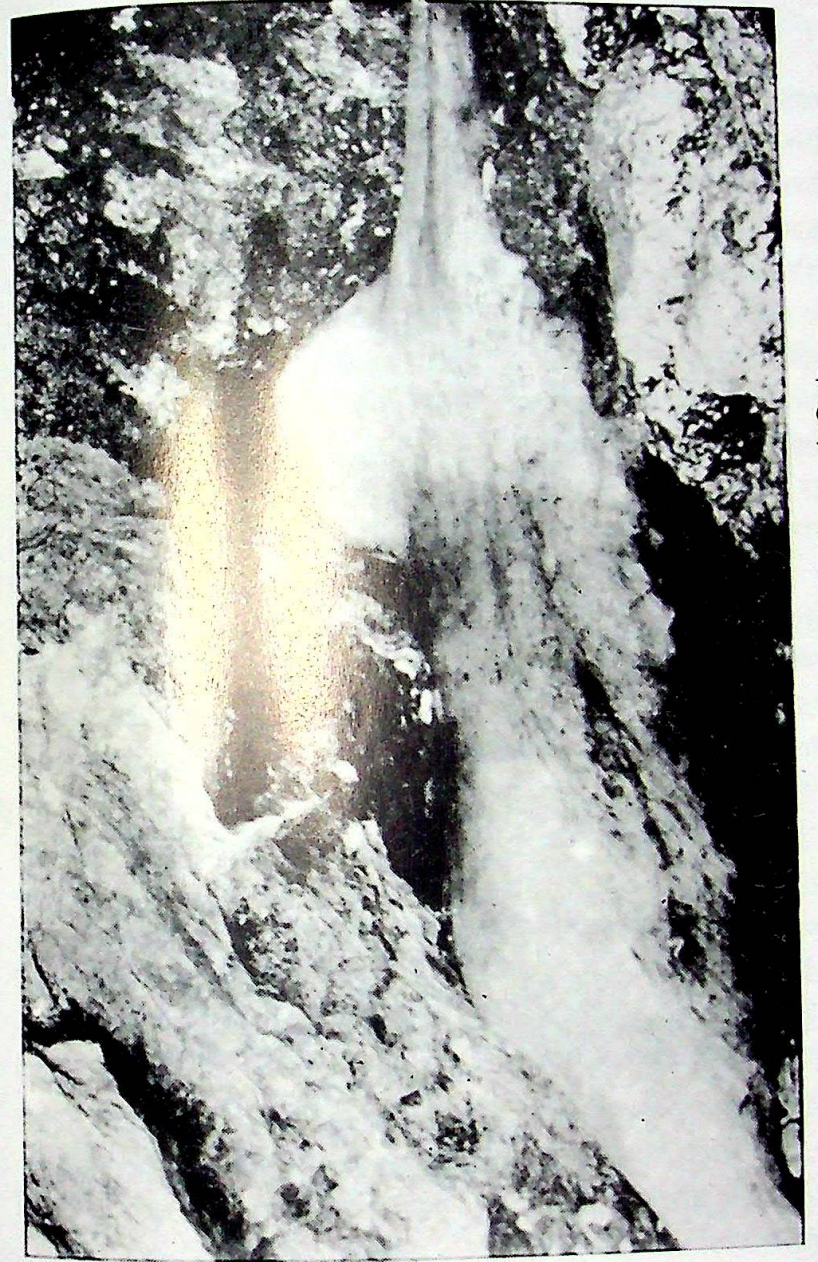
অমরনাথ-গুহা মধ্যে বরফের শিবলিঙ্গ ও গৌরিপীঠ

বুদ্ধদেবের শীর্ণ শরীর
(৬ বৎসর তপস্যার পরে)

নবম পরিচ্ছেদ

॥ লামাউরু গুম্ফা ॥

কিছুদূর আসিয়া আমরা সুরী নদীর তটে পৌঁছিলাম। শিঙ্গোনালা দেওসাই নামক একটি উপত্যকার ভিতর দিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে। খর্বু গ্রামে যে শিঙ্গো নদীটি দেখিয়াছিলাম তাহা এইস্থানে আসিয়া সুরী নদীতে মিশিয়াছে। দেওয়াই উপত্যকাটি ভল্লুক, হরিণ প্রভৃতি শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। বহু শিকারী এইস্থানে ভল্লুক-শিকারের জন্য আসিয়া থাকেন। এইস্থানে একজন মেম ও একজন সাহেব শিকারীর সহিত আমাদের দেখা হইল। তাঁহারা এইস্থানে তাঁবু খাটাইয়া খানসামা প্রভৃতি লইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা কাশ্মীর হইতে এই সুদূর পার্বত্য প্রদেশে শিকার করিতে আসিয়াছেন। দুই-এক দিন থাকিবেন। আমাদের দেশের পুরুষেরা যে স্থানে গমন করিতে কুণ্ঠিত হন, সুদূর শ্বেত দ্বীপ হইতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া অনায়াসে সেইস্থানে ভ্রমণ করিয়া যাইতেছেন। আর আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা গোঁড়া হিন্দুসমাজের বন্দিনী ও পর্দানসীন! 'অসূর্যম্পশ্যা' হইয়া থাকাতেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা।

আমরা বরাবর সুরী নদীর ধারে-ধারে কখনও পাহাড় চড়াই, কখনও উৎরাই করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। এই পথটি ঠিক পূর্বদিকে চলিয়া গিয়াছে; সেইজন্য সম্মুখে সূর্য থাকাতে খুব অসুবিধা হইতে লাগিল। এইস্থানে প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। বাতাস আমাদের পিঠে লাগতে আমাদের বোধ হইতে লাগিল যেন সে তাহার অদৃশ্য হস্ত দিয়া আমাদিগকে তিব্বতের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। পথে একটি লোহার ঝুলানো সেতু পার হইলাম। ঘোড়া হইতে নামিয়া পদব্রজে আমাদিগকে সেই সেতুটি পার হইতে হইল। এইস্থানে আমাদের একজন কুলিকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিলাম। কিছুদূর যাইয়া দেখিলাম যে কুলিটি একটু দূরে বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া আছে। আমরা ঘোড়ায় আসিতেছি তথাপি সে আমাদের অপেক্ষা আগে এখানে কিরূপে আসিল ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া একটি শর্টকাট্ এক পায়ের পথ দেখাইয়া হাসিতে লাগিল। এই সকল পাহাড়িরা যদি এইরূপ সরল না হইত তাহা হইলে মালপত্র লইয়া কোন বিদেশীর পক্ষে এই সুদূর প্রদেশে আসা কখনোই নিরাপদ হইত না।

পথে একস্থানে পানীয় জল নিকটে পাইয়া আমরা অল্পক্ষণ বিশ্রাম ও মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করিলাম। এইস্থানে একটি অতি উচ্চ পর্বতের চূড়ার উপর দিয়া টেলিগ্রাফের তারগুলি এইরূপ কৌশলে বিস্তৃত উপত্যকা ও নদীর অপর পার্শ্বে লইয়া

শত লোকের বাস। এখানে চটি, থানা, সরকারী কাছারী, ডাকঘর প্রভৃতি আছে। শহরটি কার্গিল নদীর তীরে অবস্থিত। কাগিল নদীর উপর বৃহৎ লৌহের ঝোলানো সেতু আছে। ইহার নাম এডওয়ার্ড ব্রীজ। ইহা ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ দ্বারা নির্মিত। এই সেতুর উপর দিয়া লাদাক ও মধ্য-তিব্বতে যাইতে হয়। লাদাকের রাজধানী লে শহর এইস্থান হইতে একশত ছিয়ানব্বই মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

কার্গিলের বাজারটি বেশ বড় ও আবশ্যকীয় প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। এইস্থানের কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য এইপ্রকার যথা ঃ মোমবাতি বারো আনা ডজন, মাংস চৌদ্দ আনা সের, চিনি এক টাকা দুই আনা সের, কেরোসিন তৈল বারো আনা বোতল, পেড্রো সিগারেট ছয় পয়সা প্যাকেট (অন্য কোন প্রকার সিগারেট পাওয়া যায় না) ইত্যাদি।

কার্গিল হইতে আসকার্দু, লাদাক ও কাশ্মীরের দূরত্ব প্রায় সমান। কাশ্মীর হইতে যাঁহারা লাদাক বা আসকার্দু যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কার্গিল শহরে আসিয়া অন্ততঃ একদিন বিশ্রাম করিয়া গেলে পথকষ্ট অনেকটা কম হয়। তিনটি প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কার্গিল শহরটি ঐ তিন স্থানের সওদাগর ও উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে সর্বদা পূর্ণ থাকে।

এই প্রদেশ এতই উচ্চভূমিতে অবস্থিত ও ঠাণ্ডা যে, চাল, ডাল, আলু প্রভৃতি সুসিদ্ধ হইতে বহু বিলম্ব হয়। ভেড়া বা ছাগলের মাংস ৮।৯ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ না করিলে আহারযোগ্যই হয় না। সেইজন্য এই প্রদেশে মাংস খাইতে হইলে উত্তমরূপে কিমা করিয়া কাটিয়া মাংসের বড়া ভাজিয়া লইতে হয়।

১০,০০০ ফিটের অধিক উচ্চ না হইলেও চারিদিকে চিরস্থায়ী তুষার-মণ্ডিত পাহাড় থাকার দরুন এইস্থানে দিবসে উত্তাপ গড়ে পঞ্চাশ ডিগ্রি ও রাত্রে শূন্য ডিগ্রি হয়। শীতকালে পথঘাট সমস্তই বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়, কেবল ডাক চলাচল করে মাত্র। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে অত্যধিক তুষারপাত হয়।

যে সকল ভ্রমণকারীরা শ্রীনগরের জয়েন্ট কমিশনার সাহেবের নিকট হইতে লাদাক বা আসকার্দু যাইবার জন্য ছাড়পত্র লইয়া আসেন, তাঁহাদিগকে এইস্থানের অধিক আর যাইতে দেওয়া হয় না। এখানে আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীকেই নায়েব তহশীলদার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নিজ নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি বলিয়া আরও উত্তরে যাইবার অনুমতি লইতে হয়। এই নিয়মটি বিশেষ করিয়া শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীগণের জন্য প্রস্তুত, এই দেশীয়গণের জন্য তত অধিক নহে। তিব্বতীয়গণ শ্বেতাঙ্গদিগকে তাঁহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে বড়ই নারাজ। পূর্বে এই প্রদেশে আসিতে চেষ্টা করায় বহু শ্বেতাঙ্গ হতাহত হইয়াছেন।

কার্গিলে নানা ধর্মের লোক বাস করেন। এইস্থানে মুসলমানদিগের মসজিদ ও শিখদিগের একটি গুরুদোয়ারা আছে ; এই গুরুদোয়ারায় ২।৩ জন শিখ বাস করেন।

পূর্বে মুসলমানগণ যখন এই প্রদেশে অত্যন্ত অত্যাচার করিতে থাকেন, তখন এই প্রদেশের লামারা তাঁহাদের দেবতার শরণাপন্ন হন। দেবতা স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন ঃ "তোমরা পাঞ্জাবের শিখগুরু অর্জুন সিংকে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে বল।" গুরু অর্জুন সিংকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গমন করিল এবং তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। গুরু অর্জুন সিং তখন নব উত্থিত শিখ সম্প্রদায়ের অধীশ্বর। তাঁহার আজ্ঞায় সহস্র সহস্র শিখ এই প্রদেশে আসিয়া মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া দিল ও শিখরাজ্য স্থাপন করিল।

রাত্রি শেষ হইলে সকালবেলায় আমরা দ্রাস হইতে আনীত ঘোড়াগুলি পরিত্যাগ করিয়া এইস্থান হইতে নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। এইস্থান হইতে কেবল এক পড়াও যাইবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। অদ্যকার পড়াও-এর জন্য প্রত্যেক ঘোড়ার ভাড়া এক টাকা লাগিবে। এইস্থান হইতে লে শহর পর্যন্ত এই নিয়ম। তবে যদি কোন লে'র ঘোড়া কার্গিল হইতে ফিরিয়া যাইতেছে এইরূপ পাওয়া যায়, তাহা হইলে দরেও বিশেষ সুবিধা হয় এবং প্রত্যহ ঘোড়া ভাড়া করার ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু গণিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেইরূপ কোন ঘোড়া পাইল না। পূজনীয় স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, তার-বাবু প্রভৃতি কয়েকজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ডাকবাংলোয় আসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কয়েক মিনিট কথাবার্তা কহিবার পর স্বামীজী আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় কার্গিল হইতে যাত্রা করিলেন।

অদ্য আমাদিগকে যাইতে হইবে মৌলবা চম্‌বা নামক গ্রামে। ঐ স্থান কার্গিল হইতে তেইশ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। এডওয়ার্ড ব্রীজটি পার হইয়া ১২,০০০ ফিট উচ্চ ও দুই মাইল দীর্ঘ অধিত্যকার উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। পূর্বে যখন ব্রীজটি নির্মিত হয় নাই তখন কার্গিল নদীর তীর ধরিয়া গমন করিতে হইত। এখনও সেই পুরাতন পথের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। অধিত্যকাটির উপর একটিও বৃক্ষ বা ঝরণা নাই। সঙ্গে পানীয় জল লইয়া যাইতে হয়। ইহার পূর্ব পার্শ্বে রুঝ্‌লা নামক একটি পর্বতের গা দিয়া নালা নির্মাণ করিয়া পূর্বে বহু দূর হইতে জল আনা হইত। এখন তাহা পুরাতন হওয়ায় অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহাদের পর্বতারোহণ করার অভ্যাস নাই তাঁহারা এই উচ্চভূমি দিয়া যাইবার সময় বমন করেন ও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন। ইহাকে শৈলপীড়া বলে। ১৬।১৭ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে সকলেরই এইরূপ অবস্থা হয়। সামান্য হাঁপাইয়া পড়িলে সহজভাবে নিঃশ্বাস লইতে বহু বিলম্ব হয়। অনেকের ২।৩ পা চড়াই করিয়াই দুই-তিন মিনিট বিশ্রাম করিতে হয়। কারণ উচ্চ স্থানের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম থাকে এবং যতই উচ্চ স্থানে উঠা যায় ততই উহা কমিতে থাকে। ২২।২৩ হাজার ফিটের উপরে উঠিলে সঙ্গে অক্সিজেন ইন্‌হেলার

লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে অক্সিজেন থাকে। অধিত্যকাটির নিম্নে সুরী নদী প্রবাহিত ও পথ কিয়দ্দূর পর্যন্ত সুরী নদীর তীরে তীরে গিয়াছে। এই পথে কিছুদূর যাইয়া আমরা কতকগুলি ছোট ছোট ঝরণা দেখিতে পাইলাম। ঝরণাগুলির জল অল্প শ্বেতাভ এবং চারিদিকের মাটিতে শ্বেতবর্ণের নানাবিধ পদার্থসকল লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল ঝরণার জল পান করিতে পথপ্রদর্শক আমাদিগকে নিষেধ করিল। কারণ এইগুলির জল অত্যন্ত ক্ষার-মিশ্রিত (এল্‌কেলিন)। কোন কোনটির জল এইরূপ তীব্র ক্ষাররসযুক্ত যে, তাহাতে স্নান করিলে সমস্ত শরীরে সোডার মতো পদার্থসকল লাগিয়া যায়।

এই পথে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রতাপে যখন চারিদিকের পাহাড়গুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখন ভ্রমণকারীগণ অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। পথে কোথাও একটি বৃক্ষ নাই যে, তাহার ছায়ায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারা যায়। এইজন্য সেই সময় ভ্রমণকারীগণ অতি প্রত্যুষে ও সূর্যাস্তের পর এই পথে গমনাগমন করিয়া থাকেন। অদ্যকার এই পথটিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। সেইজন্য ভ্রমণকারীগণ অতি প্রত্যুষে কার্গিল হইতে বাহির না হইলে সন্ধ্যার সময় মৌলবায় পৌঁছিতে পারেন না। মালপত্র সঙ্গে লইয়া ঘণ্টায় দুই মাইল পথের অধিক গমন করা সম্ভব হয় না। তেইশ মাইল পথ অতিক্রম করিতে (পথে বিশ্রামাদি লইয়া) বারো ঘণ্টা সময় লাগে। অর্থাৎ প্রাতে সাতটার সময় বাহির হইলে সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছানো যায়। শেষ রাত্রে জিনিসপত্র বাঁধিয়া ও রন্ধনাদি করিয়া না রাখিলে খুব ভোরে বাহির হওয়া সম্ভব হয় না।

চলিতে চলিতে আমরা একটি বৃহৎ গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম। পথটি গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। গ্রামের বাড়ীগুলি পাথর ও মাটি দিয়া প্রস্তুত। বাড়ীর ছাদগুলিতে মাটি লেপা। প্রায় সকল বাড়ীই দ্বিতল। পশুদিগের থাকিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি ছোট চালা আছে। শীতকালে জ্বালাইবার জন্য সকল বাড়ীর ছাদের উপর কানারির খড় ও শুষ্ক ডালপালা সংগৃহীত আছে। প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে প্রাচীর দেওয়া ও ভিতরে একটি আঙ্গিনা আছে। বাড়ীগুলিতে জানালা নাই বলিলেই হয়। পথে কে যাইতেছে বা বাহিরে কি হইতেছে দেখিবার জন্য মাত্র আধ হাত লম্বা ও চওড়া কুলুঙ্গির মতো গর্ত আছে। প্রত্যেক বাড়ীতে দুই-একটি হৃষ্টপুষ্ট কালো ও লোমশ কুকুর আছে। কুকুরগুলি দেখিতে নেকড়ে বাঘের মতো কিন্তু খুব শান্ত। গ্রামে এক স্থানে বালকগণ হকি ও অন্যান্য স্থানে ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েকজন লামা পোলো খেলিতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম ইহারা বিলাতি খেলা কিরূপে নকল করিতে শিখিল। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামীজী বলিলেন ঃ "হকি ও পোলো খেলা অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। রাজপুত রাজাদের ও মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসে আমরা

এইসব খেলার অস্তিত্ব দেখতে পাই। প্রাচীনকালে হকির নাম হুড়কি ছিল, ভারত থেকে এই দুটি খেলা বিলেতে গেছে।"

গ্রামবাসীরা আমাদিগকে আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিতে লাগিল। একটি ১২।১৩ বৎসরের বালিকা কোলে একটি দুই-তিন বৎসরের শিশুকে লইয়া আমাদিগকে দেখিতেছিল। আমরা তাহাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেটি তোমার কে হয় ? বালিকা হিন্দী কথা বুঝিতে না পারিয়া নীরব রহিল। তাহার নিকট একটি লামা দাঁড়াইয়াছিল, সে উত্তরে বলিল ঃ "উহার স্বামী।"

এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গণিয়াকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করাতে গণিয়া বুঝাইয়া দিল বালকটি তাহার স্বামীর সর্বকনিষ্ঠ ভাই, অতএব বালিকার স্বামী। কারণ সাধারণতঃ তিব্বতীয়দের বড় ভাই-এর স্ত্রী সকল ভাইয়েরই স্ত্রী হইয়া থাকে। এই প্রকারে ইহাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অনেকগুলি স্বামী থাকে। তিব্বতে দেবর বা ভাসুর প্রভৃতি সম্বন্ধ নাই। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হয়। স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয় এই প্রকার বহুপতিক সামাজিক প্রথা প্রচলিত। পূজনীয় স্বামীজী বলিলেন ঃ "তিব্বতে সকল স্ত্রীলোকই দ্রৌপদীর ন্যায়। মহাভারতের সময় গান্ধার (কান্দাহার) দেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।"

তিব্বতী স্ত্রীলোকেরা কেহই পর্দানসীন নহে। ভুটিয়া, খাসিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় সকলেই কঠিন পরিশ্রমী ও পুরুষদের সহিত একযোগে সকল প্রকার কর্মই করিয়া থাকে।

গ্রামে একটি শস্যক্ষেত্রে ঠিক শালগমের মতো গোল ও লাল রংয়ের একপ্রকার ফসল হইয়াছে দেখিয়া আমরা কৌতূহলবশে গণিয়াকে ঐ ফসলের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। গণিয়া যখন বলিল যে, উহা মূলা তখন আমরা বিস্মিত হইয়া উহা কিরূপ মূলা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব না হইয়া থাকিতে পারিলাম না এবং সেইজন্য গণিয়াকে উহা কিছু কিনিতে বলিলাম। খাইয়া দেখিলাম ঠিক মূল্যর মতোই গন্ধবিশিষ্ট ও খুব ঝাল, এই প্রদেশের লোকেরা উহা শুষ্ক করিয়া শীতকালের জন্য রাখিয়া দেয়। কারণ সুদীর্ঘ শীতকালে চতুর্দিক ৪।৫ হাত বরফে ঢাকিয়া যায় ও কোথাও সামান্য মাটি বা ঘাস দেখা যায় না। কোনকিছুই পাওয়া যায় না এবং কোথাও যাইবার-আসিবারও পথ থাকে না। সুদীর্ঘ শীতকালটি তিব্বতীয়দের বিশ্রামের সময়। সেই সময়ে নিজেদের খাওয়া ও গৃহপালিত পশুদের খাওয়ানো ছাড়া তাহাদের আর কোন কাজ থাকে না।

কার্গিল হইতে আঠারো মাইল আসিয়া আমরা প্রথম লামাদিগের গুম্ফা ও ছর্তেন দেখিতে পাইলাম। গুম্ফা অর্থাৎ লামাদের মঠ ও ছর্তেন অর্থে বৌদ্ধস্তূপ বুঝায়। এই গুম্ফা একটি উচ্চ পর্বতগাত্রে নির্মিত ও ছর্তেনটি তাহার পার্শ্বে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাহাড়ের মাথার উপর অবস্থিত। দূর হইতে গুম্ফার সুন্দর

প্রবেশদ্বারটি পর্বতগাত্রে খোদিত চিত্রের মতো মনে লইতে লাগিল। ছর্তেনটি দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের শিবমন্দিরের ন্যায়। এইস্থান হইতে তিব্বতের সর্বত্রই ছোট-বড় অসংখ্য গুম্ফা ও ছর্তেন দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং আমাদের গন্তব্যস্থান এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে বলিয়া সময়াভাবে আমরা গুম্ফার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। গণিয়া বলিল, ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল গুম্ফা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

এইস্থান হইতে আরও পাঁচ মাইল পথ যাইয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অনেক পর আমরা মৌলবা চম্বা নামক ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। ডাকবাংলোটি গ্রামের অনেক নীচে একটি পার্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত। মৌলবা চম্বা গ্রামটি বিস্তৃত পার্বত্য উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। গ্রামটির প্রায় এক মাইল লম্বা এবং প্রায় পঞ্চাশ ঘর পাহাড়ীর বাস। এইস্থানে একটি সরাই ও একটি ক্ষুদ্র দোকান আছে। সেখানে দুই-চারটি দরকারী জিনিস কিনিতে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে একটি গ্রাম্য দেবতার স্থান আছে। তথায় প্রায় দেড়তলা উচ্চ এক অতিকায় দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি একটি বৃহৎ প্রস্তরে খোদিত আছে। মূর্তিটিকে ইহারা চম্বা কহে। ইহা হইতেই গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। মূর্তিটির এক হস্তে জপমালা, অন্য হস্তে কমণ্ডলু এবং তৃতীয় হস্তে একটি পদ্ম আছে, চতুর্থ হস্তে কিছুই নাই। পরিধানে বস্ত্র ও গলায় উপবীত। মস্তকে ক্ষুদ্র মুকুট ও দুই পায়ে নূপুর আছে। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ছিলেন বলিয়া লামারা বিষ্ণুকেও পূজা করিয়া থাকেন। মূর্তির আশেপাশে কতকগুলি সাদা, নীল, লাল প্রভৃতি বর্ণের নিশান আছে। নিশানগুলিতে "হুলু হুলু রুলু রুলু হুম ফট্" মন্ত্রটি ছাপানো আছে। প্রত্যেক লামার বাড়ীতে ও মঠে ছাপিবার সরঞ্জাম আছে। লামাদের ঘরবাড়ীগুলি অপরিষ্কার হইলেও সকলেই বেশ সঙ্গতিপন্ন ও ধার্মিক।

ডাকবাংলোয় রাত্রে বাস করিয়া প্রভাতে আমরা পুনরায় যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কার্গিল হইতে আনীত ঘোড়াগুলি ত্যাগ করিয়া ইহার পরের পড়াও বৌধ্‌খর্বু গ্রামে যাইবার জন্য আমরা নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। আজকের পড়াওটির জন্য ঘোড়ার ভাড়া দশ আনা মাত্র। গণিয়া ঘোড়াগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইতে লাগিল। কারণ ঘোড়াওয়ালারা অনেক সময় খোঁড়া, বৃদ্ধ বা বদ্‌রাগী ঘোড়া দিয়া দেয়। তাহাতে পথে নানাবিধ অসুবিধায় পড়িতে হয়।

ঘোড়াওয়ালা, ডাকবাংলোর চৌকিদার প্রভৃতিকে তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া স্বামীজী বেলা সাড়ে আটটার সময় মৌলবা চম্বা হইতে পুনরায় রওনা হইলেন। এই স্থান হইতে বৌধ্‌খর্বু ষোলো মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। পথে অধিকাংশ স্থলই মরুভূমির মতো শুষ্ক ও বৃক্ষলতাহীন। চারিধারের পাহাড়গুলির মাথা বরফে ঢাকা থাকার দরুন এই পথে অত্যন্ত শীতবোধ হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে বৃহদাকার প্রস্তরসকল ও কালো, নীল, ধূসর প্রভৃতি নানা বর্ণের পাহাড় এই পথের

দৃশ্য। মৌলবা চম্বা হইতে দশ মাইল আসিয়া নামিখা-লা নামক একটি তেরো হাজার ফিট উচ্চ পর্বতের উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। পর্বতটির সর্বোচ্চ স্থান হইতে চারিদিকের অসংখ্য পর্বতরাজির দৃশ্য অতি মনোহর। এই অতি উচ্চ স্থানে গ্রীষ্মকালে দ্বিপ্রহরেও অত্যন্ত শীতবোধ হয়। প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসের আঘাতে নাকের অগ্রভাগ, ঠোঁট ও গাল অত্যন্ত ফাটিয়া যায়। বাংলা দেশে শীতকালে যেরূপ সামান্য ঠোঁট ফাটে আর তাহাতে অল্প গ্লিসারিন লাগাইলেই সারিয়া যায়। এখানকার ঠোঁট ফোটা সেইরূপ নহে। ইহাতে ঠোঁট-দুইটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায় ও নিগ্রোদের ঠোঁটের মতো ফুলিয়া উঠে। কথা বলিলে বা হাসিতে যাইলে এমন যন্ত্রণা হয় যেন প্রাণ বাহির হইতেছে। কখনও কখনও ঠোঁট ফাটিয়া গিয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে। গরম জল লাগাইলে আপাততঃ অল্প কমিলেও পরে ফাটা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। প্রত্যহ সর্বদা ভেসিলিন লাগাইলে যন্ত্রণা অনেক কম থাকে। সেইজন্য এই পথের ভ্রমণকারীগণের সহিত ভেসিলিন থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই পথে কিছুদূর যাইয়া আমরা উপত্যকার মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই-তিনটি ছোট ছোট গ্রাম দেখিলাম। এই সকল গ্রামে কোনওপ্রকার ফলের গাছ নাই। পথে অনেক ইয়াকান্দি ও দার্দ জাতীয় লোকের সহিত দেখা হইল। দ্রাস-অঞ্চলের মুসলমানগণকে দার্দ বলে। ইহাদের নিকট হইতে আমরা কিছু খোবানি কিনিলাম। ইহাদের মাথার মধ্যস্থলটি কামানো ও তাহার চারিদিকে লম্বা চুল ঝুলিতেছে। কামানো স্থানটির উপর ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুপি পরিয়া থাকে।

বৌধ্‌খর্বু গ্রামে প্রবেশ করিতেই পর্বতগাত্রে অসংখ্য গৃহ, দুর্গ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এইগুলি এই প্রদেশের রাজা দিলদানের সময় তাঁহার প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল এবং এইস্থানেই তাঁহার রাজধানী ছিল। দুর্গের চারিদিকে পরিখা কাটা ছিল। এখনও এই পরিখায় জল রহিয়াছে। তিনি ১৬২০ হইতে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইস্থানে রাজত্ব করেন এবং পরে মুসমলানদের হস্তে পরাজিত হন। মুসলমানগণ তাঁহার রাজধানী চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়।[১]

এইস্থানে কতকগুলি ছোট-বড় ছর্তেন দেখিতে পাইলাম। এইগুলিতে মৃত ব্যক্তির দেহভস্ম কৌটায় ভরিয়া রাখা হয় ও মৃত ব্যক্তির নামে একখানি পাথরে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্র লিখিয়া ইহার উপর রাখা হয়। ছর্তেনগুলির নিকট প্রায় চল্লিশ হাত লম্বা, তিন হাত চওড়া ও চার হাত উচ্চ 'মণি দেওয়াল' রহিয়াছে। এইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে ও ইহাতে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্র লিখিত আছে। কোনটিতে একবার, কোনটিতে দুইবার ও কোন কোনটিতে বহুবার ঐ মন্ত্র লিখিত থাকে। প্রস্তরখণ্ডগুলি ছয় ইঞ্চি হইতে তিন ফিট পর্যন্ত লম্বা। স্বামীজী একখানি উত্তম প্রস্তরখণ্ড বাছিয়া লইলেন বাংলা দেশে লইয়া যাইবার জন্য।

১। বৌধ্‌খর্বুর উত্তরদিকে একটা উপত্যকায় চিগ্‌তান নামক প্রাচীন দুর্গ আছে ও সেখানে বসিয়া চিগ্‌তানের সুলতান পুরীগপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

পূর্বকালে লাদাকের লামা রাজারা প্রত্যেক গ্রামে এইপ্রকার মণি দেওয়াল ও ছর্তেন নির্মাণ করিয়া দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতেন। মণি দেওয়ালগুলিকে পূর্বপুরুষগণের সমাধি-মন্দির ও ছর্তেনগুলিকে পরমেশ্বরের স্থান বলিয়া লামারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। এমনকি কোন লামা এইগুলির দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করেন না, সকলেই বামদিক দিয়া গমন করেন। ইহা দেখিয়া কলিকাতার রাস্তার 'কিপ্ টু দি লেফ্ট' সাইনবোর্ডের কথা মনে পড়িল। পুলিশ মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে, আর সকলেই তাহার বামদিক দিয়া গমন করিতেছে। অবশ্যই ইহা ভয়ে, আর উহা ভক্তিতে, এই যা প্রভেদ।

কোন কোন বিশেষ দিনে প্রাতঃকালে গ্রামবাসীরা সকলে আসিয়া এইস্থানে সমবেত হন এবং ছর্তেনগুলিকে পূজা করেন ও পূর্বপুরুষগণকে খাদ্যাদি নিবেদন করেন। পরে সকলে মিলিয়া এইগুলিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সমস্বরে 'লামলা কেপ্ শুনছে, কে কে লামা ইদম্' ইত্যাদি স্তবটি আবৃত্তি করিতে থাকেন। এই স্তবটি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি'—ইত্যাদির ন্যায়। এই সময় একজন সন্ন্যাসী ইঁহাদের পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন।

আমরা বেলা আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময় বৌধ্খর্বু ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। এইস্থানে লামাদের একটি ত্রিরত্ন বা পরমেশরা রহিয়াছে। আমাদের দেশের ইঁট দিয়া গাঁথা তুলসীমঞ্চের মতো ইঁহারা তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রথমটিতে কালো, দ্বিতীয়টিতে হলদে ও তৃতীয়টিতে সাদা রঙ লাগাইয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক নির্মাণ করিয়া তাহাদের পূজা ও আরতি করেন। ইঁহারা এইগুলিকে পরমেশরা বলেন। 'পরমেশরা' শব্দ 'পরমেশ্বর' শব্দের অপভ্রংশ। এইগুলিতে চোখ আঁকিয়া দিলে প্রথম কালটিকে হস্তপদহীন জগন্নাথ, দ্বিতীয় হলদেটিকে সুভদ্রা ও তৃতীয় সাদাটিকে বলরাম মনে হয়। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামীজী বলিলেন : "পুরীর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীকমাত্র হইলেও কালক্রমে উহার অর্থ অন্যপ্রকার হইয়া পড়িয়াছে।"

এই গ্রামে প্রায় চল্লিশ ঘর লাদাকীর বাস। যে গ্রামে এতগুলি লোকের বাস এ প্রদেশের পক্ষে সে গ্রামখানি বেশ বড়। গ্রামটি পাহাড়ের নীচে একটি উপত্যকার মধ্যে প্রায় এক মাইল চওড়া সমতলভূমির উপর। এইস্থানে কোন দোকান, বাজার বা ডাকঘর নাই। গ্রামে নম্বরদার ও ঠিকাদারের নিকট ঘোড়া, কাঠ, আটা, মাখন ও দুধ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামে একজন ঠিকাদার বা মণ্ডল থাকে। কতকগুলি ঠিকাদারের উপর একজন নম্বরদার ও কয়েকজন নম্বরদারের উপর একজন জেলাদার (দারোগা) থাকেন। এইপ্রকার কয়েকজন জেলাদারের উপর একজন নায়েব-তহশীলদার, কয়েকজন নায়েব-তহশীলদারের উপর একজন তহশীলদার (কালেক্টর) ও কয়েকজন তহশীলদারের উপর একজন উজির বা প্রধান শাসনকর্তা থাকেন। এই প্রকারে এই প্রদেশের শাসনকার্য সম্পন্ন হয়।

লাদাকীরা চমরী গাইয়ের শিঙ্ হইতে প্রস্তুত একপ্রকার হুঁকাতে তামাকু সেবন করেন। ইঁহাদের তামাকু শুষ্ক দোক্তাপাতার গুঁড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইঁহারা এই সকল হুঁকা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লন। কোন দোকানে বা বাজারে ইহা কিনিতে পাওয়া যায় না। স্থানীয় নারীরা তীরে বসিয়া কাঠের হাতার দ্বারা জল তুলিয়া মাটির কলসী পূর্ণ করেন, তাহা দেখিতে বড়ই কৌতূহলজনক।

ছাপরা জেলার একজন মুসলমান ফকির আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য ডাকবাংলোয় আসিলেন। তিনি তিব্বত হইতে ফিরিয়া গতকল্য হইতে এইস্থানের চটিতে বাস করিতেছেন। তিনি অর্থাভাবের জন্য কষ্ট পাইতেছেন জানিয়া পূজনীয় স্বামীজী তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। লোকটি প্রস্থান করিলে পর স্বামীজী বলিলেন : "ছেলেটিকে দেখিয়া সন্দেহ হইল, বোধহয় কোন পলাতক আসামী সাধুর ছদ্মবেশে লুকাইয়া বেড়াইতেছে, নচেৎ এই কঠিন পার্বত্য পথে কপর্দকশূন্যভাবে কি করিতে আসিবে?"

প্রভাতে স্বামীজী পুনরায় যাত্রা করিলেন। অদ্য আমাদিগের গন্তব্যস্থান লামাউরু নামক গ্রাম। ঐ গ্রাম এইস্থান হইতে পনেরো মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। ডাকবাংলোর অল্প দূরে থাকিতেই তুষারবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পেঁজা তুলার মতো তুষারসকল বায়ুভরে উড়িতে উড়িতে আসিয়া পরিচ্ছদ, অশ্বদেহ, পথ ও পাহাড় প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে ঢাকিয়া দিল। চারিদিকে এক অপূর্ব শ্বেত দৃশ্য বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার উপর স্নিগ্ধ সূর্যকিরণ পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রকৃতিরাণী শ্বেতবস্ত্রে আবৃতা হইয়া রৌদ্র পোহাইতেছেন। এই মনোহর দৃশ্য আর কখনও জীবনে দেখিতে পাই কিনা ভাবিয়া আমরা প্রাণ ভরিয়া তুষারপাত উপভোগ করিয়া লইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বর্ষণ বন্ধ হইল। আমরা জামা-কাপড় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। কাপড় কিছুই ভিজে নাই।

বৌধ্খর্বু হইতে দশ মাইল আসিয়া আমরা ফতুলা নামক একটি ১৩,৪০০ ফিট উচ্চ গিরিবর্ত্মের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইবার গিরিবর্ত্মটি আরোহণ করিতে হইবে। আমরা নীচেই মধ্যাহ্নভোজনাদি সমাপ্ত করিয়া লইলাম। কারণ পর্বতের উপর পানীয় জলের একান্ত অভাব।

গিরিবর্ত্মের উপর সর্বদা প্রবল শীতল বাতাস প্রবাহিত থাকায় এইস্থান এতই ঠাণ্ডা যে, সর্বাঙ্গে উত্তমরূপে গরম কাপড় আবৃত থাকিলেও শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম। যদি এইরূপ প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস না চলিত তাহা হইলে এত শীত বোধ হইত না। কারণ, যখনই বাতাস অল্প কমিতেছিল, তখনই শীত কম বোধ হইতেছিল। দিবসে সর্বদাই এইস্থানে সূর্য মেঘাবৃত থাকে ও সূর্যকে যেন নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয়। ছোট-বড় প্রায় সকল পর্বতের উপরই বায়ু অল্পাধিক প্রবাহিত থাকে। এই বায়ু থাকাতেই এই সমস্ত কষ্টকর পথে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় না। পুনঃপুনঃ পর্বতের পর পর্বত আরোহণ ও অবতরণের যে কষ্ট তাহা এই উন্মুক্ত বায়ুতে কিয়ৎক্ষণ

থাকিলেই সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় ও প্রাণ নূতন শক্তিতে পূর্ণ হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে যে স্থানে যে জিনিসটির প্রয়োজন তাহার অভাব নাই। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল বুঝি সূর্যের যত নিকটে যাওয়া যায় ততই গরম বেশী বোধ হইতে থাকে। কিন্তু এই অতি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের সে ধারণা নষ্ট হইয়া গেল।

গিরিসঙ্কটের বিপরীত দিকে পাঁচ মাইলে দুই হাজার ফিট ক্রমশঃ অবতরণ করিতে করিতে আমরা লামাউরু গ্রামখানি দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! যেন অপ্সরানগরী! চারিদিকে পাহাড় ও মধ্যস্থলে একটি পার্বত্য-নদীর তীরে গ্রামবাসীদের কতকগুলি গৃহ। কোন গৃহ পর্বতের পাদদেশে, কোনটি বা পর্বতের চূড়ায় আবার কোনটি বা পর্বতের মধ্যস্থলে। যেন ইহাই সমগ্র জগৎ, ইহার পর আর জগৎ নাই। এই বরফের ভিতর, পর্বতের আশেপাশে ইহারা সুখে বাস করিতেছে। গ্রামের সর্বাপেক্ষা সুন্দর গুম্ফার উচ্চ চূড়াটি যেন পর্বতরাজের মতো উন্নত মস্তকে আপন বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমরা গ্রামের ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছিলাম। বৈকালিক চা-পান সমাপ্ত করিতে গ্রামের মঠ হইতে একজন লামা আসিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের গুম্ফা দেখিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গণিয়াকে প্রয়োজনীয় কার্যাদি করিতে বলিয়া আমরা লামার সহিত চলিলাম। মন্দিরটি প্রায় ১২,০০০ ফিট উচ্চ পর্বতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় তিরিশ ফিট ও দৈর্ঘ্য উহা অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহা পাথর, মাটি, কাচ ও ইঁট দিয়া প্রস্তুত। ইহার ছাদ আমাদের দেশের ছাদের মতো সমতল ও চতুষ্কোণ। প্রথমে কড়ির উপর তক্তা বিছাইয়া তদুপরি শুষ্ক ঘাস ও যবের খড় রাখিয়া তাহার উপর মাটি দিয়া ইহা প্রস্তুত। ছাদে পাঁচ-ছয়টি কালো কাপড় দিয়া মোড়া ঝাণ্ডা (নিশান) ও ত্রিশূল আছে। ত্রিশূলগুলিতে ভেড়ার শিঙ ও চামর বাঁধা। ইহা ছাড়া দুইটি অতিকায় 'মণি-চক্র' আছে। তাহা বাতাসের বেগে ঘুরিতে থাকে। মন্দিরের দরজা কাঠের নির্মিত, জানলা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য ভিতরে অত্যন্ত অন্ধকার। এমনকি দিনের বেলায়ও আলো জ্বালিতে হয়। ভিতরে একপার্শ্বে কাঠের তাকে প্রায় ৪০০ খানি তিব্বতী ভাষায় লিখিত পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি রেশমের কাপড়ে মোড়া। অন্য পার্শ্বে অতীশ দীপঙ্কর, পদ্মসম্ভব, কুশাক প্রভৃতি লামা গুরুগণের মূর্তি ও সাকাথুব্পা, থুক্জে ছিন্পো[২] (অবলোকিতেশ্বর), তারা প্রভৃতি কতকগুলি

২। থুক্জে ছিন্পো অর্থাৎ পরম করুণাময়। এই দেবতা একাদশ মস্তক ও সহস্র হস্তবিশিষ্ট; প্রত্যেক হস্তে একটি চক্ষু আছে। মস্তকগুলি থাকে থাকে সজ্জিত। প্রথম থাকে তিনটি, দ্বিতীয় থাকে তিনটি, তৃতীয় থাকে তিনটি, চতুর্থ থাকে একটি ও সর্বোপরি একটি অমিতাভ বুদ্ধদেবের মস্তক অবস্থিত। ইঁহার পূজায় স্নান করা, কাপড় ছাড়া প্রভৃতি কোনপ্রকার শুচি-অশুচির বিচার নাই। পূজায় সন্তুষ্ট হইলে ইনি সাধককে আঠারো প্রকার সিদ্ধাই প্রদান করেন।

সাকা থুব্পা—ভূস্পর্শ-মুদ্রাহস্ত পদ্মাসীন বুদ্ধ। শাক্যমুনি—প্রচারক বুদ্ধ দাঁড়ানো।

দেবীমূর্তি, সাকা থুব্পা (শাক্য স্থবীর), শাকা মুনি (শাক্য মুনি), চেঁরে-জি) (বিশালক্ষ) প্রভৃতি কতকগুলি দেবমূর্তি এবং ছোট-বড় ২।৩টি মণি প্রতিষ্ঠিত আছে। পার্শ্বে অপর একটি গৃহে প্রায় দেড়তলা সমান উচ্চ অবলোকিতেশ্বর, বজ্রতারা ও বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি রক্ষিত আছে। মূর্তিগুলি কাঠের উপর সোনা ও রূপার পাত দিয়া মোড়া ও কোন কোনটি নিরেট পিতলের নির্মিত। মণিগুলি দুই-তিন হস্ত উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের ন্যায়। অনেকটা আমাদের দেশের মুসলমানগণের তাজিয়ার ন্যায় দেখিতে। এইগুলিও কাচের উপর সোনার ও রূপার পাত মুড়িয়া প্রস্তুত এবং বহু প্রকার মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক মূর্তির সম্মুখে তেরোটি ছোট ছোট পিতলের বাটিতে পানীয় জল রাখা আছে। মূর্তিগুলি টেবিলের উপর ও বাটিগুলি উহার সম্মুখস্থ বেঞ্চের উপর রক্ষিত আছে। মন্দিরের ভিতর নরক, স্বর্গ, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেবের দশ অবস্থা ও ছয় প্রকার গতি, যমরাজ ও লামাগুরু প্রভৃতি বিবিধবিষয়ক হস্তাঙ্কিত চিত্রসকল সজ্জিত আছে ও মূর্তিগুলির সম্মুখে নানাবিধ ঝালর ও পিছনে সুন্দর রেশমের পর্দা টাঙানো আছে। ঘরে ভিতরের মোটা কাঠের থামগুলিতে লাল, নীল প্রভৃতি রং করা ও ছাদের কড়িগুলিতে নানাবিধ কারুকার্য করা রহিয়াছে। মূর্তিগুলির মাথার উপর দুই-তিনটি ছোট ছোট চাঁদোয়া খাটানো রহিয়াছে। মেঝেতে দুই-তিনটি তক্তাপোষ পাতা, উহার উপর কম্বল বিছানো আছে। ইহার উপরে বসিয়া লামারা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পূজাদি করিয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় লামারা পুঁথি রাখিবার জন্য মুসলমানদের ন্যায় একপ্রকার বই-দান ব্যবহার করেন। রাত্রে আরতির পর বড় লামা শাস্ত্র পাঠ করেন ও অন্যান্য সকল লামা বসিয়া তাহা শ্রবণ করেন। ইঁহাদের ধর্মশাস্ত্র দুই প্রকার—কানজুর ও তানজুর। কানজুর অর্থ অনুবাদিত ত্রিপিটক গ্রন্থ ও তানজুর তাহার ভাষ্য। কানজুরে ১০৮টি পরিচ্ছেদ ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ১০০০ খানি পৃষ্ঠা আছে। তানজুর ২২৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ এক-একখানি স্বতন্ত্র পুঁথির ন্যায়। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি ইঞ্চি। উচ্চতা ও বিস্তার প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। ইহার মলাট কাঠের ও তাহার উপর নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত আছে। তাসিলাংপোর নিকট নারথাঙ্ নগরে ইহা ছাপা হয়। যে সকল কাঠের ছাঁচে ইহা মুদ্রিত হয় তাহা রাখিতে বড় বড় দুইখানি বাড়ীর প্রয়োজন।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত, বেলা নয় ঘটিকা, দ্বিপ্রহর, বৈকাল তিন ঘটিকা ও সন্ধ্যায় মন্দিরে পূজা হইয়া থাকে। পূজার পূর্বে শিঙাধ্বনি করা হয়, তাহাতে লামারা সকলে আসিয়া মন্দিরে একত্রিত হন এবং নিজ নিজ আসন পাতিয়া নীরবে মূর্তির দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট হন এবং "ওঁ অর্ঘং চার্ঘং বিমনসে উৎসুম্ম মহাক্রোধ হুং ফট্" মন্ত্রের মনের পাপ ও কলুষাদির কথা চিন্তা করেন। পরে দ্বিতীয়বার শিঙাধ্বনি হইলে সকলে

সমস্বরে আরাত্রিক মন্ত্র গান করিতে থাকেন ও করতাল, দামামা, দোর-জে[৩] শিঙা এবং ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য করেন। আরতির সময় ইঁহারা মাখনের প্রদীপ জ্বালিয়া দেব-দেবীর সম্মুখে নাড়েন। প্রায় আধ মণ পুরাতন মাখন ঘরের এক কোণে একটি বড় পিতলের পাত্রে রক্ষিত আছে। পাত্রটিতে নানাপ্রকার কারুকার্য করা ও তাহাতে দুইটি বড় বড় আংটা লাগানো আছে। উহা একটি কাঠের তেপায়ার উপর স্থাপিত রহিয়াছে।

তিব্বতের রাজা স্রসান্ গ্রামপো (জন্ম ৬১৭ খ্রীঃ—মৃত্যু ৬৯৮ খ্রীঃ) তাঁহার নেপাল ও চীন দেশীয়া ভ্রুকুটি দেবী এবং চেঙ্ বেঙ্ নামক দুই মহিষীর অনুরোধে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রধানমন্ত্রী থুমি সাম্ ভোতাকে যোলোজন অনুচরসহ ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বহু সংস্কৃত ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিয়া তিব্বতে লইয়া যান। তাঁহার পূর্বে তিব্বতে কোন বর্ণমালা ছিল না ; তিনি উত্তর ভারতে লিপি দত্তের এবং পণ্ডিত সিংহ ঘোষের নিকট সংস্কৃত অক্ষরের অনুরূপ একপ্রকার মিশ্রিত বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া তাহা সকলকে শিক্ষা দেন। কালক্রমে ইহাই বর্তমান লামা বর্ণমালারূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে 'বুচন' বর্ণমালাও বলে।

পরে ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতরাজ থি স্রোঙ্ দেৎসন্ দ্বারা আহূত হইয়া পদ্মসম্ভব বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে তিব্বতে গমন করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পত্নী মন্দারবা ও তাঁহার শ্বশুর শান্তি রক্ষিতও তিব্বতে গমন করেন। তাঁহার নিবাস উদ্যান নামক কোন স্থানে ছিল। তিনি নালন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে গুরু রিম বোছে বলেন। তিনি তিব্বতে বহুকাল বাস করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করিয়া তিব্বতেই দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পঁচিশজন সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগবলে বিশেষ বলীয়ান ছিলেন।

ইহার পরে রাজা রল পছনের রাজত্বকালে (৮৪৫ খ্রীঃ—৮৬০ খ্রীঃ) রত্ন রক্ষিত, ধর্ম রক্ষিত, জয় রক্ষিত, জিন সেন, রতেন্দ্র শীল, মঞ্জুশ্রী বর্মা, সুরেন্দ্র বোধি, বোধি মিত্র ও দানশীল প্রভৃতি বহু পণ্ডিত কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গমন করেন। তাঁহারা সকলেই মহাযান মত প্রচার করিতেন।

৩। 'দোর-জে' একপ্রকার কাঁসর-নির্মিত ঝুমঝুমির ন্যায় যন্ত্র। লামারা ইহাকে ইন্দ্রের বজ্র বলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, আসল দোর-জে সত্য সত্যই ইন্দ্রের নিকট হইতে লাসার নিকট একটি পাহাড়ে পড়িয়াছিল। পূজার সময় লামারা ইহা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া নাড়িতে থাকেন। তাঁহারা বলেন, এই প্রকার করিলে প্রেতাত্মাসকল ভয়ে পলাইয়া যায়।

১০৪১ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিব্বতে তন্ত্র-ধর্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দীপঙ্কর ভারতের নানাস্থানে ও সিংহলে বৌদ্ধ ও তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি বিক্রমশিলার মহাবিহারে মোহন্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতে ধর্মপ্রচার করিতে গমন করেন। তিব্বতীয়রা তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তিনি ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরে সক্রেটং মঠে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিব্বতের গুম্ফাগুলিতে তাঁহার যেসকল মূর্তি রক্ষিত আছে তাহার মস্তক রক্তবর্ণ উষ্ণীষে পরিশোভিত।

মধ্য-এশিয়ার পাঠান-শাসনকর্তা কুলবাই খাঁ তিব্বতরাজ্য জয় করিয়া ১২৫৯ হইতে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সপরিবারে লামা-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতে যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয় সেজন্য ভারতবর্ষ হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন।

সেই সময় বারো হইতে তেরো শতাব্দীর মধ্যে বহু বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রচারক ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইয়া বাস করেন এবং নানাবিধ সংস্কৃত-ধর্মগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই প্রকারে ভারত হইতে বৌদ্ধ ও তন্ত্র মতসকল তিব্বতে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে উহা বর্তমান লামাধর্মরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্বে তিব্বতীয়েরা গ্রহ-নক্ষত্রের উপাসক ছিলেন ও ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস করিতেন।

তিব্বতীয় প্রত্যেক গৃহস্থকেই সন্ন্যাসী হইবার জন্য একটি পুত্রকে মঠে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাই তাহাদের সামাজিক প্রথা। পুত্রটি মঠে আসিয়া ব্রহ্মচর্য ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি শিক্ষা করিতে থাকে, পরে মঠের অধ্যক্ষের অনুমোদিত হইলে লামাদের প্রধান মঠে প্রেরিত হয়। সেখানে যাইয়া কয়েক বৎসর ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া সে পুনরায় পূর্ব মঠে প্রত্যাবর্তন করে এবং বারো বৎসর বারো দিন একটি নির্জন ঘরে একাকী বাস করিয়া ভগবদ্ আরাধনা ও যোগসাধন করিতে থাকে। সেই সময় কেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা কথা কহিতে পান না। দেওয়ালের একটি ক্ষুদ্র গর্তের ভিতর দিয়া আহার্য ও পানীয় প্রত্যহ তাহাকে প্রদান করা হয়। এই তপস্যায় কৃতকার্য হইলে তিনি 'কুশাক' বা 'জগৎগুরু' উপাধি লাভ করেন এবং একটি মঠের মোহন্ত পদে নিয়োজিত হন। তখন তাঁহার বহু শিষ্য হয়। এই পদের মর্যাদা অনুসারে তখন তাঁহার পরিধানে বহু মূল্যবান পোশাক ও তাঁহার মস্তকে সোনার টুপি দেওয়া হয়।

তিব্বতীয়দের বিশ্বাস 'কুশাক' লামাগণ অধ্যাত্মরাজ্যে বিশেষ অগ্রসর ও সিদ্ধপুরুষ হন। মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রতিমূর্তি মন্দিরে রাখিয়া প্রত্যহ পূজা করা

হয়। ইঁহারা বলেন কুশাকগণ চিরকাল অমর হইয়া থাকেন এবং শরীর ত্যাগের তারিখ ও সময় এক বৎসর পূর্বে নিজ শিষ্যগণকে বলিয়া যান এবং কখনও কখনও পুনরায় কোথায় কিভাবে জন্মগ্রহণ করিবেন তাহাও মৃত্যুর সময় বলিয়া দেন।

এই মন্দিরের নিকট একটি দ্বিতল গৃহে প্রায় একশত জন সন্ন্যাসী লামা বাস করেন। লামাগণের উপর নানাবিধ কার্যভার ন্যস্ত আছে। ইঁহাদের কেহ কেহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাইয়া নিকটস্থ গ্রামে যজমান বাড়ীগুলিতে দৈনিক পূজাদি করিয়া আসেন। কেহবা দেবোত্তর সম্পত্তিগুলি তত্ত্বাবধান করেন। কেহবা গ্রামে যাইয়া আপন প্রজাগণের নিকট হইতে খাজনা ও শস্যাদি লইয়া আসেন। কেহ কেহ মঠের পূজা-আরতি এবং কেহবা রন্ধনাদির ভারপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য লামাগণ কেহ 'মণিচক্র' ঘুরাইয়া, কেহ ছাপার ছাঁচ (ব্লক) কুঁদিয়া, কেহ কাঠের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া কিম্বা সুন্দর চিত্রসকল অঙ্কিত করিয়া দিবসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। কেহ মঠের সংলগ্ন বাগানে খোবানি প্রভৃতি গাছগুলিকে যত্ন করেন।

লামাগণ শেষরাত্রে উঠিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করেন, যথা : "হে পরম করুণাময় গুরুদেব! আমার কথা শ্রবণ করুন। হে দয়াময় গুরু, আমাকে শক্তি দিন যেন আমি ২৫৩টি নিয়ম ঠিক ঠিক পালন করিতে পারি, যেন আমি কুৎসিত গীতবাদ্যে বা নৃত্যে মোহিত না হই, যেন অসৎ চিন্তা বা জাগতিক ধন-দৌলতের কথা আমার মনে উদিত না হয়"।

"হে বুদ্ধগণ এবং দশদিকে অবস্থিত বৌদ্ধগণ, আমার বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমি একজন পবিত্রহৃদয় সন্ন্যাসী। জীবগণের মঙ্গলের জন্য আমার সকল শক্তি নিয়োগ করাই আমার ঐকান্তিক বাসনা। আমি আমার যাবতীয় ধন এবং শারীরিক শক্তি ধর্মলাভের জন্য নিয়োজিত করিয়া জগতের সকল প্রাণীর কল্যাণ করাকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছি", ইত্যাদি।

এইপ্রকার বলিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি তিনি সাতবার জপ করেন ও মণিচক্রটি ঘুরাইতে থাকেন :

"ওঁ সম্ভব সন্নহা যব হুম্"

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করিয়া তিনি নিজ পদদ্বয়ে থুথু প্রদান করেন :

"ওঁ খ্রেকর জ্ঞানায় হ্রীঁ প্রীঁ স্বাহা"

ইঁহাদের বিশ্বাস যে, এই মন্ত্রটি বলিয়া পদদ্বয়ে থুথু প্রদান করিলে, যে-সকল কীট পদচাপে বিনষ্ট হয় সেগুলি ইন্দ্রলোকে গমন করে।

পরে শিঙাধ্বনি শুনিলে সকলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র কামরা হইতে বাহির হইয়া প্রাতঃকালীন উপাসনার জন্য মঠে গমন করেন।

মঠ হইতে ফিরিয়া নব-উদিত সূর্যকে দেখিয়া লামাগণ নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বলিয়া সূর্যকে প্রণাম করেন :

"ওঁ মরিচিনম্ স্বাহা"

"হে দেবি, শত্রুভয়, দস্যুভয়, বন্যজন্তু-ভয়, সর্পভয় হইতে আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা করুন।"

লামারা দিবসে ও রাত্রে নয়বার আহার করেন; আহারের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটি বলিয়া বুদ্ধ, দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগকে নিবেদন করিয়া থাকেন :

"ওঁ গুরু বজ্র নৈবেদ্য অঃ হুং।
ওঁ সর্ব বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্র নৈবেদ্য অঃ হুং।
ওঁ দেব ডাকিনী শ্রীধম্মপাল সপরিবার বজ্র নৈবেদ্য অঃ হুং"।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ লিকির গুম্ফা ॥

লামাদের মন্দিরের একটি প্রথা আমাদের বড়ই নূতন মনে হইল। উহাদের ঠাকুরঘরের ভিতর নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা জুতা পায়ে দিয়া যথেচ্ছ বেড়াইতে লাগিলাম, ক্যামেরা লইয়া যত ইচ্ছা ফটো তুলিতে লাগিলাম, কেহ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। মন্দিরে পূজার জন্য কিছু অর্থ প্রদান করিলে পূজারী লামা আমাদিগকে কিছু আঙ্গুর-প্রসাদ প্রদান করিলেন।

পরে যে লামাটির সহিত আমরা মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম পুনরায় তাঁহার সহিত আমরা ডাকবাংলোয় নামিয়া আসিলাম। লামাটির নাম লামা তেঙ্‌জিন। তিনি একখানি ফটো তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া মালপত্র যথারীতি বাঁধিয়া রাখিয়া আমরা শুইবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় লামা তেঙ্‌জিন চক্ষু দুইটি জবাফুল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি এত অধিক ছাং পান করিয়াছেন যে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, টলিয়া টলিয়া পড়িতেছেন। একখানি চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া তিনি কি উদ্দেশ্যে এত রাত্রে আসিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি পেট-কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি ম্যাপের মতো গুটানো ছবি বাহির করিয়া তাহা আমাদিগকে কিনিতে অনুরোধ করিলেন ও তাহার দাম কুড়ি টাকা চাহিলেন। ছবিখানিতে বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। মুখের ভাব বড় স্বাভাবিক হইয়াছে। উহা কাপড়ের উপর নানাবিধ বর্ণে অঙ্কিত। ছবিখানি লম্বায় প্রায় দুই হাত ও চওড়ায় প্রায় একহাত এবং প্রাচীন, কিন্তু বেশ নূতনের ন্যায় রহিয়াছে। তিব্বতের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঐখানি লইবার ইচ্ছা হইলেও চোরাইমাল ভাবিয়া আমরা উহা লইলাম না। লামাজী লইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ও দাম কমাইতে লাগিলেন এবং শেষে দুঃখিত হইয়া উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় একথা কাহাকেও না বলিতে অনুরোধ করিলেন। পরে শুনিলাম য়ুরোপীয়গণ আসিয়া এই প্রকার ছবি, বাদ্যযন্ত্র, পুঁথি প্রভৃতি পাইবার জন্য লামাদিগকে লম্বা লম্বা ঘুষ দিয়া থাকেন।

প্রভাতে আমরা যথারীতি লামাউরু হইতে বাহির হইলাম। অদ্য আমাদিগকে যাইতে হইবে নুরুল্লা নামক পড়াও, ঐ স্থান আঠারো মাইল উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত। লামাউরু গ্রাম হইতে পথ বরাবর উৎরাই, প্রায় চার মাইলে দুই হাজার ফিট ক্রমাগত নামিতে হইল। উৎরাই পথে বেশ তাড়াতাড়ি চলা যায়, এই চার মাইল আসিতে মাত্র এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগিল। কিন্তু চড়াই হইলে ঘণ্টায় দুই মাইল অতি কষ্টে পার হওয়া যায়।

পথে একটি পার্বত্য নদীকে ছয়-সাত বার পারাপার করিতে করিতে একটি দুই ধারে উচ্চ পাহাড়বিশিষ্ট গলির মতো সংকীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়া আসিতে হইল। উপত্যকা ছাড়িয়া বাহির হইতে একেবারে সিন্ধুনদের বহুদূর বিস্তৃত উন্মুক্ত তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইস্থানে সিন্ধুনদ সমুদ্রতল হইতে ৯,৫০০ ফিট উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দুই-তিন স্থানে কাশ্মীর হইতে ইংরাজ ইঞ্জিনিয়াররা আসিয়া সোনা অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, তাহার গর্ত রহিয়াছে। গর্তগুলি অতি গভীর। বোধ হইল যে, তাঁহারা বিশেষ কিছু পান নাই। এইস্থান হইতে সিন্ধুনদের উপত্যকাকে ইংরাজীতে আপার ইনডাস্ ভ্যালি বলে। সাহেবরা এইস্থানে নানা জায়গায় সোনার খনির অনুসন্ধান করিয়াছেন। প্রাচীনকালে এইস্থানের জলে সোনার রেণু পাওয়া যাইত। গ্রীক ইতিহাসে তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে। এইস্থানে সিন্ধুনদের পরিসর মাত্র আট-দশ হাতের অধিক না হইলেও জল খুব গভীর ও স্রোতযুক্ত এবং ঘোর নীলবর্ণ। নীল সিন্ধুজল বাক্যটির অর্থ এতদিনে উপলব্ধি করিলাম! তীরে দুই দিকে বড় বড় পাথরের বাধা ঠেলিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে সিন্ধুকে এইস্থানে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে। অল্প কিছুদূর গমন করিয়া সিন্ধুনদের উপর একটি লৌহের ঝোলানো সেতু পার হইতে হইল। ইহাই সিন্ধুনদের উপর প্রথম সেতু। এই প্রদেশের রাজা নাগলুগ দ্বারা ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে সেতুটি নির্মিত হয়। সেতুটি প্রায় পঞ্চাশ ফিট দীর্ঘ ও চারি ফিট চওড়া। একাধিক অশ্ব বা মনুষ্য একসঙ্গে সেতুর উপর আরোহণ করিলে উহা অত্যন্ত দুলিতে থাকে, সেইজন্য এক-একজন করিয়া উহা পার হইতে হইল। সেতুটির চারিদিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, কোন পর্বতে কোথাও একটি বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না। প্রায় সমস্ত পর্বতের উপরিভাগই বরফে আবৃত। একটি উচ্চ পর্বতগাত্রে মেষপালকরা মেষ চরাইতেছে। মেষগুলি তৃণের সন্ধানে ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। উহাদিগকে নিম্ন হইতে পিপীলিকার সারির মতন মনে হইতে লাগিল। সেতুর অপর পারে সেতু রক্ষা করিবার জন্য একটি মাটি ও পাথরের নির্মিত ব্রাগনাস্ নামক প্রাচীন দুর্গ আছে। এই দুর্গে একটি শস্যাগার আছে, উহাতে যুদ্ধের সময়ে শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত।

এইস্থান হইতে পথ বরাবর কাঁকর, বালি ও পাথরে পরিপূর্ণ। কিছুদূরে যাইয়া খালাৎসা নামক একটি বৃহৎ গ্রামে আসিয়া পৌঁছাইলাম। গ্রামখানি লামাউরু হইতে দশ মাইল ও নুরুল্লা এইস্থান হইতে আট মাইল। গ্রামে প্রবেশ করিতেই পথের ধারে একখানি মনোহারী দোকান পাইলাম, তথায় দরজির কাজও হইতেছে দেখিলাম। আমরা সেখান হইতে কিছু খোবানি ও ছোট ছোট আপেল কিনিলাম। এইগুলির দাম পয়সায় দুইটি হিসাবে। এইগুলি এই প্রদেশে জন্মায় না, তাহা কাশ্মীর হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রামে দুই-চারিটি তুঁত ফলের গাছ রহিয়াছে। এইগুলি জুলাই মাসের মাঝামাঝি ফল দেয়। খোবানি ও তুঁতগাছ প্রায় একই রকম দেখিতে। উভয়েই অনেকটা কুলগাছের ন্যায়, কিন্তু কাঁটা নাই।

গ্রামে মোরাভিয়ান খ্রীষ্টান মিশনের একজন পাদ্রী সাহেব বাস করেন। তিনি এই প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। পাদ্রী সাহেবের বাংলোয় একটি 'ছোট পাঠশালা বসে। এই প্রদেশে যদিও সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য এইদিকে বিশেষ সিদ্ধিলাভ করিতেছে না। কারণ, মধ্যে মধ্যে অন্ন-বস্ত্র পাইবার লোভে যে দু-একজন লামা বা মুসলমান তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহারা উক্ত প্রকার সাহায্য বন্ধ হইলেই পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়া যায়।

গ্রামের মধ্যস্থলে উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর একটি বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা এই প্রদেশের রাজা নাগলুগের প্রাসাদ ছিল। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাল্টি যুদ্ধে তিনি মোগল হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। ঐ পাহাড়টিকে ব্রাগ্‌নাগ্ বলে।

গ্রামে ডাকঘর ও সরাই আছে। এই গ্রামে যতগুলি লামা স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা দেখিয়াছি সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইতিপূর্বে পরিষ্কার কাপড়-পরা লামা আমাদের চোখে পড়ে নাই। সকলকে এরূপ মলিন ও দুর্গন্ধপূর্ণ পোশাক পরিয়া থাকিতে দেখিয়াছি যে, আমাদের ধারণা হইয়াছিল বুঝি ইহারা আলখাল্লা নূতন পরার দিন হইতেই যতদিন পর্যন্ত না ইহা পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় ততদিন আর গা হইতে খুলে না ; কিন্তু আজ আমাদের হঠাৎ সে বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটিল। ইহা কি গ্রামখানিতে দুই-একজন ইউরোপিয়ান বাস করার ফল ? খালাৎসা হইতে নীমু পর্যন্ত যে সোজা পথটি আছে তাহা দিয়া যাইলে পথ নয় মাইল কম হয়, কিন্তু আমরা সেটি দিয়া না যাইয়া বড় রাস্তা দিয়াই চলিতে লাগিলাম, কারণ ঐ পথ তত ভাল নহে।

গ্রামটি অতিক্রম করিয়া আমরা পুনরায় সিন্ধুনদের ধারে ধারে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। দুই মাইল আসিয়া পথের ধারে একটি নুড়িপাথর-নির্মিত ঘর দেখিতে পাইলাম। ঘরখানিকে ডাকে বলে। প্রত্যেক চার মাইল অন্তর এই প্রকারের ঘর আছে। ডাকহরকরা আসিয়া ইহাতে বিশ্রাম করে ও হাত বদলায়। নিকটেই দুইটি চমরী-গাই বাঁধা রহিয়াছে। উহাদের পিঠে পার্শ্বেলের ব্যাগ বাঁধা। পিয়নরা উহাদিগকে সাসপুল হইতে খালাৎসা ডাকঘরে লইয়া যাইতেছে। পিয়নরা সকলেই লামা। ঘরখানির দেওয়ালে ও আশেপাশে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' মন্ত্রটি লিখিত রহিয়াছে। এই পথের সর্বত্রই এই মন্ত্রটি দেখা যায়। দেখিলাম কয়েকজন লামা ছেনি, হাতুড়ি লইয়া পথের উচ্চ পর্বতচূড়া হইতে সিন্ধুতট পর্যন্ত সর্বত্র উক্ত মন্ত্রটি পাথরে খোদাই করিতেছে। এইরূপ করাকে উহারা ধর্মপ্রচারের অঙ্গ মনে করে।

নুরুল্লা গ্রামের নিকটবর্তী হইয়া আমরা একটি লালবর্ণের ছোট মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের গায়ে প্রায় কুড়িটি চমরী গাইয়ের শিং পোঁতা রহিয়াছে। মন্দিরটি নুড়ি, পাথর ও মাটি দিয়া তৈয়ারী। উপরে মাটি লেপা ও লাল রং করা। ভিতরে

তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত। দেবীর মন্দির প্রায়ই লালবর্ণের হয়। পথিকরা পথ দিয়া যাইবার সময় দুই-একটি পয়সা এই সকল শিংয়ের ভিতর দিয়া দেবীর পূজার জন্য ভিতরে নিক্ষেপ করেন। ইহার নিকট একটি ক্ষুদ্র ছর্তেন রহিয়াছে। উহাতে লাল, নীল, সাদা প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের নিশান পোঁতা আছে। নিশানগুলিতে 'হুলু হুলু রুলু রুলু হুম্ ফট্' মন্ত্রটি ছাপা রহিয়াছে। লামাদের বিশ্বাস, এই মন্ত্রের বলে অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা সকল বিতাড়িত হয়। ছর্তেনের চারিদিকে তিনটি করিয়া পাথর উপর উপর রাখা রহিয়াছে, এইরূপ প্রায় আঠারোটি থাক আছে। ইহা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের প্রতীক।

বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা নুরুল্লা গ্রামের ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌঁছাইলাম। ডাকবাংলোর নিকটেই একজন লামার বাড়ী অবস্থিত। আমরা একজন লামা কুলির সহিত সেখানে গেলাম। আমাদের ইচ্ছা হইল যে, বাড়ীর ভিতরটি দেখিব। অনেক ডাকাডাকির পর লামাজী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন ও 'জুলে জুলে' বলিয়া আমাদিগকে প্রণাম করিলেন। আমাদের আসিবার কারণ শুনিয়া আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। বাড়ীর নিম্নতল পাথরের টুকরা ও দ্বিতীয় তল কাঁচা ইঁট দিয়া প্রস্তুত। আঙ্গিনা ও বারান্দা মাটিলেপা ও বারান্দার উপর কাঠের চালা, নীচের তলে দুইটি বড় বড় ঘর। ঘরে ভাল আলো নাই। জানালাগুলি খুব ছোট ছোট। ঘরের মেজেও মাটিলেপা এবং তার উপর সাদা পাথরের টুকরা বসাইয়া বাহার করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরে দুইটি মাটির তোলা-উনান। নিকটেই ৩।৪ খানি খুরসি পিঁড়ি। লামারা পিঁড়িতে বসিয়া আহার করেন। উনানের পাশে কতকগুলি শুকনা যবের খড়, পাহাড়ী কাঁটার ঝোপ এবং ঘোড়ার ও চমরী-গাইএর শুষ্ক পুরীষ রহিয়াছে। এইগুলি ইন্ধন। তিন-চারিটি পিতল ও মাটির হাঁড়ি এবং ২।৩টি কাঠের হাতা উনানের এক পার্শ্বে রহিয়াছে। একটি চা-মৌনিও রহিয়াছে। উহা অনেকটা আমাদের দেশের ঘোল-মৌনি বা ডাল-মৌনির মতো। একটি বাঁশের চোঙার ভিতর চায়ের জল ও মাখন দিয়া উহার দ্বারা মন্থন করিতে হয়, ইহাই এই দেশের চা প্রস্তুত প্রণালী। পরে লবণ, ছাতু ও সামান্য সোডা মিশাইয়া উহা পান করা হয়। এই দেশে দুধ ও চিনি দিয়া চা খাওয়ার প্রথা এখনও হয় নাই। ইহার পার্শ্বের ঘরটিতে দুইজন লাদাকী স্ত্রীলোক কতকগুলি ছাগলের লোম লইয়া টেকোতে পাকাইয়া সুতা প্রস্তুত করিতেছেন, উহা দ্বারা কম্বল, লুই প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। কতকগুলি ঘোড়ার লোমও এক পার্শ্বে রহিয়াছে। এই দেশে ঘোড়া ও চমরী গাইয়ের গায়ে শীতকালে লম্বা লম্বা লোম হয়। লাদাকীরা গ্রীষ্মকালে উহা কাটিয়া লইয়া দড়ি তৈয়ারী করে। দোতলায় উঠিবার কাঠের সিঁড়িটি অতি সংকীর্ণ ও খাড়া। উপরের প্রথম ঘরে পূজা হয়। তথায় প্রায় তিন হাত উচ্চ শাকাথুবার মূর্তি ও পার্শ্বে থুক্‌জেছিন্‌বো এবং কতকগুলি দেবীমূর্তি আছে। বেদীর সম্মুখে

একখানি বেঞ্চে সাতটি প্রদীপ খোবানির তৈলে জ্বলিতেছে ও প্রায় একুশটি ক্ষুদ্র পিতলের বাটিতে পানীয় জল, ছাতু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয় ঘরটিতে একজন রোগী রহিয়াছে। এই ঘরে রোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও থাকিতে দেওয়া হয় না। যাহার অসুখ হয়, তাহাকেই কেবল এই বিশেষ ঘরে আনিয়া রাখা হয়। মঠ হইতে বৈদ্য-লামা আসিয়া তাহার ঝাড়ফুক চিকিৎসা করেন। গ্রামে একজন বৈদ্যও আছেন, তিনি কিছু কিছু জড়িবুটিও প্রদান করেন।

লামাজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামের ঠিকাদার আসিয়া খবর দিল, নিকটেই লামারা একটি ভেড়া কাটিয়াছে, আমরা যদি কিছু মাংস কিনিতে ইচ্ছা করি; তবে সে আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু এই প্রদেশে ভেড়া বা ছাগলের মাংস সিদ্ধ হইতে বড় বিলম্ব হয় ও অনেক কাঠ পোড়ে বলিয়া আমরা তাহা লওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না। কিন্তু বৌদ্ধ লামারা কিরূপে পশু বধ করিয়া থাকে জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল হইল। ঐস্থানে গিয়া একটি সন্ন্যাসী লামাকে এ বিষয় প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, তাঁহাদের মহাযান মতে আছে—'ও অবোরা নে ইর রে হুম্' মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া পশু বধ করিলে আর কোন পাপ হয় না। ছাং নামক সুরাপান সম্বন্ধে তাঁহাদের ধর্মমত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, নিম্নলিখিত মন্ত্রটি তিনবার বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে সুরা নিবেদন করিয়া পান করিলে কোন দোষ হয় না। সুরা নিবেদনের মন্ত্র ঃ "হে ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ), আমি ও আমার সকল আত্মীয়স্বজন জন্মজন্মান্তরে কখনও তোমা হইতে যেন ভিন্ন না হই। তোমার আশীর্বাদ সুরাতে বর্ষিত হউক!"

ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করিয়া প্রাতে পুনরায় বাহির হওয়া গেল। অদ্যকার গন্তব্য স্থান সাসপুল নামক গ্রাম। নুরুল্লা হইতে এই গ্রাম সাড়ে চৌদ্দ মাইল। কতকগুলি যবের ক্ষেত্রের উপর দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। ক্ষেত্রের সকল শস্য কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে ও পুনরায় খোঁড়া হইতেছে। এই প্রদেশে লাঙ্গল নাই। ছোট ছোট কোদালির ন্যায় অস্ত্র দিয়া মাটি খোঁড়া হইয়া থাকে। যবগুলি শীতের প্রারম্ভেই বুনিয়া দেওয়া হয়। অঙ্কুর অল্প অল্প বাহির হইতে না হইতেই বরফ পড়িয়া ক্ষেত্র ঢাকিয়া যায় ও অঙ্কুরগুলি সেই অবস্থায় বরফ-চাপা পড়িয়া থাকে। পুনরায় বসন্তকালে (এপ্রিল-মে মাসে) বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে ঐগুলি বাড়িতে থাকে এবং শীঘ্রই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। নচেৎ বরফ গলিলে মাটি খুঁড়িয়া যব বুনিতে বহু বিলম্ব হইয়া যায় ও দ্বিতীয়বার চাষ করিবার সময় থাকে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঝরণা হইতে জল সেচনের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ক্ষেত্রে সার দিবার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। কারণ ঘোড়ার বা চমরী গাইয়ের গোবর এই প্রদেশের সাধারণ গৃহস্থের একমাত্র ইন্ধন। যে সকল গ্রামবাসী ক্ষেত্রে কর্ম করিতেছে, তাহাদের সকলের মুখের ঢং একরূপ নহে। কতকগুলির মুখ আধা চীনে বা মোঙ্গলীয় ভাবের অর্থাৎ নাক চ্যাপ্টা ও চোখ

ছোট ছোট, বাকিগুলির সম্পূর্ণ ভারতীয়গণের ন্যায়। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমাদের ধারণা হইল যে, ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিয়াছিলেন। ইতিহাসের ঘন অন্ধকার বিদূরিত করিয়া কে সেই সত্য নিরূপণ করিতে এক্ষণে সক্ষম হইবে?

ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা কুলা দিয়া বাতাসের সাহায্যে যব হইতে ধুলা মাটি আলাদা করিতেছে ও একপ্রকার পাহাড়ী সুরে গান গাহিতেছে। সকলেই বেশ স্ফূর্তিযুক্ত ও চটপটে। নিকটে কতকগুলি গাই চরিতেছে। সেগুলিকে দেখিতে ঠিক চমরী গাইয়ের ন্যায়। কিন্তু চমরী গাইয়ের অপেক্ষা ইহাদের লেজ লম্বা, এইগুলি চমরী ও ভারতীয় গাই-এর মিশ্রণে উৎপন্ন; চমরী দশ হাজার ফুট অপেক্ষা কম উঁচু স্থানে বাঁচে না, এইগুলি অনেক নীচেও থাকিতে পারে। মাঠটি পার হইয়া আমাদিগকে প্রায় ৫০।৬০ হাত নিম্নে নামিয়া একটি ভগ্ন সেতু অতি সাবধানে পার হইতে হইল। দেশের রাজা মধ্যে মধ্যে যে পথে বাহির না হন সে সকল পথের কেবল প্রজাগণের সুবিধার জন্য রাজকর্মচারীরা কোন দেশেই বিশেষ যত্ন লন না। কাশ্মীররাজ কখনও এই প্রদেশে আসেন না। তাই পথগুলি একরকম মোটামুটি ধরনের, বিশেষ ভাল নহে। নদীটি পার হইয়া একটি অধিত্যকার উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম। অধিত্যকাটির দৃশ্য অতি মনোহর। পথের দুই-ধারে পাহাড়ের গায়ে লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি নানা রংয়ের কাঁটাঘাস থাকাতে পাহাড়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছে। পথটি বরাবর সিন্ধুনদের তীরে তীরে গিয়াছে। জনাকীর্ণ শহরে যেরূপ পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য অট্টালিকা, শত শত পথিক, নানাবিধ গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পথিক আনন্দের সহিত চলিতে থাকে তদ্রূপ এই প্রদেশেও অনন্ত পর্বতশ্রেণী, তুষার-নদী, ঝরণা, জলপ্রপাত প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমরা আনন্দে চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর আসিয়া আমাদিগকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পর্বত অতিক্রম করিতে হইল। পথও এইস্থানে খুব বিপজ্জনক ও কষ্টকর। অদ্যকার পথ যেরূপ খারাপ তাহাতে তেজস্বী ঘোড়া সঙ্গে লইতে নাই, এই কথা পথপ্রদর্শক পূর্বেই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল। তাই নুরুল্লা হইতে শান্ত ও বলবান ঘোড়া বাছিয়া লইয়াছিলাম।

বেলা প্রায় সাড়ে চারটার সময় আমরা সাসপুল গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি বেশ বড় ও অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাস। অধিকাংশই বৌদ্ধ। মুসলমান খুব কম। গ্রামখানির লোকসংখ্যা প্রায় শতাধিক। গ্রামে ডাকবাংলোটি দ্বিতল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে সজ্জিত। পার্শ্বেই একটি ধর্মশালা অবস্থিত। এখানে কোন দোকান না থাকিলেও গ্রামের ঠিকাদার ও নম্বরদারের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রায় সবই পাওয়া যায়। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রামাদি করিবার পর এইস্থানের 'নিয়াজিয়া পুগ' নামক প্রাচীন মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলাম। উহা ১১,১৮০ ফিট উচ্চ

একটি পর্বতের মস্তকোপরি নির্মিত। মঠটি প্রায় চার শত বৎসরের পুরাতন। পূর্বে শতাধিক পুরোহিত এইস্থানে বাস করিতেন। দশটি ভিন্ন ভিন্ন ঘরে সুবর্ণ নির্মিত নানাবিধ দেবদেবীর পূজা হইত। মন্দিরের ভিতরের যাবতীয় দেওয়াল নানাবিধ হস্তাঙ্কিত চিত্রে পূর্ণ ছিল। বিদ্যার্থী-লামাদের ঘর, ধর্মশালা, প্রাঙ্গণ প্রভৃতি লইয়া প্রায় আড়াই শত গজ ব্যাপী স্থানে মঠটি অবস্থিত ছিল। পরে এই প্রদেশের রাজা দেলেগস্ নামজালের সহিত (১৬৪০—১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে) বাল্‌টিস্থানের মুসলমানগণের যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহাতে মুসলমানগণ কর্তৃক এই মঠটি ধ্বংস হয়।

এখনও প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ঐস্থানে যে মেলা হয় তাহাতে বিগত বাল্‌টি যুদ্ধের সং দেখানো হয়। কতকগুলি লোক বাল্‌টি মুসলমান ও কতকগুলি রাজা দেলেগের সৈন্য সাজিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর উঠিয়া নকল যুদ্ধ করিতে থাকে। কথিত আছে, ঐ প্রস্তরখণ্ড বাল্‌টিরা নাকি যুদ্ধের সময় পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে ফেলিয়াছিল।

বর্তমানে একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী লামা কয়েকজন পুরোহিত লামার সহিত এইস্থানে বাস করেন, সেখানে তাঁহাদের বাসের জন্য একটি নূতন মঠ নির্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের নীচেই একটি দ্বিতল বাড়ীতে একজন বিবাহিত সন্ন্যাসী লামা শান্ কুশাক্ পরিবার লইয়া বাস করেন।

সাসপুল গ্রামের দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য স্থান আল্‌চি নামক একটি প্রাচীন গুম্ফা। গ্রাম হইতে সিন্ধুনদের উপরস্থ পুল পার হইয়া দুই মাইল যাইলেই ঐ গুম্ফায় পৌঁছানো যায়। গুম্ফাটি ও এই সেতু রাজা সেঙ্গি নামজালের সময় (১৫৭০—১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ) নির্মিত হয়। গুম্ফাতে কাশ্মীরের সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ সূচীকার্য করা মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য শাল, আলোয়ান ও ফুল-লতাপাতা-কাটা সুন্দর কাঠের সামগ্রী কাশ্মীরের পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। এইগুলি প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন[১]। এই সকল ব্যতীত আল্‌চি গুম্ফার পাঠাগার, দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতিও দেখিবার জিনিস।

রজনীপ্রভাতে আমরা সাসপুল হইতে নীমু যাত্রা করিলাম। গ্রাম হইতে চার মাইল আসিয়া আমরা একটি পথ পাইলাম। পথটি দিয়া চার মাইল পশ্চিমদিকে যাইলে বিখ্যাত লিকির গুম্ফায় যাওয়া যায়। আমাদের অদ্যকার গন্তব্য স্থান মাত্র সাড়ে এগারো মাইল, সুতরাং লিকির দেখিয়া আসিবার যথেষ্টই সময় আছে জানিয়া লিকির গুম্ফার দিকে যাইতে লাগিলাম। পথে নানাস্থানে মাটির তলায় নানাবিধ খনিজ পদার্থ আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ, একস্থানের মাটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও পাথুরিয়া কয়লার গন্ধবিশিষ্ট, আর-একস্থানের উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট, উহাতে

১। কয়েকখানি প্রাচীন সূচীকার্য করা মনোহর শাল, আলোয়ান শ্রীনগরের লালমণ্ডিত যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

অভ্র মিশ্রিত আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অন্য একস্থানে তীব্র কেরোসিন তৈলের উগ্র গন্ধ পাইতে লাগিলাম, আমরা মনে করিতে লাগিলাম বুঝি কুলি হ্যারিকেনটি উল্টাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতেই এই প্রকার গন্ধ আসিতেছে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলাম হ্যারিকেন লণ্ঠন ঠিকই আছে। যাই হোক, এই সকল স্থানে কোন মূল্যবান পদার্থ থাকা না থাকা ভারতের পক্ষে সমানই। কারণ এই সকল স্থান হিমালয়ের পরপারে অবস্থিত। ক্রমে আমরা লিকির গ্রামের সন্নিকটবর্তী হইতে লাগিলাম, একটি শুষ্ক খাল পার হইয়া আমরা ঐ গ্রামের সীমান্তে প্রবেশ করিলাম। বসন্তকালে যখন চারিদিকের বরফসকল গলিতে আরম্ভ করে তখন চারিদিক দিয়া ঐ বরফগলা জল প্রবাহিত হইয়া নদীতে গিয়া পড়ে। সেই সময় নানাস্থানে খালের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে যখন আর কোথাও বরফ থাকে না, সব গলিয়া শেষ হইয়া যায়, তখন এই সকল খাল শুকাইয়া যায়।

গ্রামখানিতে দশ-পনেরো ঘর লামার বাস। চারিদিকে ছোট-বড় কয়েকটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটি আধ মাইল লম্বা সমতল ক্ষেত্রে গ্রামখানি অবস্থিত। সামান্য কয়েকটি যবের ক্ষেত্রও গ্রামে রহিয়াছে। তিন-চারিটি ছোট-বড় ছর্তেন ও একটি পাহাড়ের মাথার উপর নির্মিত ক্ষুদ্র গুম্ফা গ্রামের প্রধান দৃশ্য। গ্রামখানির নাম হইতেই গুম্ফাটির নামকরণ হইয়াছে। বড় গুম্ফাটি গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামটি পার হইয়া আমরা একটি ঝরণার ধারে ধারে চলিতে লাগিলাম। ঝরণাটি বেশ বড় ও উহার গর্ভ অসংখ্য নুড়িপাথরে পূর্ণ। ইহার জল ঈষৎ নীলাভ ও খুব শীতল, ইহার স্রোতও অতি প্রখর। চারিদিকে বৃক্ষ, লতা ও তৃণহীন পাহাড়। আমরা কখনও পর্বতবক্ষ, কখনও বা কাঠের পুলের উপর দিয়া, নদীটি পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

ক্রমে লিকির গুম্ফা সুস্পষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আহা কি মনোহর দৃশ্য! যেন রজত কিরীটধারী গিরিরাজ বিশাল দেহে সমুন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহার পশ্চাতেই একটি অতি উচ্চ, প্রায় ২৬,০০০ ফিট পর্বতের উপরিস্থিত তুষার-নদী যেন শিবের জটার মতো পড়িয়া রহিয়াছে। লিকির গুম্ফার ঠিক নীচেই আমরা আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। বৃহৎ চড়াই করিতে হইবে বলিয়া নদীতীরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও থার্মশ বোতল হইতে কিছু গরম চা পান করিয়া লইলাম। এত পথ আসিয়া আমরা খুব তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল ঝরণার সুশীতল জল কিঞ্চিৎ পান করিয়া তৃপ্ত হই। কিন্তু পথপ্রদর্শক নিষেধ করিয়া বলিল, পার্বত্যপথে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইলে কখনও ঝরণার বরফগলা ঠাণ্ডা জল পান করিতে নাই, উহাতে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া 'হিল ডাইরিয়া' (পেটের অসুখ) হইবার সম্ভাবনা ; শুধু তাহাই নহে অনেকে এইরূপ জল পান করিয়া নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া এই সুদূর পার্বত্যপ্রদেশে চিকিৎসার অভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পথে সর্বদা পান করার জন্য গরম জল সঙ্গে রাখা ভ্রমণকারী মাত্রেরই কর্তব্য।

লিকির পাহাড়ের মাথার উপর হইতে একজন প্রহরী-লামা আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছিল। আমরা তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া দিলাম, আমরা ভ্রমণকারী, লিকির গুম্ফা দেখিবার জন্য কাশ্মীর হইতে আসিয়াছি। পরে মালপত্র সব কুলি ও পথপ্রদর্শকের জিম্মায় রাখিয়া স্বামীজী নির্ভয়ে অশ্বারোহণে লিকির পর্বত আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ বেশ সরল ; তবে খাড়া চড়াই বলিয়া উঠিতে উঠিতে বসিবার জিনটি ঘোড়ার লেজের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল '.মাঝে মাঝে ঘোড়া থামাইয়া তাহা ঠিক করিয়া দিতে হইল। চড়াইয়ের পথে ঘোড়া লইয়া একরকম যাওয়া চলে, কিন্তু উৎরাই করিবার সময় একেবারে জিন সমেত ঘোড়ার গলার উপর আসিয়া পড়িতে হয়। তাই স্বামীজী পদব্রজে নামিবেন ঠিক করিলেন।

লিকির পর্বতটি প্রায় ১৪,০০০ ফিট উচ্চ। ইহার মাথার উপর বেশ সুন্দর একটি অধিত্যকা বর্তমান। উহা লম্বায় প্রায় আধ মাইল। চারিদিকে বেদ, সফেদা, শেও প্রভৃতি বরফান মুলুকের নানাবিধ গাছ। ঝরণাগুলির জল মাঝে মাঝে জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালেই এই অবস্থা, শীতকালে তো কথাই নাই! কোথাও একবিন্দু জলের মুখ পর্যন্ত দর্শন করিবার জো-টি থাকে না, সমস্ত জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। জলের প্রয়োজন হইলে একটুকরা বরফ হাঁড়িতে রাখিয়া উনানের উপর গলাইয়া লইতে হয়।

পাহাড়ের উপর গুম্ফাটি ব্যতীত দুই-তিন ঘর গৃহস্থের বাস আছে। গৃহস্থদের কতকগুলি ঝাঁকড়া লোমযুক্ত বেঁটে ছাগল ইতস্ততঃ চরিতেছে। এইগুলি দেখিতে অতি সুন্দর, ঠিক ভেড়ার ছানার মতো। গৃহস্থদের ভাল্লুকের মতো কুকুরগুলি আমাদের দেখিয়া উচ্চ চীৎকারে পাহাড় ফাটাইতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় সেগুলি বাঁধা ছিল। একে একে তিনটি তোরণ পার হইয়া আমরা সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলাম। গুম্ফাটি রক্ষা করিবার জন্য পথে মাঝে মাঝে এই তোরণগুলি নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। এইগুলি পাথর ও মাটি দিয়া প্রস্তুত। প্রায় দেড় শত পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আমরা প্রধান তোরণটির ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম ও ক্রমে গুম্ফার দরজায় আসিয়া পৌঁছিলাম। এতক্ষণ চতুর্দিক হইতে লামারা আমাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। নিকটেই একটি যবের ক্ষেত্রে একজন বৃদ্ধ লামা কাজ করিতেছিল, সে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল, ও মঠের মোহন্তের নিকট খবর দিতে গমন করিল। আমরা এত পথ ক্রমাগত চড়াই করিতে করিতে (প্রায় ১ মাইলে তিন হাজার ফিট) হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘোড়া দুইটিকে নিকটে বাঁধিয়া, একটি পাথরের উপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই প্রায় পঁচিশ জন সন্ন্যাসী লামা আসিয়া স্বামীজীকে 'জুলে জুলে' (প্রণাম) বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া যাইয়া বড় হলঘরে ঢুকিলেন। হলটি অতি উৎকৃষ্টরূপে সাজানো ও নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্তিতে পরিপূর্ণ। ঘরটি লম্বা ও চওড়ায় আন্দাজ ২০×২৩ ফিট,

উচ্চতায় প্রায় ১২ ফিট। মেজেতে নামদা ও লুই পাতা। তাহার উপরে কাঠের বইদান ; ছাপা পুঁথি এবং কতকগুলি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে এবং দুইখানি ছোট বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর ছাতু ও লবণের পাত্র রক্ষিত আছে। বেঞ্চগুলির সম্মুখে মোটা গদি পাতা, তথায় প্রধান লামা উপবেশন করেন। ঘরের চারিদিকে সিল্কের লাল, নীল প্রভৃতি নানা রঙের পর্দা ঝুলানো। ঘরের থামগুলিও নানা বর্ণের চাদরে মোড়া। ছাদের কড়িগুলি নানাবিধ কারুকার্যে পূর্ণ। দেওয়ালে ও থামে প্রায় পঞ্চাশ খানি মাপের মতো ছবি খাটানো। সকল ছবিগুলিই হাতে আঁকা ও ধর্ম বিষয়ক। ঘরে 'গেদুন গ্রুব' প্রভৃতি প্রধান প্রধান 'গ্যাল-বা-রিণ পোছে' বা দালাই লামার প্রতিমূর্তি[২]। মূর্তিগুলি দেখিলে কারিগরকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। মূর্তিগুলির মুখের ভাব অতি প্রশান্ত ও উদারতাব্যঞ্জক।

এইগুলির মধ্যস্থলে একটি 'মেনদোঙ্' বা স্মৃতিস্তূপ রক্ষিত আছে। এই স্তূপগুলিতে পরলোকগত বিখ্যাত লামা গুরুদিগের চুল, নখ, অস্থি প্রভৃতি দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। এইগুলি রৌপ্য, স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড দিয়া প্রস্তুত। এই সকল ব্যতীত অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি নানাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। মূর্তিগুলির মুখের আকৃতি এক ছাঁচের নহে। কোনটি চীনা, কোনটি মোঙ্গলীয় ধরনের এবং কতকগুলি আর্যদের ন্যায়।

মূর্তিগুলির সম্মুখে বেঞ্চের উপর প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটিতে জল রহিয়াছে। অন্য পার্শ্বে কতকগুলি ছোট ছোট পিতলের দেবদেবীর মূর্তি ও পুরাতন জুতা, জামা, পাগড়ি প্রভৃতি কোন কোন লামা-গুরুদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সঞ্চিত রহিয়াছে। এই সকল দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে বজ্রপাণি, লোকেশ্বরী, বজ্রতারা, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পার্শ্বের ঘরটি অতিকায় শাকাথুবা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির প্রতিমূর্তি ও নানাবিধ পূজার উপকরণে পূর্ণ। ঘরটি ঘোর অন্ধকার ও জানালাশূন্য। একজন লামা মাখনের প্রদীপ জ্বালিয়া মূর্তিগুলির মুখের নিকট ধরিয়া ধরিয়া আমাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক মুখখানি করুণা-ভাবপূর্ণ ও অতি রমণীয়। ভিতরে দুই পার্শ্বে কাঠের তাকে প্রায় আড়াই শত পুঁথি কাপড়ে জড়ানো রহিয়াছে। অন্য ঘরে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ৩/৪ শত পিতলের দেবদেবীর মূর্তি বড় কাঠের তাকে সজ্জিত রহিয়াছে। এই ঘরের

২। গেদুন গ্রুব (জন্ম ১৩৮৯—মৃত্যু ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'গ্যাল-বা-রিণ পোছে' উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রথম 'দালাই লামা' হন। আজ পর্যন্ত সকল দালাই লামাগণ উক্ত প্রকার উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। লামাদের বিশ্বাস বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর (চেনরেজী) যখন মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি স্বীয় শরীর হইতে একটি অপূর্ব জ্যোতি বিকাশ করিয়া তাহা সেই মানুষের দেহে মিশাইয়া দেন, তাহাতে সেই মানুষের দেহে দেব-ভাবের আবির্ভাব হয়। তাসি লামাগণ চেনরেজীর পিতা অমিতাভের অবতার বলিয়া পূজিত হন।

বাহিরের দেওয়ালে আঁকা লাসা, পোতালার প্রাসাদ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি ছবি রহিয়াছে। ছবিগুলি অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত। মঠস্থ লামাদের অনেকেই চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পটু। ইহার পার্শ্বের ঘরটি অতি ক্ষুদ্র ও প্রবেশদ্বার খুব ছোট, মাথা হেঁট করিয়া ঢুকিতে হইল। ঢুকিয়া যা দেখিলাম—তাহাতে মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রায় দেড় শত খাপযুপ্ত তলোয়ার, কুড়ি-পঁচিশটি ঢাল, আট-নয়টি তিব্বতী বন্দুক, কতকগুলি ছোরা ও মধ্যস্থলে একটি সোনার সিংহাসনে সোনার বুদ্ধমূর্তি। যে রথে সিংহাসন স্থাপিত তাহাও সোনার (গিল্টি করা বোধ হইল)। ঘরের দুই কোণে দুইটি কালো পাথরের কলসী রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হইল, উহাতে গুপ্তধন সঞ্চিত আছে।

ঐ গুপ্ত ঘরটি হইতে বাহির হইয়া আমরা ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলাম। এই অতি উচ্চ স্থান হইতে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাইতে লাগিল। দূরে কারাকোরাম পর্বতমালা দেখা যাইতেছিল। উহার সর্বাঙ্গ তুষারে ও বরফে মণ্ডিত সম্পূর্ণ সাদা। একজন লামা আমাদিগকে দূরে 'তে-সি' বা কৈলাস-পর্বতমালা, 'পো-ছুং' বা ক্ষুদ্র তিব্বত প্রদেশ এবং পশ্চিমে 'সেংগে খর্বু' বা সিন্ধুনদ দেখাইয়া দিলেন। কথাবার্তার বড়ই অসুবিধা হইতেছিল, কারণ লামাজী যিনি আমাদিগকে এই সকল দেখাইতেছিলেন, তিনি হিন্দী অতি অল্পই জানিতেন। তিনি ব্যতীত মঠস্থ অন্য কেহ হিন্দী আদৌ বুঝিতেন না। এই সঙ্ঘারামের ধন, রত্ন ও সম্পত্তির মূল্য ও পরিমাণের গৌরব মধ্য-তিব্বতের হিমিস্ গুম্ফার পরেই। কোন সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠে যে এতগুলি অস্ত্র ও এত অধিক ধন-রত্ন থাকিতে পারে তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

কিয়ৎকাল পরে স্বামীজী পূজারী লামার হস্তে কিছু মুদ্রা দিয়া মন্দিরে দেবদেবীর পূজা দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহার পর আমরা সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নীচে আমাদের দলে আসিয়া মিলিত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ রাজধানী লে ॥

লিকির গুম্ফার তলদেশে কিছুকাল বিশ্রাম করিবার পর আমরা নীমুর দিকে রওনা হইলাম। অল্প দূরেই একটি ঝরণা পাইলাম। তাহার তীর ছাড়িয়া আমরা একটি অধিত্যকার উপর বালি ও কাঁকরপূর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহা পার হইয়া একটি পাহাড়ের উপর উঠিয়া তাহার বিপরীত দিকে নামিতেই বাস্‌গো শহরের ভগ্নাবশেষের দৃশ্যসকল আমাদের নয়নগোচর হইল। শহরটির অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দৃশ্য নিমেষে দর্শকের মন হরণ করে। আহা, কি অতুলনীয় সৌন্দর্যরাশি! ইচ্ছা হয় যেন চিরদিনের জন্য মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখি। বিখ্যাত বাস্‌গো শহর ঐতিহাসিকগণের চির আদরের স্থান। এই প্রদেশের সকল সময়ের উন্নতি, অবনতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান এই স্থানের ইতিহাস আলোচনায় অতি সহজে পাওয়া যায়। ক্রমে আমরা বাস্‌গো শহরের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

গ্রামের মধ্যস্থলে বহু শৃঙ্গযুক্ত দুইটি পাহাড়। তাহার উপর প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পাহাড় দুইটির পাথর ঈষৎ উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের। পাহাড়ের উপর সুমিষ্ট জলের দুই-তিনটি ঝরণা প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। পাহাড়টির তলায় লে-র ব্রিটিশ জয়েণ্ট কমিশনার সাহেবের বাগানবাড়ী। বাগানের ভিতর তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার অতি উত্তম স্থান রহিয়াছে। যেকেহ আসিয়া সেখানে থাকিতে পারেন; কিন্তু বাংলোটিতে অন্য কেহ থাকিতে পান না।

প্রায় আড়াই মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া স্থান ব্যাপিয়া একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্যে বর্তমান বাস্‌গো শহর অবস্থিত. লোকসংখ্যা প্রায় শতাধিক। সকলেই কৃষিজীবী। স্থানটি বেশ উর্বর বলিয়া সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন। এইস্থানের সকলেই বৌদ্ধ, মুসলমান নাই। এই গ্রাম ১৫৯০ হইতে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সেংগে নামজাল বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময় ইহা এই প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শহর বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৩৮০ হইতে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীররাজ প্রতিমাভঙ্গকারী সেকেন্দর খাঁর অত্যাচারে বাল্‌টিস্টানবাসী লামাগণ প্রাণভয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে ও বৌদ্ধ খর্বুবাসী লামাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও ভীষণ লুঠপাট আরম্ভ করে। ১৬২০ হইতে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাস্‌গো-রাজ দিলদান নামজাল খর্বুতে ও দ্রাসে ঐ প্রদেশের মুসলমান শাসনকর্তা ত্রিসুলতানকে দুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য জয় করেন। এখনও বৌদ্ধখর্বুতে একখানি প্রস্তরখণ্ডে ঐ বিষয়ের বিবরণ লিখিত আছে। লে-র তেওয়ার

গিরিবর্ত্মে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মণি-দেওয়ালটি রাজা দিলদানের অন্যতম কীর্তি। উহা ৮৫০ পা লম্বা। ইহার প্রথম ছর্তেনটি নামজাল জাতীয় অর্থাৎ গোলাকার সিঁড়িবিশিষ্ট ও দ্বিতীয়টি য্যাংচুব জাতীয় অর্থাৎ চৌক সিঁড়িবিশিষ্ট। এই মণি-দেওয়াল তিনি তাঁহার মাতার মঙ্গলকামনার্থে নির্মাণ করান।

পূর্বে এই প্রদেশের রাজাদের মধ্যে আত্মীয়স্বজনের কল্যাণের জন্য মণি-দেওয়াল নির্মাণ করিয়া দেওয়ার প্রথা খুব প্রচলিত ছিল। তিনি পশ্চিম তিব্বতের প্রাচীন রাজধানী সে-তে পিতুক গুম্ফার ন্যায় একটি গুম্ফা ও মূর্তি, একটি পাঁচতলা উচ্চ ছর্তেন এবং একটি দুইতলা উচ্চ মৈত্রেয়-বুদ্ধ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক রাজধানী লে শহরে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করেন তিনি। তথায় একটি দুইতলা উচ্চ অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ও মন্ত্রণা-গৃহে একটি রৌপ্য-নির্মিত ছর্তেন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।

১৬৪০ হইতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা দিলদানের পুত্র দেলেগ্স্ নামজালের সময় মোঙ্গলীয়গণ বাস্গো আক্রমণ করে ও রাজধানী অবরোধ করে। রাজা দেলেগ্স্ বাস্গো দুর্গ ত্যাগ করিয়া তিরিশ মাইল পশ্চিমে তিংগ্ মো-গাং নামক দুর্গে পলায়ন করেন ও দিল্লীর বাদশাহ সম্রাট শাহজাহানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট শাহজাহান নবাব ফতে খাঁ নামক সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাস্গোতে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। বাস্গো ও নীমুর মধ্যস্থলে অবস্থিত জারগ্যাল নামক ময়দানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মোঙ্গলীয়গণ হারিয়া পংগং হ্রদের তীরে পলায়ন করে ও ত্রশিগাং-এ দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকে। মোঙ্গল সেনাপতি ফতে খাঁর সাহায্যে জয়লাভ করিয়া রাজা দেলেগ্স্ তিংগ্ মো-গাং হইতে নবাব ফতে খাঁকে ধন্যবাদ দিবার জন্য তাঁহার শিবিরে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব বাদশাহ শাহজাহানের আদেশ অনুযায়ী রাজা দেলেগ্স্কে এক পত্র দিলেন তাহাতে নিম্নলিখিত শর্তগুলি ছিল।

১। রাজা দেলেগ্স্কে মুসলমান হইতে হইবে এবং তাঁহার নূতন নাম আকাবল মামুদ খাঁ হইবে।

২। রাজার স্ত্রী, পুত্র জ্গিপাল ও কন্যা মুসলমান হইয়া কাশ্মীরে বাস করিবে।

৩। রাজা দেলেগ্স্ মুসলমান হইয়াছে, ইহা সর্বত্র প্রচার করিবার জন্য জৌ নামক মুদ্রাতে তাহার নূতন নাম মামুদ শাহ মুদ্রিত থাকিবে।

৪। লাদাকে ইসলাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে এবং লে শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিতে হইবে।

এই সময় বাল্টিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানেরা লাদাকে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল।

৫। তিব্বতের অত্যুৎকৃষ্ট পশম কাশ্মীর ভিন্ন অন্য কোথাও বিক্রী করিতে পারিবে না এবং তাহার মূল্য দুই টাকায় সাত বাটি নির্ধারিত থাকিবে।

৬। প্রতি বৎসর আঠারোটি টাট্টু ঘোড়া (পোনি), আঠারোটি মৃগনাভি ও আঠারোটি শ্বেতচামর কাশ্মীরের নবাবকে রাজকর দিতে হইবে। এবং নবাব ইহার পরিবর্তে পাঁচশত বস্তা চাউল লাদাকে পাঠাইয়া দিবেন।

এই সকল শর্তে রাজা দেলেগ্স্ সম্মত হইলে নবাব ফতে খাঁ তাঁহার বিপুল বাহিনী লইয়া লাদাক ত্যাগ করিলেন। রাজা দেলেগ্স্ একটু হাঁপ ছাড়িতে না ছাড়িতে তিব্বতী ও মোঙ্গলীয় সৈন্যগণ পাঙ্গংগং হ্রদের তীর হইতে সদলবলে আসিয়া তিংগ মো-গং দুর্গ ঘিরিয়ে ফেলিল এবং দেলেগ্স্কে লাসার রাজা দালাই লামার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিল। তাহারা মিপাম্ ওয়াংগপো নামক একজন লামাকে দালাই লামার প্রতিনিধিস্বরূপ লইয়া আসিয়াছিল।

এই সন্ধিতে রাজা দেলেগ্সের রাজ্য অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র হইয়া গেল। ইহার অপর একটি শর্ত ছিল যে, লাদাকের রাজা প্রতি তিন বৎসরে দালাই লামাকে ত্রিশ গ্রাম সুবর্ণ, দশটি মৃগনাভি, ছয় থান কেলিকো ও এক থান নরম সুতার কাপড় উপহারস্বরূপ রাজকর পাঠাইবে। প্রতি বৎসর লাসা হইতে দুইশত চা-ইষ্টক লাদাকে পাঠান হইবে, সেই চা ভিন্ন অন্য কোন চা লাদাকে ব্যবহৃত হইবে না, অদ্যাপি লাদাকে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে।

রাজা দেলেগ্স্ কলমা পড়িয়াও তাঁহার পিতার বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করেন নাই। তিনি লাদাকে বৌদ্ধধর্ম যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে সেজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং লামাদিগকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাস্গোর মৈত্রেয়-বুদ্ধের গুম্ফাটি পর্যটকমাত্রেরই দেখা কর্তব্য। এইস্থানে কাঠ, তামা ও সোনার পাত দিয়া প্রস্তুত মূর্তিটি আশী বৎসর বয়স্ক মৈত্রেয়-বুদ্ধের প্রতিমূর্তি এবং উহা তিনতলা সমান উচ্চ। এই গুম্ফাটি দিলদানের পিতা রাজা সেংগে নামজাল নির্মাণ করেন। যদিও ইঁহার মাতা মুসলমান ধর্মাবলম্বিনী ছিলেন, তথাপি ইনি লামাদিগের ন্যায় রক্তবর্ণের পোশাক পরিধান করিয়া থাকিতেন এবং বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্মে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন। ইনি বাস্গোর নিকটবর্তী অনেক স্থানে মন্দির মঠাদি নির্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্তাগ-সাঙ্গ-রম-চেন নামক বিখ্যাত ব্যাঘ্র-লামাকে লাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন।

বাস্গোর নিকটে লিঙ্গ সেদ নামক স্থানে যে মণি-দেওয়ালটি আছে তাহা স্তাগ-সাঙ্গ-রম-চেনের নির্মিত। ইনি মধ্য-তিব্বতের হিমিস্ চেমরে, এশিস্গঙ্গ ও হান্লে গুম্ফা প্রতিষ্ঠিত করেন ও ভারতবর্ষের কাশ্মীর, হিন্দুস্থান, উদ্যান (পদ্মসম্ভবের জন্মস্থান) প্রভৃতি পর্যটন করিয়া যান। ইঁহাকে ব্যাঘ্র-লামা—এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

বাস্গো পাহাড়ের উপরিস্থিত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও মঠাদি দেখিতে চেষ্টা করিয়াও আমরা সফলকাম হইলাম না, কারণ যে লামাটির নিকট চাবি থাকে তিনি

তখন লে-তে গিয়াছিলেন। যাই হোক, আমরা কিছুক্ষণ পরেই পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া নীমুর দিকে অগ্রসর হইলাম। নীমু এইস্থান হইতে চার মাইল। আমরা গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া যাইতে লাগিলাম। পথের দুই ধারেই শস্যক্ষেত্র। সেখানে নানা স্ত্রী-পুরুষ, বালক ও বালিকাগণ কাজ করিতেছে।

গ্রামটির এক ধার ঢালু ও অপর ধার উচ্চ, এই কারণে শস্যক্ষেত্রগুলি ঠিক সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নামিয়াছে। একটি অস্থায়ী ঝরণা চার-পাঁচ দিন হইতে এই পথে প্রবাহিত হওয়াতে পথকে অত্যন্ত কর্দমাক্ত করিয়াছে। উহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। এখানে এইরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ ও আধুনিক গ্রামের ঘর-বাড়ী দেখিতে দেখিতে আমরা গ্রামের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইস্থানে চারিটি যাঁতাকল (পান চাক্কী) একটি বৃহৎ ঝরণার জলের স্রোতে ঘুরিতেছে। তাহাতে যব হইতে ছাতু ও আটা প্রস্তুত হইতেছে।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আমরা পাঁচ মাইল বিস্তীর্ণ একটি উন্মুক্ত অধিত্যকার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাঠটি দেখিয়া প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সমতল ক্ষেত্র পাইয়া স্বামীজী ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। গদিয়া পিছনে মালবাহী ঘোড়ার সঙ্গে আসিতে লাগিল। মাঠটি ধূলা, বালি ও নুড়িপাথরে এইরূপ পূর্ণ যে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিক শুষ্ক মরুভূমির ন্যায়, কোথাও একবিন্দু জলের চিহ্নও নাই। দূরে নীমু গ্রামখানি ঠিক মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের ন্যায় দেখা যাইতেছে। ইহাই জাবগাল ময়দান, যেখানে নবাব ফতে খাঁর সহিত মোঙ্গলীয়গণের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। পথপ্রদর্শক আমাদিগকে যুদ্ধের স্থানসকল দেখাইয়া দিতে লাগিল। মাঠটির মধ্যস্থলে প্রায় দেড় ফার্লং লম্বা একটি বৃহৎ মণি-দেওয়াল আছে। প্রায় এক লক্ষ "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" লেখা পাথর ইহার উপর বসানো রহিয়াছে। ইহাই লিঙ্গ সেদের মণি-দেওয়াল। ক্রমে আমরা নীমুতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া ডাকবাংলোর চৌকিদার তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিল ও সেলাম করিল। ডাকবাংলোর চারিদিকে সরকারী বাগান। স্থানটি বেশ ছায়াপূর্ণ। স্বামীজী এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা তিনটা, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠিক হইল যে, আজ এখানে না থাকিয়া আরও চৌদ্দ মাইল যাইয়া পিতুক গ্রামের ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করা হইবে। পিতুক হইতে লে মাত্র ছয় মাইল। তাহা হইলে কাল প্রাতে পিতুকের বিখ্যাত গুম্ফা দর্শন করিয়া রৌদ্র প্রখর হইবার পূর্বেই লে-তে পৌঁছানো যাইবে। কিন্তু সাস্‌পুলের ঘোড়াওয়ালারা সেখানে যাইতে সম্মত হইল না। তাহারা নিজেদের পড়াও ব্যতীত অপরের পড়াওতে যায় না। সাস্‌পুল হইতে নীমু একটি পড়াও, আবার নীমু হইতে লে আর একটি পড়াও। সুতরাং এইস্থান হইতে লে বা পিতুক যাইতে হইলে নূতন ঘোড়া ভাড়া করিতে হয়। পরিশ্রান্ত ঘোড়া লইয়া তাড়াতাড়ি চলাও যায় না, এই কারণে আমরা

ঠিকাদারকে নূতন চারিটি ঘোড়া আনিতে বলিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘোড়া আসিয়া পৌঁছিল। ঘোড়াওয়ালারা আমাদের সহিত হিমিস্ পর্যন্ত যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, লে হইতে হিমিস্ অন্য একটি পড়াও। তাহাদের কাহারও এক পড়াও-এর বেশী যাইবার অধিকার নাই। হিমিস্ যাইতে হইলে লে-র ঘোড়াওয়ালা যাইবে। এই সুদূর পার্বত্য প্রদেশে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের শ্রমিক ইউনিয়নের ভাব বর্তমান দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম! ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মালপত্র যথাযথভাবে বাঁধিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। তখন বেলা প্রায় চারিটা। রাত্রি হইবার পূর্বেই যাহাতে পিতুক পৌঁছিতে পারি তজ্জন্য ঘোড়া দ্রুত চালাইতে লাগিলাম। এইবার যে ঘোড়াগুলি পাইয়াছি, সকলগুলিই খুব ভাল। আমরা নীমুগ্রাম ও নদী পার হইয়া কতকগুলি মণি-দেওয়াল ও শস্যক্ষেত্র পিছনে ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও একটি বৃহৎ পর্বতের উপর চড়িতে লাগিলাম। খাড়া চড়াই। মধ্যে মধ্যে বেশ বেগ পাইতে হইল। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল কস্‌রতের পর আমরা পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে উঠিলাম। স্থানটি প্রায় ১৪,০০০ ফিট উচ্চ। চারিদিকে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। উপরে বিস্তীর্ণ অধিত্যকার দৃশ্য অতিশয় মনোহর। প্রায় কুড়ি মাইল স্থান ব্যাপিয়া খোলা ময়দান। দূরে কারাকোরাম পর্বতমালা চিরতুষারমণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এইবারে পথ বরাবর উৎরাই। ময়দানে ঢালু পথে ঘোড়াগুলি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। প্রায় তিন ঘণ্টায় সাড়ে দশ মাইল আসিয়া ফিয়াং নালা নামক উর্বর উপত্যকায় পৌঁছিলাম। একটি সুশীতল জলপূর্ণ ঝরণা যেন পথিকের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য কুলু কুলু শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। পথের এক পার্শ্বে একটি সুন্দর বাগান। বাগানের ছায়ায় আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। সেখানে তাঁবু খাটাইবার অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে। বাগানে ডাকহরকরাদের একটি ফাঁড়ি আছে। এইস্থান হইতে নীমু আড়াই ডাক, আরও অর্ধ ডাক গেলে আমরা পিতুক পৌঁছিব। এক ডাক অর্থে চার মাইল। উপত্যকার মধ্য দিয়া ঝরণাটি বহু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। যতদূর পর্যন্ত ঝরণাটি দেখা যাইতেছে, ইহার দুই পার্শ্বে অসংখ্য বৃক্ষ ও জঙ্গলে পূর্ণ। চারিদিকে বৃক্ষ, লতা, জলহীন বালুময় মরুভূমি, আর মধ্যে এই অদ্ভুত উর্বরতাশক্তিপূর্ণ স্রোতস্বতী, বাস্তবিকই কি রমণীয়!

এইস্থানের অল্প দূরেই পাহাড়ের উপর বিখ্যাত ফিয়াং গুম্ফা বিদ্যমান। দূর হইতে চিত্রের ন্যায় ইহার দৃশ্য বিশেষ নয়নরঞ্জক। গুম্ফাটি বহুকালের প্রাচীন; উহার বয়স চারিশত বৎসরেরও অধিক এবং এই প্রদেশের অনেক পুরাতন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। অধিক সময় নাই বলিয়া আমরা এবার আর উহা দেখিতে যাইলাম না। ফিরিবার সময় যাইব ঠিক হইল।

আরও তিন মাইল পথ যাইয়া আমরা পুনরায় একটি বড় নদীর ধারে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার তীর ধরিয়া কিয়দ্দূর যাইতেই পিতুক ডাকবাংলোয় আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি মনোহর স্থানে বাংলোটি অবস্থিত। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও বাগান, নিকটে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা প্রবাহিত। বাংলোর জলের অভাব উহা হইতে পূরণ হয়। বাংলোর চৌকিদারকে তাহার বাড়ী হইতে ডাকাইয়া আনিতে হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকাদার সরবরাহ করিল। আজ সমস্তদিন অনেক পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিমনিতে আগুন জ্বালিয়া রাখিতে হইল, কারণ শীত অত্যন্ত অধিক। রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু এক ঘন্টার অধিক হইয়া গেল তথাপি সহিসরা আসিল না। রাত্রে শুইবার জন্য তাহারা নিকটবর্তী গ্রামে তাহাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল। তাহাদিগকে প্রত্যূষে আসিতে বলিয়া দিয়াছিলাম, তথাপি এই অবস্থা। আমাদের পার্শ্বের কামরায় একজন শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার সহিসেরও ঐ হাল ; তিনি তো চটিয়া লাল। কিয়ৎক্ষণ চীৎকার করিয়া শেষে চাবুক হাতে করিয়া বসিলেন। পরে বহু বিলম্বে যখন তাহারা দয়া করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, সাহেব ব্যাঘ্রের মতো লম্ফ দিয়া লামা দুইটির অঙ্গে পাঁচ-ছয় ঘা চাবুক ও চার-পাঁচটি সবুট ব্রিটিশ পদাঘাত সজোরে বসাইয়া দিলেন। সকল ঘোড়াওয়ালারা ভয়ে থরহরি কম্প। এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া স্বামীজী অবাক হইয়া রহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ঘোড়াওয়ালাদের ব্যবহারে তিনি কেবল বলিলেন, ইহাদিগকে বক্‌শিস দিব না। মালপত্র বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। এই প্রদেশের লামারা মাঝে মাঝে সাহেবদের হস্তে উত্তম-মধ্যম প্রহার লাভ করে। আমরা বৌধ্‌খর্বু ডাকবাংলোয় এই প্রকার ঘটনা আর একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

বরাবর সিন্ধুনদের এক শাখানদীর ধারে ধারে আসিয়া প্রায় এক ঘন্টা পরে পিতুক গুম্ফার নিকট পৌঁছিলাম। লে উপত্যকার উপর গুম্ফাটি অবস্থিত। দূর হইতে দেখিতে চিত্রের ন্যায় মনোহর। এই গুম্ফা পাঁচশত বৎসর পূর্বে গ্যাম্পো বুমল্‌ডে কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। পাহাড়টির পূর্ব ধারে পিতুক গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামবাসীদের ঘর, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোথাও অল্পমাত্রও আবর্জনা নাই। পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া গুম্ফায় উঠিবার সিঁড়ি। পথটি বেশ চওড়া ও সহজ। নিম্ন হইতে বরাবর ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। অর্ধ মাইলে প্রায় এক হাজার ফিট চড়াই করিয়া গুম্ফার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরের ফটক। পার্শ্বেই একটি ছর্তেন ও পরমেশরা। আমরা ঘোড়া হইতে নামিয়া পাথরের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম ; এমন সময় একজন সন্ন্যাসী লামা আসিয়া আমাদিগকে মঠের ভিতরে লইয়া গেলেন ও বসিবার ঘরে পিঁড়িতে বসাইয়া কাঠের বাটিতে লাসার চা-সিদ্ধ জল, মাখন ও লবণ দিলেন। একটি কাঠের বাটিতে ভাজা যবের ছাতু ও একটি ক্ষুদ্র হাড়ের চামচ দিলেন, আমরা

চামচ করিয়া ছাতু লইয়া চা-র সহিত মিশাইয়া খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই ঘরটিতে সকলে আহার করেন। সকলের বসিবার জন্য ৭।৮খানি খুরসী পিঁড়ি ও দুই-তিনখানি ছোট ছোট টুল রহিয়াছে। ঐগুলির উপর পাত্র রাখা হয়। এক পার্শ্বে বড় লামার বসিবার জন্য একটি গদি পাতা ও একটি টুলের উপর ছাতুর কেটকো ও চা-পানের কাঠের বাটি রক্ষিত আছে। এই ঘরটির দুই পার্শ্বে দুইটি দরজা। একটি রান্না ঘরে ও অপরটি বড় লামার শুইবার ঘরে যাইবার। প্রথমে আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। জুতা পায়ে ছিল, কেহ কিছু আপত্তি করিলেন না। ঘরটি বেশ পোতানি মাটি-লেপা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু দেওয়াল ও ছাদ ধোঁয়ায় ও ঝুলে কৃষ্ণবর্ণ। ঘরে দুইটি জানালা আছে। দুইটি তোলা উনান। উনানগুলি উচ্চে প্রায় দুই হাত। ঠিক কয়লার উনানের ন্যায়, কিন্তু কাঠে জ্বালানো হয়। একটি উনানে চা সিদ্ধ হইতেছে। কয়েকটি পিতলের ডেক্‌চি, কাঠের হাতা, তাড়ু, কেটলি প্রভৃতি রহিয়াছে। লামাজী রন্ধন করিবার সময় খুরসী পিঁড়িতে বসেন। এক পার্শ্বে একটি লবণের কেট্‌কো ও কিছু ভেড়ার চামড়ায় জড়ানো মাখন রহিয়াছে। পার্শ্বের ঘরখানি লামাজীর শয়ন-ঘর। ঘরে ঢালা গদি পাতা। তিনটি তাকিয়া রহিয়াছে। আলনায় অনেকগুলি কাপড়-চোপড়, কুলুঙ্গিতে নানা প্রকারের ফটোগ্রাফ, কোনখানি লামাজীর, কোনখানি দালাই লামার, কোনখানি তাসি লামার, কোনখানিতে অনেকগুলি ছবি একত্রে তোলা হইয়াছে। সাদা কাগজ, পাথরের দোয়াত, শরের কলম, কিছু কালি ও কয়েকখানি চিঠি বিছানার উপর রহিয়াছে। চিঠিগুলি আমাদের দেশের ন্যায় নহে। ইহা লম্বায় প্রায় এক হাত ও চওড়ায় মাত্র দুই ইঞ্চি। ইহা লেখা হইলে পাকাইয়া বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতে হয়। কয়েকখানি হাতে-আঁকা ছবি দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। অন্য একটি কুলুঙ্গিতে কয়েকখানি পুঁথি ও ঘরের কোণে প্রায় দশ জোড়া উৎকৃষ্ট জুতা রহিয়াছে ; তাহার কোন জোড়া জরীর, কোনটি লপেটার ন্যায়, কোনটি নাগরী ধরনের, আবার কোনটি এত ছোট যে, মাত্র ছয় সাত বছরের ছেলের পায়েই লাগে। লামাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা কোন গোৎসুলের (লামা শিশু-শিক্ষানবীশের)। অন্য একটি কুলুঙ্গিতে কতকগুলি পিত্তল ও তামা-নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্তি আছে। তন্মধ্যে সুর-সুন্দরী ও কর্ণপিশাচ সুন্দরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলে তন্ত্রের দেব-দেবী এবং সিদ্ধাইপ্রিয় সাধকের উপাস্য।

আমরা মঠের ত্রিতলের ছাদের উপর উঠিয়া লে উপত্যকার অতুলনীয় সৌন্দর্যরাজি দেখিতে লাগিলাম। স্বামীজী এখানকার দৃশ্যের অনেকগুলি ফটোগ্রাফ লইলেন। দূরে কিয়াং গুম্ফা, লে শহর, স্তোগ গ্রাম, সিন্ধুনদ ও তাহার ৫।৬টি শাখা এবং চারিধারে প্রায় পঞ্চাশ মাইল স্থানব্যাপী উন্মুক্ত উপত্যকার অতি সুন্দর দৃশ্য দর্শকের মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে তুষারধবল হিমালয়

পর্বতমালা। উত্তরে ভারতের শেষ পাহাড় কারাকোরাম বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিতেছে। পূর্ব-দক্ষিণে তুষারমণ্ডিত কৈলাস পর্বতমালার উন্নত শৃঙ্গগুলি যেন শুভ্রকেশরাশি-সুশোভিত-শির কোন এক প্রাচীন ঋষির ন্যায় সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ছাদের কার্নিশে বড় বড় পিপার মতো মণি-চক্র কালো কাপড়ে আবৃত, নিশান ও তাহাতে ভেড়ার শিং, কালো চামর, ত্রিশূল প্রভৃতি টাঙানো রহিয়াছে।

মঠের দ্বিতলে ছোট ছোট কুঠরির ভিতর লামাদের শয়ন-গৃহ। ঘরে সামান্য শয্যা, মণিচক্র, প্রদীপ, পুঁথি প্রভৃতি ব্যতীত বিশেষ কিছুই নাই। ঘরগুলিতে জানালা ও আলো ভাল নাই। বারান্দায় একটি বৃহৎ মণিচক্র রহিয়াছে। এই সময় একটি অশিষ্ট ঘটনা ঘটিল—একজন লামা নিজ কুঠরি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঐ মণিচক্র নিজ কল্যাণে ঘুরাইয়া দিলেন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন, এমন সময় আর একজন লামা অন্য কুঠরি হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উহা থামাইয়া দিলেন ও প্রণাম করত পুনরায় ঘুরাইয়া দিয়া যেই প্রণাম করিতে যাইবেন অমনি পূর্বোক্ত লামা উন্মত্তবৎ আসিয়া উহা থামাইয়া দিয়া পুনরায় ঘুরাইয়া দিলেন ও 'কেন তুমি আমার চক্র থামাইলে' বলিয়া দ্বিতীয় লামাকে একটি ঘুষি মারিলেন। ক্রমে উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া বারান্দায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া একজন বৃদ্ধ লামা বাহির হইয়া আসিয়া উভয়কে ছাড়াইয়া দিলেন ও সকল কথা শুনিয়া উভয়ের নামে চক্রটিকে ঘুরাইয়া দিলেন এবং তাহাতে লামা দুইজন শান্ত হইলেন।

মঠের প্রথম তলে শাকাথুবার বৃহৎ মূর্তি ও পূজার সুবৃহৎ অন্ধকার হল ঘর। ঘরটি পরিপাটিরূপে সাজানো ও ধূপ-গুগ্‌গুলের মধুর সৌরভে আমোদিত। আমরা বুদ্ধদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মন্দিরে পূজার জন্য কিছু অর্থ প্রদানের পর লামাজীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম ও পাহাড়ের নীচে নামিয়া আসিলাম।

এই গুম্ফা হইতে অল্প দূরে কাওচী-গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। উহা বিগত বাল্‌টি যুদ্ধে মুসলমানগণ-কর্তৃক বিনষ্ট হয়। এইস্থান হইতে লে শহর সাড়ে চার মাইল। ক্রমাগত মৃদু চড়াই, সাড়ে চার মাইলে মাত্র এক হাজার ফিট উচ্চে উঠিতে হয়। সমস্ত পথ মাঠের উপর দিয়া গিয়াছে। মধ্যে কোন বাধা নাই, সেইজন্য লে শহরটি সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতে লাগিল। সমস্ত পথ বালুরাশিতে পূর্ণ। স্থানে স্থানে নানাবিধ গাছের সরকারী বাগান। লে-র নিকটবর্তী হইয়া আমরা পথের দুই দিকেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় পাইলাম। এইগুলিকে তেওয়ার পাহাড় বলে। এইস্থানে একটি ঘোড়া পৃষ্ঠ হইতে একজন লামাকে ফেলিয়া দিয়া তীরের মতো ছুটিতে লাগিল। কয়েকজন ইয়ারকান্দি উহাকে ধরিতে ছুটিল। খারাপ ঘোড়া লইয়া এইদিকে পথ চলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। যদি এই দুর্ঘটনা কোন পাহাড়ের উপর ঘটিত তবে নিশ্চয়

আজ সোয়ারীর প্রাণ যাইত। ময়দানের পথ বলিয়া বাঁচিয়া গেল। পথের পাশে একটি সুবৃহৎ মণি-দেওয়াল ও ছর্তেন রহিয়াছে। ইহাই এই প্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্বে বেলা হইয়াছে যে, ইহার দৈর্ঘ্য আট শত পঞ্চাশ পা।

বেলা প্রায় দশটার সময় আমরা লে শহরে[১] আসিয়া পৌঁছিলাম। তহশীলদার মহাশয় আমাদিগের পরিচয়-পত্র দুইখানি দেখিয়া বাসের জন্য উজির মহাশয়ের বাগানবাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনক্রিয়া তহশীলদার মহাশয়ের বাড়ীতেই হইল। একঘণ্টা-কাল বিশ্রামাদির পর শ্রীনগর, লাহোর, বেলুড় মঠ প্রভৃতি স্থানে আমাদের নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর সংবাদ স্বামীজী পত্রের দ্বারা জানাইলেন। রাত্রে ভীষণ শীত পড়িল। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিম্‌নিটি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াও ভাল নিদ্রা হইল না। প্রাতে উঠিয়া দেখি অত্যন্ত তুষারপাত হইতেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে চারিদিক বরফে সাদা হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যেন পৃথিবীর উপর কে একখানি সুবৃহৎ সাদা চাদর বিছাইয়া দিয়াছে। এইপ্রকার বরফ পড়া অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিকে পাহাড় ও গাছগুলির দৃশ্য আরও সুন্দর হইয়াছে। বাংলাদেশে দেখাইবেন বলিয়া স্বামীজী কয়েকটি ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইলেন।

প্রাতঃরাশ সমাপ্ত করিয়া আমরা শহরটি ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। তহশীলদার মহাশয় একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে দিলেন। লোকটি লামা, কিন্তু বেশ হিন্দী বলিতে পারে।

লে শহর একটি বৃহৎ বাজার মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানাস্থানে ইয়ারকান্দি, দার্দ ও পাঞ্জাবী সওদাগরেরা পশুর লোম, সোহাগা, নাম্‌দা, চরস প্রভৃতি কেনা-বেচা করিতেছে। কাশ্মীরের বড় বড় শাল ও আলোয়ানের কারখানাগুলিতে এইস্থান হইতেই পশম যাইয়া থাকে। বাজারে কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য এইরূপ। নাম্‌দা—৩ টাকায় ১ খানি। পশম—দশ আনা হইতে এক টাকা আট আনা সের। লাসা চা—৮ টাকা সের। আলু—ছয় আনা সের। দুধ—আট আনা সের। ইয়ারকান্দি আলু (হাতী শুঁড়)—চার আনা সের। ভেসিলিন—এক কৌটা ছয় আনা। বেকিং পাউডার—এক টাকা চার আনা কৌটা। লামাদের মণিচক্র—দুই টাকায় একটি। কাঠ—চোদ্দ আনা মণ। চাউল—দেড় সের টাকায়। চিনি—এক টাকা চার আনা সের। কেরোসিন তৈল—বারো আনা বোতল। ভেড়া অথবা পাঁঠার মাংস—চোদ্দ আনা সের। খোবানি—দশ আনা সের। ডিম—সাত আনা ডজন। সাদা কাগজ—এক তা দুই পয়সা। চমরী গাইয়ের মাখন—দশ আনা পোয়া। পেঁয়াজ—সাত আনা সের।

দেশীয় ও বিদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। বাজারে বিক্রয়কারীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কোথাও লাদাকী

১। পাঠক মানচিত্রে লে শহরটিকে অক্ষ ৩৪°১০' উত্তর এবং দ্রাঘিমা ৭৭°৪৩' পূর্ব এইস্থানে দেখিতে পাইবেন। শহরটি সমুদ্র হইতে ১১,৫০০ ফিট উচ্চ। ইহা যোজিলা গিরিবর্ত্মের সহিত সমান উচ্চভূমিতে অবস্থিত।

স্ত্রীরা মেটে কলসী করিয়া ছাং সুরা বেচিতেছে, কোথাও বহু স্ত্রীলোক পিঠে ঘাসের বোঝা বাঁধিয়া খরিদ্দারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। বাজারের মধ্যস্থলে একটি ইংরাজী পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস। শ্রীনগর হইতে এই পর্যন্ত ডাক ও তারঘর আছে। ইহার পর আর কোথাও পোষ্ট অফিস নাই।

শীতকালে যখন চারিদিকের পথঘাট বরফে ডুবিয়া থাকে তখন এই বাজার বন্ধ হইয়া যায়। পরে এপ্রিল মাস হইতে বরফ গলা শুরু হইলে সওদাগরেরা পুনরায় আসিতে থাকে। বাজারে রাস্তার দুই ধারেই ঘর। ঘরগুলি কাঁচা ইঁট, পাথর, কাষ্ঠ ও মাটি দিয়া নির্মিত। পাকা ইঁটের বাড়ী খুব কম। সকল বাড়ীর ছাদগুলি দু'ধারে ঢালু। বরফ পড়িলে গড়াইয়া যায়। বাজারটি লম্বায় প্রায় দুই ফার্লং। ইহার প্রবেশের পথে একটি নহবৎখানার ন্যায় তোরণ রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের একটি দাতব্য চিকিৎসালয়।

বাজারের শেষে একটি অল্প উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর প্রাচীন প্রাসাদ, লামাদের মঠ ও অন্যান্য কয়েকটি বাড়ী অবস্থিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এইগুলি সেঙগে নামাজলের কীর্তি। প্রাসাদটি দশতলা উচ্চ। ইহার উপর হইতে শহরের চতুর্দিক অতি সুন্দরভাবে দেখা যায়। মনে হয় যেন কলিকাতার মনুমেন্টের উপরে উঠিয়াছি। শহরের উত্তরে কৈলাস পর্বতমালার চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতগুলি অভ্রভেদী তুঙ্গশিরে দণ্ডায়মান। উচ্চতায় প্রায় ২৮,০০০ ফিট, দক্ষিণে লোহিত পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। ইহার পাথরগুলি সব লাল ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ইহার উচ্চতা ২২,০০০ ফিট। প্রাতঃকালে ইহার উপর সাদা বরফ পড়িয়াছিল, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর ছবির মতো।

প্রাসাদের ভিতরে বড় বড় ঘর, পূর্বে ইহার দেওয়ালে কারুকার্য ও চিত্রাদি অঙ্কিত ছিল, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। সভাগৃহ, মন্ত্রণাগৃহ প্রভৃতি নির্মাণ-কৌশল এইরূপ সুন্দর যে, দেখিলে মনে হয় যেন ইহা সেদিনকার তৈরী। এই প্রাসাদসংলগ্ন যে মঠটি রহিয়াছে উহা বিদেশী আক্রমণকারীদের ও দস্যুদের দ্বারা বহুবার লুণ্ঠিত হইয়া ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে স্কারদূর মুসলমান শাসনকর্তা সর্দার শের আলী ইহার বিগ্রহ ও হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি অগ্নি সংযোগে নষ্ট করিয়া দেন। কাশ্মীরের সেনাপতি জোরোয়ার সিংও বহু দেবমূর্তি ও পুঁথি ধ্বংস করেন। মঠের পাঠাগারের মধ্যস্থলে মেজেতে প্রায় দুই মণ ছিন্ন কাগজ সংগৃহীত রহিয়াছে। এইগুলি প্রাচীন পুঁথিসকলের ছিন্ন পত্র। উহা হইতে একখানি পত্র আমরা লামাজীর নিকট হইতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই দিতে স্বীকার হইলেন না। বলিলেন, উহা তাঁহাদের ধর্মপুস্তকের অংশ। উহা অন্য লোকের হাতে দিতে নাই। এই মঠের দেড়তলা সমান উঁচু মৈত্রেয়-বুদ্ধের প্রতিমূর্তি দেখিবারযোগ্য ; শিল্প সম্বন্ধে ইঁহাদের রুচি কিরূপ তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইঁহারা মনে করেন দেবতার

মূর্তি যত বড় করা যায় তাহা ততই সুন্দর হয়। ঐ মূর্তির গৌরবর্ণ কান্তি, মুখ-চোখের করুণাপূর্ণ ভাব অবশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

এইস্থান হইতে আসিয়া আমরা ডাকবাংলোর সরকারী বাগান, মুসলমানদের কবরভূমি, লামাদের শ্মশান, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের স্বতন্ত্র শবদাহ-স্থান নির্দিষ্ট আছে, বিচারলায় প্রভৃতি দেখিতে গেলাম। বাজারের অল্প দূরে লামাদের পোলো খেলার মাঠ। লামারা প্রত্যহ বৈকালে ঘোড়ায় চড়িয়া এইস্থানে পোলো খেলিতে আসেন। তখন ঘোড়ার চার পায়ের ঘুঙুরের মৃদু-মধুর ধ্বনিতে মাঠটি পূর্ণ হইয়া উঠে। এই মাঠ একটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।

সিমলা পাহাড় হইতে অনেক পাহাড়ী সওদাগর চামড়ার কোট, চামর প্রভৃতি কিনিতে এইস্থানে আসিয়া থাকে। লে হইতে সিমলা পর্যন্ত পথটি চারিশত ত্রিশ মাইল দীর্ঘ। উহা চলিতে বিশেষ কষ্টকর নহে। পাহাড়ীরা য়ুরোপীয়ানদিগকে এই পথে চলিতে দেয় না।

ইয়ারকন্দ এইস্থান হইতে ৪৭৭ মাইল, পথে কারাকোরাম পর্বতে ১৮,২০০ ফিট উচ্চ একটি গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল পাহাড় ও বরফ। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই এই শহর হইতে লইয়া যাইতে হয়। রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু লইতে হয়, নচেৎ পথে তুষারপাত হইলে বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গে জ্বালানি কাষ্ঠও লইতে হয় কারণ পথে কোথাও একটিও গাছ নাই।

লে-তে মোরেভিয়ান মিশনারীদের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় রহিয়াছে, উহাতে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লাদাকী বালক তিব্বতীয় ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষা করে। খাল্‌সার পাদ্রী সাহেব আসিয়া মধ্যে মধ্যে শহরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। বাজারের অল্প দূরে, ডাকবাংলোর নিকট, লে-র ব্রিটিশ জয়েন্ট কমিশনার সাহেবের বাংলো। নিকটেই একটি ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি খোলা মাঠ অবস্থিত।

লাদাকের অধিবাসীরা বেঁটে ও বলবান, ইঁহাদের শরীর স্নানের অভাবে ও পোশাক ধোয়ার অভাবে অত্যন্ত অপরিষ্কার ও উকুনে ভরা। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের মুখই তুরানীয়গণের মতো বৃহৎ ও গোলাকার। সকলেই শ্যামবর্ণ, কেহই ফরসা নহে। পুরুষদের পোশাক গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত একটি লম্বা পশমী পিরান, ইহার বোতাম বা পকেট থাকে না। কোমরে পিরানের উপর চওড়া পশমী পট্টি জড়ানো। তাহার ভিতর ছাগলের লোম, টেকো, ছাতুর নাড়ু, গেঁজে, চাকু, তামাকের কৌটা, শিঙয়ের হুঁকা, ছুঁচ, সুতা, চিরুনি প্রভৃতি রাখা থাকে। কোমরে চক্‌মকি ও পিরানের বুকের ভিতর জলপানের বাটি থাকে। পায়ে কম্বলের বুট জুতা ও গরম পট্টি বাঁধা। মাথায় ইঁহারা ভেড়ার চামড়ার টুপি ব্যবহার করেন। অনেকে গায়ে ভেড়ার লোমযুক্ত চামড়ার কোট গায়ে দেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই ইঁহাদের এই একই প্রকার

পোশাক। শীতকালে পথে বাহির হইতে হইলে ইঁহারা গায়ের উপর এতগুলি কাঁথা, কম্বল, লেপ প্রভৃতি চাপান যে, দেখিলে মনে হয় যেন একটি সচল বিছানা। সকলেরই মাথায় লম্বা চুল বিনানো দীর্ঘ টিকি আছে। স্ত্রীলোকদের পোশাকও এই একই প্রকার, কেবল তাঁহারা পিঠে একখানি সম্পূর্ণ ভেড়ার চামড়া, কানের দুই ধারে খোঁপার সহিত দুইখানি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাথার মধ্যস্থলে নীল, লাল, ফিরোজা প্রভৃতি নানা বর্ণের মূল্যবান পাথরগাঁথা একখানি লম্বা চামড়া বাঁধিয়া রাখেন। ইঁহারা জুতা পরেন, কিন্তু টুপি পরেন না।

লাদাকীরা সকলেই কৃষিজীবী। যব, ত্রম্বা, গ্রীম (একপ্রকার পাহাড়ী যব), মূলা, আলু, খোবানী প্রভৃতি এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য। চমরী ও সাধারণ গাই-এর মিশ্রণে উৎপন্ন ঝো নামক একপ্রকার বলদের সাহায্যে চাষের কার্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থেরই চমরী গাই, ছাগল ও ভেড়ার পাল আছে। পাহাড়ে অনেক জঙ্গলী ছাগল, ভেড়া, সাপু, আমন, কুরেল, হরিণ, দুই-তিন প্রকার বারশিঙ্গা, খরগোস, সাদা নেকড়ে বাঘ এবং লাল ভল্লুক আছে।

দুই-একজন ধনী ব্যক্তি ও মঠের লামারা ব্যতীত এখানে সাধারণ লোকে লিখিতে ও পড়িতে জানে না। ইহাদের আহার সাধারণতঃ মাংসের যুষ, যবের মণ্ড, ছাতু, ঘোল, দুধ, চা (দুধ-চিনি বর্জিত ও নুন-মাখন সংযুক্ত), ছাং সুরা ও যবের পিঠার মতো রুটি।

ইহারা সন্তুষ্টচিত্ত, কষ্টসহিষ্ণু, অলস ও শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু মুসলমানগণ প্রতিহিংসাপরায়ণ। সামাজিক বন্ধন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অতি সামান্য এবং সকলেই খুব পরিশ্রমী। ধনী লোক ব্যতীত সকল পরিবারেই স্ত্রীলোকের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত। প্রত্যেক পরিবারে সকল ভ্রাতারা মিলিয়া একটি বালিকাকে বিবাহ করে।

তিব্বতীয় ভাষায় ইহারা নিজেদের দেশকে পো বলে। তিব্বা শব্দে টিপি ও সময় সময় ছোট পাহাড়কে বুঝায়। ইহা হইতে এই প্রদেশের নাম তিব্বত হইয়াছে।

পরদিন শহরের নিকটেই চুবি নামক গ্রামে নামজাল সীমো নামক পর্বতের উপরিস্থিত মঠটি দেখিয়া আসিলাম। উহা অতিশয় পুরাতন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রাসী নামজাল উহা নির্মাণ করান।

লে-তে চার দিন অবস্থান করিবার পর আমরা হিমিস্ গুম্ফা দেখিতে গেলাম। পথটি বরাবর সিন্ধুনদের উপত্যকার মধ্য দিয়া গিয়াছে। স্থানটি লে হইতে চব্বিশ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। পথে কোন পাহাড় নাই। নিকটেই স্তোগ গ্রামখানি রহিয়াছে। লাদাকের রাজবংশের শেষ বংশধর জ্গিসমেদ নামজালের পৌত্র শ্রীসেদনাম নামজাল কাশ্মীররাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হইতে এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইনি যে এই প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজা, এখন তাহার কোন

চিহ্ন বর্তমান নাই। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। যে পাঁচশত টাকা তিনি কাশ্মীর মহারাজার নিকট হইতে প্রতি বৎসর পাইয়া থাকেন তাহা সকল ব্যয় করিয়া প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করিয়া ফেলিয়াছেন। হিমিস গুম্ফার মোহন্তজী ইঁহার বর্তমান সম্পত্তি সকল লিখিয়া লইয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ঐ টাকা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন না তিনি ঐ টাকা সুদ-সমেত তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে লাভ করিবেন ততদিন তিনি সম্পত্তি ভোগ করিবেন। তিনি এখনও ঋণ গ্রহণের বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। সম্প্রতি আশী টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি মহারাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ীতে সর্বদা লাদাকীয় স্ত্রীলোকেরা নৃত্য ও গীতবাদ্য করিতে আসে, যখন কোন দূরদেশ হইতে কোন গায়িকা বা নর্তকী আসিয়া থাকে তখন ইনি তহশীলদার মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিয়া নৃত্য দেখিতে লইয়া যান।

যে প্রাসাদটিতে তিনি বাস করেন তাহা একটি নাতি-উচ্চ পর্বতের গায়ে নির্মিত। বাটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালাগুলি দূর হইতে ঠিক বড় বড় পায়রার খোপের মতো দেখায়। ঐ প্রাচীন প্রাসাদটি সেপাল দানদ্রুব নামজাল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করেন।

গ্রামখানির আয়তন অতি ক্ষুদ্র। ইহার লোকসংখ্যা শতাধিক হইবে। ইহার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে সিন্ধুনদ প্রবলবেগে কলরোলে প্রবাহিত হইতেছে। বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও সিন্ধুতীরে অবস্থিত শস্যক্ষেত্র, কোথাও বাগান প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। পথ বালুকাময়। মাঠের মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিপির ন্যায় পাহাড়ের মাথার উপর সন্ন্যাসী লামাদের গুম্ফা। সিন্ধুনদের পরপারে পাহাড়ের গা বাহিয়া আর একটি পথ রহিয়াছে, উহা দিয়াও লে হইতে হিমিস যাওয়া যায়। ফিরিবার সময় আমরা ঐ পথে আসিব ঠিক করিলাম। মাঠের পথটি বেশ সমতল তাই শীঘ্র শীঘ্র চলা যায়। আমরা বেলা আন্দাজ তিনটার সময় হিমিস্ গ্রামের নিকটবর্তী হইলাম। গ্রামটি সিন্ধুর অপর পারে পাহাড়ের তলায় অবস্থিত। হিমিস্ মঠ সিন্ধুর এই পাড়ে একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পথ হইতে গুম্ফাটি দেখা যায় না এবং উহার অস্তিত্বও অনভিজ্ঞদের নিকট হঠাৎ ধরা পড়ে না। কোন কোন মঠ এইরূপ গুপ্তস্থানে অবস্থিত হওয়াতে ডোগ্রা সেনাপতি জোরোয়ারের হস্ত হইতে অনেক সময় বাঁচিয়া গিয়াছে। সিন্ধুতীর ছাড়িয়া আমরা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কত শস্যক্ষেত্র, কত গৃহ দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই মাইল পথ যাইয়া উপত্যকার শেষ পাহাড়ের গায়ে ও পাদদেশে অনেকগুলি বড় বড় পায়রার খোপের ন্যায় গৃহ দেখিতে পাইলাম। উহাই বিখ্যাত হিমিস্ মঠ। প্রায় ১১,০০০ ফিট উচ্চ। এই মঠের বিস্তর ভূ-সম্পত্তি আছে। নিকটেই একটি শস্যক্ষেত্রে চৌদ্দ- পনেরো জন লামা যব কাটিতে কাটিতে সমস্বরে গান গাহিতেছিল। আমরা

তাহাদের নিকট হইতে মঠে যাইবার নিয়ম জানিয়া লইলাম। একজন লামা মঠের মোহন্তজীকে সংবাদ দিতে গেল। পথের বাম পার্শ্বে খাদ ও তাহার পরপারে অনেকগুলি শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহস্থ লাদাকীদিগের বাড়ী, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দেবমন্দির রহিয়াছে; কোথাও অনেকগুলি দেবতার মন্দির একত্রে রহিয়াছে, সেগুলিতে বিষ্ণু, বুদ্ধদেব, যমরাজ প্রভৃতি মূর্তি প্রস্তরের উপর খোদিত ও নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মঠের নিকটেই অধিকাংশ গ্রামবাসীর গৃহ। কত বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, লামা, কেহ রাস্তায় আসিয়া, কেহ ঘরের ঘুলঘুলি দিয়া, কেহ ছাদের উপর হইতে আমাদিগকে কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিল। গৃহস্থদের বড় বড় কুকুরগুলি ভেউ ভেউ শব্দে আমাদিগের কান ঝালাপালা করিয়া তুলিল। মঠের প্রকাণ্ড ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিতেই আমাদিগকে ঘোড়া হইতে নামিতে হইল, কারণ ভিতরে ঘোড়া যাইবার নিয়ম নাই। পথে একটি বৃহৎ মণিচক্র রহিয়াছে। আচ্ছাদিত পাকা রাস্তা দিয়া কিছুদূর যাইয়া ৩০ × ৪০ গজ লম্বা-চওড়া একটি উঠানে উপস্থিত হইলাম। তৎপর একটি সুবৃহৎ মহল্লা পার হইয়া আমরা মঠের অতিথিশালায় আসিয়া পৌঁছিলাম। লামারা আসিয়া সেখানকার দরজার তালা খুলিয়া দিলেন। অতিথিশালার একদিকের অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। লামারা অনেকগুলি পর্দা, শতরঞ্চি প্রভৃতি আনিয়া উহা আবৃত করিয়া দিলেন। আমরা ঘরে আমাদের শয্যাদি যথাযথ স্থানে রাখিয়া অন্যান্য মালপত্র খুলিতে লাগিলাম। লামারা দুধ, ডিম, কেরোসিন তৈল, কাষ্ঠ, মাখন প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন ও আমাদের রন্ধনাদির যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। লামাগণ সর্বদাই আগ্রহের সহিত আমাদের যাহাতে কোন বিষয়ে অসুবিধা না হয় তাহা করিতে লাগিলেন। রাত্রে ভয়ানক শীত পড়িল। ঘরে প্রাইমাস্ স্টোভটি জ্বালিয়া রাখিয়া আগুনের মৃদু তাপে কোনপ্রকারে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ হিমিস্ গুম্ফা ॥

স্বামীজী প্রাতঃকালে লামাদের সহিত মঠটি দেখিতে গেলেন এবং প্রধান লামার অফিস-ঘরে যাইয়া বসিলেন।[১] লামাগণ একখানি বৃহৎ খাতা ('ভিজিটরস্ বুক') আনিয়া আমাদের নাম-ধাম লিখিয়া লইলেন। স্বামীজী ইংরেজি ভাষায় "স্বামী অভেদানন্দ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অব দি রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, নীয়ার ক্যালকাটা" লিখিয়া স্বাক্ষর করিলেন।[২] কৌতূহলের বশে স্বামীজী খাতাখানির সমস্ত নাম আগাগোড়া পড়িলেন, কিন্তু একটিও বাঙ্গালীর নাম দেখিতে পাইলেন না। ঘরটি বড়। মেজেতে মাড়োয়ারিদের ন্যায় ঢালা বিছানা। অনেকগুলি কেরানী লামা চিঠিপত্র ও হিসাব লিখিতেছেন। মঠের সম্মুখস্থ প্রধান ঠাকুর-ঘর ও দরদালান তখন মেরামত করা হইতেছিল। প্রায় তিরিশ জন তিব্বতী মজুর ও রাজমিস্ত্রী কাজ করিতেছে। মাটি, পাথর ও কাষ্ঠ দিয়া মেরামতের কাজ চলিতেছে। অনেক বালক-বালিকা ও লামা স্ত্রীলোক রাজমিস্ত্রীদের যোগাড়ের কাজ করিতেছে। প্রধান মিস্ত্রী স্বামীজীকে ধরিয়া বসিল, মজুরদিগকে কিছু বক্‌শিস দিতে হইবে, স্বামীজী তাহাদিগকে কিছু অর্থ দিলেন। মজুররা বক্‌শিস পাইয়া আনন্দে দুর্বোধ্য তিব্বতী ভাষায় ও পাহাড়ী সুরে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শুনিলাম কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মহরাজা প্রতাপ সিং এই সংস্কার কার্যের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। পাঞ্জাবের প্রতাপ সিং যখন এই প্রদেশ আক্রমণ করেন তখন এই মঠের মোহন্তজী কাশ্মীররাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ও তাঁহার যাবতীয় সৈন্যকে ছয় মাসের খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থান দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাহাতেই এই মঠটি কাশ্মীরের রাজবংশের সহিত চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মঠের নানাস্থানে নানারকম মণিচক্র স্থাপিত আছে। কোথাও বৃহৎ মণিচক্রটি ঝরণার জলের চাপে আপনি ঘুরিতেছে ও উহার সহিত সংযুক্ত একটি ঘণ্টা আপনা-আপনি বাজিতেছে। কোথাও ছোট ছোট ঢোলের মতো মণিচক্রগুলি লাইনবন্দীভবনে সাজানো রহিয়াছে। প্রায় দশ-বারোটি ঘরে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি রহিয়াছে। এই প্রকারের দেবদেবীর মূর্তি ইতিপূর্বে আমরা

১। বত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) বরাহনগর মঠ হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী-শিষ্য পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ এই গুহা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

২। সে সময়ে স্বামী অভেদানন্দ (১৯২১—১৯২৪ খ্রীঃ) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
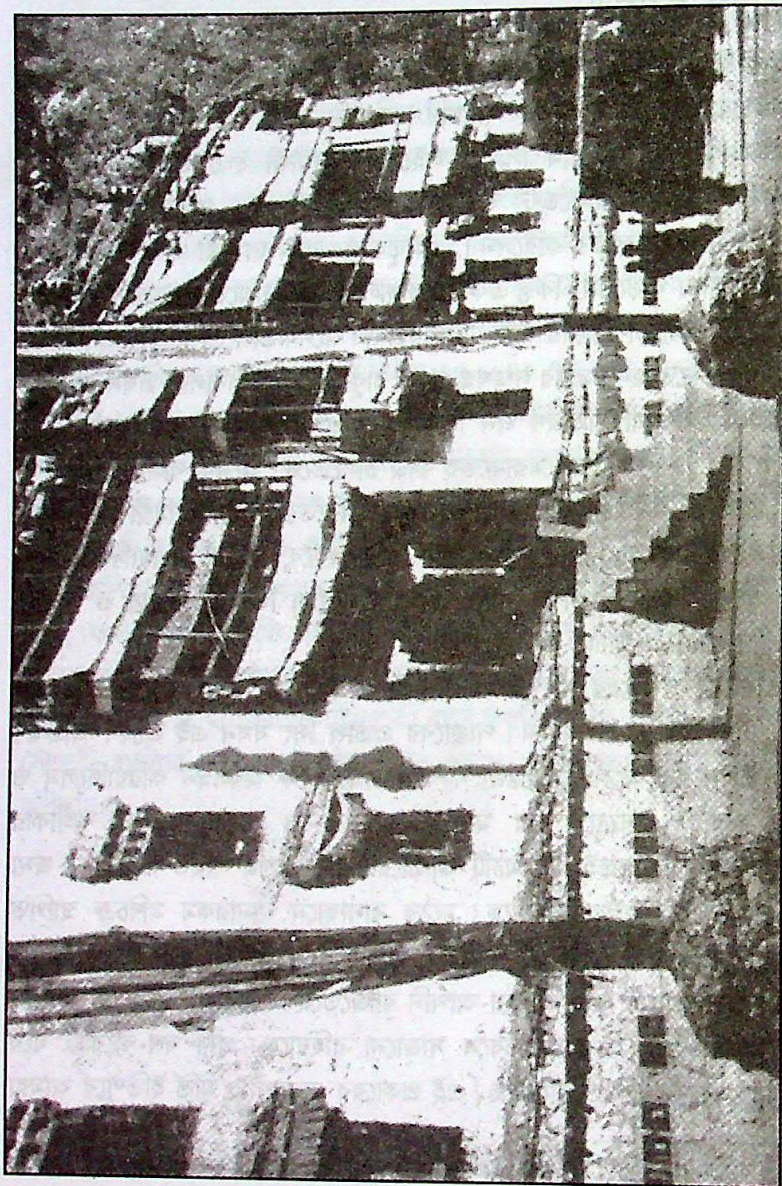
হিমিস্ গুম্ফা, লাদাক

অন্যান্য মঠে দেখিয়াছি ও বর্ণনা করিয়াছি। একটি অন্ধকার ঘরে স্তাগ-সাঙ্গ-রম-চেন নামক লামা-গুরুর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে। উহার দিব্য কান্তি, উন্নত দেহ ও প্রশস্ত ললাট—বীরত্বব্যঞ্জক। ইনিই এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইঁহাকে অনেকে 'ব্যাঘ্র লামা' বলিয়া থাকেন। অধিকাংশ মূর্তিই সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। অন্যান্য ধাতু নির্মিত মূর্তি এইস্থানে খুব কমই আছে। যে কয়েকটি 'মনে' বা স্তূপ রহিয়াছে তাহা আগাগোড়া রূপার তৈরী ও মধ্যে নানাবিধ মূল্যবান পাথর ও সোনার কারুকার্য করা। মূর্তিগুলির দেহের অলঙ্কার সোনা ও মূল্যবান পাথরে নির্মিত। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে বালা ও অনন্ত, গলায় হাঁসুলি ও দড়াহার এবং মাথায় সোনার শিরস্ত্রাণই প্রধান। একটি দেবীমূর্তি রহিয়াছে, এরূপ মূর্তি ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখি নাই, ইহা মন্দরা বা কুমারী দেবীর। ইনি পদ্মসম্ভবের (গুরু রিন্ পোচের) পত্নী ও শান্তি রক্ষিতের[৩] ভগ্নী। ইনি স্বামীর সহিত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে উত্তর ভারতের উদ্যান নামক স্থান হইতে ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে মহাযান বৌদ্ধমত প্রচার করিতেন। সাং যে, চিং ফুগ প্রভৃতি মঠে ইঁহাদের মূর্তি প্রত্যহ ভক্তিভরে পূজা হইয়া থাকে। লামারা পদ্মসম্ভবকে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া থাকেন।

হিমিস্ মঠে প্রায় দেড়শত দুগ্-পা সম্প্রদায়ের গ্যে-লোং বা ভিক্ষু বাস করেন। ইঁহাদের টুপি লাল রঙের। প্রত্যেকের ঘর স্বতন্ত্র। ছাদের উপরের ঘরে খাঙ্পো বা মঠাধ্যক্ষ বাস করেন। মঠাধ্যক্ষ অল্প ইংরাজী ও হিন্দী জানেন। আমাদের যিনি তত্ত্বাবধান করিতেছেন তিনি ছাড়া অন্যান্য লামারা কেহই তিব্বতী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না। লে হইতে একজন দক্ষ দোভাষী সঙ্গে না আনিলে এখানে কথাবার্তা কহিতে আমাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইত।

প্রায় পাঁচ বিঘা জমি লইয়া মঠটি অবস্থিত। মঠের পূর্বদিক ব্যতীত সকল দিকেই উচ্চ পাহাড়। কতক অংশ পাহাড়ের গায়ের সহিত সংযুক্ত। এই মঠটির অধীনে অনেকগুলি ছোট-বড় মঠ, গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র আছে। মঠের কুশাক (মোহন্ত) মহাশয়ের অসংখ্য গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্ত আছেন। তিনি বৎসরে একবার সকল শিষ্যের বাড়ী গমন করেন ও বহু অর্থ প্রণামীস্বরূপ পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কাহারও কোন ব্যারাম হইলে বা প্রেতাত্মার ভর হইলে ইনি যাইয়া উহাকে দেখিয়া আসেন, তাহা হইতেও যথেষ্ট পারিশ্রমিক উপার্জন করেন। তাঁহার এই আয় হইতেই মঠের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্বে ডক্টর নিকোলাস নটোভিচ নামক একজন রুশ দেশীয় পর্যটক তিব্বত প্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এই গুম্ফার নিকট একটি পাহাড় হইতে পড়িয়া

৩। ইঁহার লিখিত বিখ্যাত 'তত্ত্ব-সংগ্রহ' গ্রন্থ সম্প্রতি বরোদা রাজ্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গিয়া একটি পা ভাঙিয়া ফেলেন, পরে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে এই মঠের অতিথিশালায় লইয়া আসেন ও লামারা সেবা-শুশ্রূষা করিয়া দেড়মাস পরে তাঁহাকে আরোগ্য করেন। সেই সময় তিনি একটি লামার নিকট হইতে খবর পান যে, যীশুখ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছিলেন ও সেই বিষয়টি মঠের পাঠাগারে অবস্থিত একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথিতে বর্ণিত আছে। তিনি উহা জনৈক লামার দ্বারা আনাইয়া দেখেন ও উহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া লন। পরে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি 'দি আন্‌নোন লাইফ অফ জিসাস্' (যীশুর অপ্রকাশিত জীবনী) নামক একখানি পুস্তক লেখেন। তিনি এই পুস্তকে উক্ত বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেন। স্বামীজী এই পুস্তক আমেরিকায় অবস্থানকালে পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহিত হন এবং তাঁহার বর্ণনা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমিস্ মঠ স্বচক্ষে দেখিতে আসেন। স্বামীজী এই মঠের লামাদের নিকট সন্ধান করিয়া জানিলেন যে ঐ বিষয়টি সত্য। ঐ বিষয়টি যে পুস্তকে লিখিত রহিয়াছে তাহা স্বামীজী দেখিতে চাহিলেন।

যে লামা স্বামীজীকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি একখানি পুঁথি তাক হইতে পাড়িয়া স্বামীজীকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, এইখানি আসল পুঁথির নকল। আসল পুঁথিখানি লাসার নিকটবর্তী মারবুর নামক স্থানের মঠে আছে। উহা পালি ভাষায় লিখিত, কিন্তু এইখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। ইহা চৌদ্দটি পরিচ্ছেদ এবং ২২৪টি শ্লোকযুক্ত। স্বামীজী তাঁহার সাহায্যে ইহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া লইলেন।

যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়া কি কি করিয়াছিলেন, মাত্র তাহাই উক্ত পুঁথি হইতে এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।[৪]

* * * *

১০। "ক্রমে ঈশা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বয়সে ইস্রায়েলীরা জাতীয় প্রথানুযায়ী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাঁহার পিতামাতা সামান্য গৃহস্থের ন্যায় দিন যাপন করিতেন।"

১১। "তাঁহাদের সেই দরিদ্র কুটির, ক্রমে ধনী ও কুলীনগণের দ্বারা মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই ঈশাকে নিজ নিজ জামাতৃপদে বরণ করিতে উৎসুক হইলেন।"

১২। "ঈশা বিবাহ করিতে নারাজ ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেই বিধাতৃ-পুরুষের স্বরূপ ব্যাখ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তিনি গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।"

৪। যে মূল পুঁথির তথ্যাবলী অবলম্বনে নিকোলাস নটোভিচ 'যীশুর অপ্রকাশিত জীবনী' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখিয়াছিলেন—সেই পুঁথি হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রধান প্রধান তথ্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হইল।

১৩। "তখন তাঁহার মনের মধ্যে এই বাসনা প্রবল ছিল যে, তিনি ভগবৎ সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিবেন এবং যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট ধর্মশিক্ষা করিবেন।"

১৪। "তিনি জেরুজালেম পরিত্যাগ করিয়া একদল সওদাগরের সঙ্গে সিন্ধুদেশ অভিমুখে রওনা হইলেন। উহারা সেখান হইতে মাল লইয়া যাইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী করিত।"

॥ ৫ ॥

১। "তিনি (যীশু) চৌদ্দ বৎসর বয়সে উত্তর সিন্ধুদেশ অতিক্রম করতঃ পবিত্র আর্যভূমিতে আগমন করিলেন।" * *

২। "পঞ্চনদ প্রদেশ দিয়া যখন তিনি একাকী যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সৌম্যমূর্তি, প্রশান্ত বদন ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভক্ত জৈনরা তাঁহাকে ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।"

৩। "এবং তাঁহাকে তাঁহাদের মঠে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কারণ সেইকালে কাহারও যত্ন তিনি পছন্দ করিতেন না।"

৪। "তিনি ক্রমে ব্যাস-কৃষ্ণের লীলাভূমি জগন্নাথধামে উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন। তিনি সকলের প্রিয় হইলেন এবং সেখানে বেদ পাঠ করিতে, বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন।"

* * * *

"—অতঃপর তিনি রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তু যাত্রা করিলেন।"

"—সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত ছয় বৎসর থাকিয়া পালি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রসকল অধ্যায়ন করিতে লাগিলেন।" * *

"সেখান হইতে তিনি নেপাল এবং হিমালয় * * পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন।" * *

"—ক্রমে তিনি জরথুষ্ট্র মতাবলম্বী পারস্য দেশে[৫] আসিয়া উপনীত হইলেন।" * *

"—* * শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।" * *

৫। এই সময় কাবুলের নিকট আসিয়া যীশু পথিপার্শ্বস্থ একটি পুষ্করিণীতে হাত-মুখ ধুইয়াছিলেন ও সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখনও ঐ জলাশয়টি বিদ্যমান আছে। উহাকে 'ঈশা তালাও' বলে। ঐ উপলক্ষে ঐ স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। 'তারিখ-ই-আঝাম' নামক আরবী গ্রন্থে এই বিষয়টি বর্ণিত আছে।

"এইরূপে তিনি ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অত্যাচার-প্রপীড়িত স্বজনগণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।"

লামাজী বলিলেন, যীশুখ্রীষ্ট পুনরুত্থানের (রিজারেক্সন) পর গোপনে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন এবং বহু শিষ্য সমাবৃত হইয়া মঠ-বাস করিয়াছিলেন।[৬] তাঁহাকে উচ্চ অবস্থার সাধু জানিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। সেই সময় যে সকল তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেখিয়াছিল এবং যে সকল সওদাগর তাঁহাকে তাঁহার দেশের রাজা কর্তৃক ক্রুশে বিদ্ধ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে শুনিয়া আসল পুঁথিখানি তাঁহার দেহত্যাগের ৩।৪ বৎসর পরে পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্টের ভারতাগমন সম্বন্ধে নানা স্থানে যেসকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত দৃষ্ট হয়, সেইগুলি সমস্ত একত্রিত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিলে তাহা যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিখ্যাত মনীষী ও রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৩৩৩ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'সত্তর বৎসর' নামক আত্মজীবনচরিত বিষয় প্রবন্ধে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখ হইতে শ্রুত বলিয়া নাথ যোগীদিগের সহিত মহামানব যীশুখ্রীষ্টের যোগ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একবার একদল যোগী-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লী পর্বতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের যোগীদের 'নাথ' উপাধি ছিল। ইঁহারা 'নাথযোগী' বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্তকদিগের মধ্যে 'ঈশাই নাথ' নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনী এই নাথযোগীদের ধর্মপুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথযোগী তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ হইতে ঈশাই নাথের জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। খ্রীষ্টানদের বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত যেভাবে পাওয়া যায়, ঈশাই নাথের জীবনচরিত মোটের উপর তাহাই।"

ইহার উপরে বিপিনবাবু এইরূপ মন্তব্য করেন ঃ "বাইবেলে যীশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত এই আঠারো বৎসরের যীশুর জীবনের কোন খোঁজ-খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ের মধ্যে যীশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই নাথযোগী সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ।"

৬। খানাইয়ারীতে যীশুখ্রীষ্টের কবর অদ্যাপি বর্তমান আছে। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী স্বর্গীয় রামতীর্থও নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

খ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনে এসিনী[৭] নামে এক সম্প্রদায়, যীশুখ্রীষ্টের পূর্বেই বর্তমান ছিল। ইহারা নাথ-যোগীদেরই ন্যায় যোগী সম্প্রদায় ছিল এবং যীশু এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে একজন পুরাতত্ত্ববিদ্ মনীষী আর্থার লিলি তাঁহার 'ইণ্ডিয়া ইন্ প্রিমিটিভ্ ক্রিষ্টিয়ানিটি' পুস্তকে (২০০ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ঃ "যীশু একজন এসিনী ছিলেন এবং ভারতীয় যোগীদের ন্যায় নিভৃত স্থানে ব্রহ্মের সহিত একত্ববোধ এবং পরমাত্মার আশীর্বাদ লাভের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।"

এই এসিনী নামের মূল, আমাদের নিকট ভারতীয় 'ঈশান' নাম বলিয়াই বোধ হয়। 'ঈশান' শিবেরই অন্যতম নাম, শিবই বিশেষভাবে যোগের দেবতা। এসিনী নামটি তাহা হইলে ঈশান বা শিবের উপাসক অর্থে 'ঈশানী' নামেরই রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। ঈশও শিবের বিশেষ নাম। 'ঈশাই নাথ' নামও ঈশের বা শিবের উপাসক অর্থই প্রকাশ করে। 'নাথ' শব্দটি পৃথকভাবে শিবেরও স্বরূপ জ্ঞাপক। যোগী-সম্প্রদায় নাথ বা শিবের উপাসক বলিয়াই নাথ নামের যোগের দ্বারা নাথযোগী বলিয়া অভিহিত হইত। যীশুখ্রীষ্ট সম্ভবতঃ নাথযোগী সম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, উপাস্য দেবতার নামে ঈশাই নাথ[৮] আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্যালেষ্টাইনে ঈশানী যোগী সম্প্রদায় থাকিলেও সেই সম্প্রদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপ শিক্ষার জন্য যীশুখ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবত নহে।[৯] 'ঈশ' শব্দের অর্থ প্রভু, ঈশ্বর, নাথ শব্দেরও অর্থ প্রভু। ইহাতে যীশু যে, ঈশ্বরকে 'লর্ড বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিজেও তাঁহার ভক্তবৃন্দ কর্তৃক 'লর্ড' নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়।

এই হিমিস্ মঠে জুলাই মাসের শেষে একটি খুব বড় মেলা হয়। উহাতে নানা স্থান হইতে সিদ্ধ ও যোগবলসম্পন্ন লামারা আসিয়া অষ্টসিদ্ধির নানাবিধ শক্তি ও

৭। এসিনীদের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'ভারতীয় সংস্কৃতি' (ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার্ পিপল্'-এর বঙ্গানুবাদ) পুস্তকে ব্যাপকভাবে প্রামাণ্য তথ্য সহকারে আলোচনা করা হইয়াছে।

৮। মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্রে, যীশু, ঈশা নামে পরিচিত। নাথ যোগীদিগের ঈশাই নাম হইতেই যে এই নাম পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। ঈশা নামের সঙ্গে মেসায়ার অপভ্রংশ 'মসি' নাম যুক্ত হইয়া মুসমলানদিগের মধ্যে যীশুর পুরা নাম 'ঈশা-মসি' হইয়াছে।

ভবিষ্য-পুরাণে যীশুর এই নামটি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ

"ঈশমূর্তির্হৃদি প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবঙ্করী
ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্।।"

৯। ফরাসী মনীষী আর্নষ্ট রেনাঁ লিখিয়াছেন ঃ "যে এসিনীগণ ইহুদী যুবকদের শিক্ষাদান করিতেন তাঁহারা সংসারত্যাগী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রবর্তিত গুরুদের সহিত তাঁহাদের সাদৃশ্য ছিল। এই ব্যাপারে কি ভারতীয় মুনিদের আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিল না?"—স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'ভারতীয় সংস্কৃতি'।

রেনাঁ যীশুখ্রীষ্টের একজন প্রামাণ্য জীবনীলেখক। সুতরাং তাঁহার অনুমানটি অসঙ্গত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

ভূতপ্রেত বশীকরণবিদ্যা দেখাইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ নাচ, গান, তামাসাও হইয়া থাকে। অসংখ্য দর্শক এই সময় এই মঠে সমবেত হয়। কাশ্মীর হইতে এই সময় এইস্থানে আসা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সকল পথ বরফে আবৃত হইয়া থাকে। স্যার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাস্ব্যাণ্ড নামক কাশ্মীরের ভূতপূর্ব কমিশনার কয়েক বৎসর পূর্বে এই মেলা দেখিবার জন্য এই স্থানে আসিয়াছিলেন।[১০] মঠের বড় হল ঘরে ও উঠানে শত শত ব্যক্তির বসিবার স্থান অনায়াসে হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরাগুলিতে আলো ভাল নাই। দেওয়াল ও ছাদ ইঁটের হইলেও মেজেগুলি মাটি দিয়া প্রস্তুত, তাই স্যাঁৎসেতে। মঠের বৃহৎ রন্ধনশালাতে চারটি বড় বড় উনানে রন্ধন হইতেছে। রান্নাঘরের অভ্যন্তর ঝুলে ও ধোঁয়ায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও জানালা কম থাকাতে আলোও ভাল নাই। উপরে ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য কিরণবাতায়ন বা স্কাই-লাইট ও চিমনী আছে।

এই অতিথিশালাতে লে-র জয়েন্ট কমিশনার সাহেব কয়েকদিন পূর্বে আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এইস্থানে খুব হাওয়া ও ঠাণ্ডা লাগিতেছিল বলিয়া মোহন্তজী মঠের দ্বিতলে অন্য একটি ঘরে আমাদের বাসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

যে কয়দিন এইস্থানে রহিলাম লামাদের যত্নে ও মনোহর দৃশ্যে আমরা অতি আনন্দে কাটাইতে লাগিলাম। লামারা সর্বদাই আমাদের ঘরে আসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। স্বামীজী কখনও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, স্বামী বিবেকানন্দের কথা, (১৯১৪—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের য়ুরোপের) মহাসমরের কথা, কখনও মহাত্মা গান্ধী ও দেশের অন্যান্য কথা তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি, মন্ত্র ও নানাবিধ ধর্মমত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিলেন। মোহন্তজী স্বামীজীকে একটি উৎকৃষ্ট কুশাক লামার টুপি উপহার দিলেন এবং তাঁহার কাষ্ঠের জিনে বসিতে কষ্ট হয় শুনিয়া একটি চামড়ার জিন প্রদান করিলেন। হিমিস্ গুম্ফার নানাস্থানের অনেকগুলি ফটো তুলিয়া ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা পুনরায় লে-তে ফিরিলাম।

এইবারে আমরা সিন্ধুনদের পরপারস্থিত পাহাড়ের গা বাহিয়া লে যাইবার যে পথ আছে তাহা দিয়া যাইব, অতএব যে পথে আসিয়াছিলাম তাহা দিয়া না যাইয়া অন্য একটি পথ ধরিয়া বরাবর সিন্ধুতীরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সিন্ধুর উপর একটি সুন্দর ঝুলানো সেতু রহিয়াছে। পরপারে হিমিস্ গ্রাম। আমরা সেতুটি পার হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম এবং কখনও পাহাড়ের গা বাহিয়া কখনও উহার

১০। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাস্ব্যাণ্ড একটি বৃহদাকার গ্রন্থে তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। কলিকাতায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চতুর্থ সম্মেলন-সভায় ইনি একজন বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন।

পাদদেশের নদী ও খালের ধার দিয়া যাইয়া লে-র মধ্যপথে গোলাপবাগ নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্থানটিতে সুন্দর স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। নিকটে কমিশনার সাহেবের একটি ডাকবাংলো রহিয়াছে। অনেকে এইস্থানে তাঁবু খাটাইয়া বাস করেন। কাছেই কয়েকটি লামাদের বাড়ী রহিয়াছে। এইস্থানটি লে শহর ও হিমিস্ হইতে বারো মাইল। ইহার পর পথ বরাবর বাগান, শস্যক্ষেত্র ও গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। অল্প দূরে একটি বৃহৎ গ্রামের নিকট শে গুম্ফার অতি সুন্দর দৃশ্য বহুদূর হইতে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শে গ্রামখানি খুব বড়। পূর্বে এইস্থানেই পশ্চিম তিব্বতের রাজধানী ছিল। পরে লে-তে রাজধানী উঠিয়া যায়। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই শত। চারিদিকে ঘন বন অবস্থিত। লামাদের বাড়ী মাটি ও পাথরের নির্মিত।

চমরী গাইগুলি দড়ি দিয়া খোঁটায় বাঁধা রহিয়াছে। কোথাও লামা স্ত্রীরা শস্য হইতে তুঁষ ঝাড়িতেছে। গ্রামের সকলেই আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। শে গ্রামের গুম্ফাটি দিলদান নামজালের কীর্তি। নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তথায় অতি উচ্চ পাহাড়ের উপরে নির্মিত আর একটি গুম্ফা রহিয়াছে। এই উভয় গুম্ফাতেই প্রায় দুই তলা সমান উচ্চ মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্তি আছে। নিকটে পাহাড়ের গায়ে শাকাথুবার (শাক্য স্থবির) অতি বৃহৎ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। কোথাও বড় বড় পাথরের গায়ে বৃহৎ অক্ষরে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" লেখা রহিয়াছে। এই স্থান হইতে পথ বরাবর সিন্ধুনদের তীরে তীরে গিয়াছে। ক্রমে আমরা পুনরায় লে শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই সময় অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল ও সর্বদাই তুষার বৃষ্টি হইতেছিল। তাই লে-তে চারিদিন বিশ্রাম করিয়াই আমরা কাশ্মীর যাত্রা করিলাম ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে পুনরায় গন্ধরবল ঘাটে আমাদের হাউসবোটে ফিরিয়া আসিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না। তবে প্রত্যেক দিনই তুষারপাত হইতে লাগিল। পথ-প্রদর্শক, ঘোড়াওয়ালা, কুলি ও গন্ধরবলের চৌকিদার, যে রাত্রে আমাদের বোট পাহারা দিত প্রভৃতিকে যথাযথ পারিশ্রমিক ও পুরস্কারসহ বিদায় দিয়া আমরা হাউস-বোট লইয়া শ্রীনগর যাত্রা করিলাম।

শ্রীনগরে একসপ্তাহকাল বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার মানসে স্বামীজী লালমণ্ডি ঘাটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একদিন স্বামীজী পাম্পুর নামক জাফ্রানের ক্ষেত্রের মনোহর দৃশ্যের কথা শুনিয়া ঐ স্থান দেখিতে গেলেন। বরাবর টাঙ্গা যাইবার পথ আছে। কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যস্থলে ৫।৬ মাইল স্থান ব্যাপিয়া জাফ্রানের ক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। ভুঁইচাপা ফুলের ন্যায় ইহার ফুলগুলি মাটি ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে ও ফুলের চারিধারে ৪।৫টি রসুনের পাতার ন্যায় পাতা রহিয়াছে। ফুলগুলি ঘোর বেগুনি রং-এর। সমস্ত মাঠ এই ফুলে ভরা। কি অপরূপ সৌন্দর্য! দূর হইতে দেখিলে একটি বৃহদাকার কাশ্মীরী জামিয়ারের ন্যায় মনোরম দেখায়। আমরা দুই-তিনটি গাছ মাটি খুঁড়িয়া উঠাইয়া লইলাম। গাছগুলির গেঁড় ঠিক

রসুনের ন্যায়। ফুলে তেমন সুগন্ধ নাই। স্থানে স্থানে নারী-মজুরেরা ঝুড়ি করিয়া জাফ্রান ফুল তুলিতেছে। একস্থানে চাটাইয়ের উপর রাশীকৃত ফুল শুকাইতেছে। কোথাও মাটির উপরে চাদর পাতিয়া শুষ্ক ফুল চালা হইতেছে। অন্যস্থানে, চালুনি দিয়া ইহার কেশর ও ফুল আলাদা করা হইতেছে। ইহার কেশর দুই প্রকার। একপ্রকার ঘোর লাল, আর একপ্রকার হলুদে। যেগুলি হলুদে সেগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এইস্থানে এই জাফ্রানের মূল্য দুই টাকা তোলা। এইস্থানে যে জাফ্রান বিক্রয় হয় তাহা কাঁচা। পরে শুকাইয়া ওজনে কম হইয়া যায় তাই দাম এত বেশী কিন্তু জিনিস খাঁটি।

এইস্থানটি শ্রীনগর হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত। আসিতে পাণ্ডার্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পামপুরের বিখ্যাত বাখরখানি রুটি ভোজন করিয়া স্বামীজী বলিলেন, এরকম রুটি কখনও খান নাই।

পামপুর-গ্রামটি বিতস্তার দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এইস্থানে কতকগুলি কাশ্মীরী ধরনের কাষ্ঠ-নির্মিত মসজিদ, চানার গাছের বাগান ও মহারাজা বাহাদুরের বাংলো আছে। নদীর উপরে একটি সুদৃশ্য কাষ্ঠ-নির্মিত সেতু। পূর্বে এইস্থানে পদ্ম নামক জনৈক রাজা বাস করিতেন। এখন তাহার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমান আছে। ইহার পরবর্তী ভীল নামক গ্রামে কয়েকটি গন্ধকমিশ্রিত গরম জলের ঝরণা রহিয়াছে। অনেকে এই ঝরণার জলে স্নান করিয়া নানাপ্রকার চর্মরোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

সেইস্থান হইতে ফিরিয়া শ্রীনগরে কয়েকদিন বিশ্রাম করিবার পর কাশ্মীরের ফল, কাঙড়ি, নামদা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আমরা ১৮ই নভেম্বর প্রাতঃকালে পাঞ্জাব মোটর কোম্পানীর লরীতে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া রাওয়ালপিণ্ডি যাত্রা করিলাম, এবং নির্বিঘ্নে সেখানে পৌঁছিয়া স্বামীজী সেখানকার সনাতন-ধর্মসভার সম্পাদক লালা নন্দরাম মহাশয়ের অতিথি হইয়া তাঁহার ধর্মশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ডাঃ শ্রীরাম স্বামীজীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ইনি সম্প্রতি শ্রীনগরের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া রাওয়ালপিণ্ডিতে আসিয়াছেন। এইস্থানের সনাতন ধর্মসভায় দুইদিন স্বামীজীর বক্তৃতা হইল। বিষয়—সনাতন ধর্ম ও আত্মার অমরত্ব। প্রত্যেক দিনই চারি-পাঁচশত শ্রোতা উপস্থিত হইলেন। এই শহরে প্রায় তিরিশ ঘর বাঙালীর বাস। এখানকার যে পাড়ায় বাঙালীরা থাকেন তাহাকে বাবু মহল্লা বলে। বাবু মহল্লার বাঙালীরা একদিন স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় বিখ্যাত ডাক্তার এন. এন. দত্ত, এম.বি., মহাশয় হরিসভায় ভাগবৎ পাঠ ও গীতবাদ্যের আয়োজন করিয়া স্বামীজীকে লইয়া গেলেন। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত শাস্ত্রপাঠ করিলেন। কয়েকটি গান ও হরির লুঠ হইলে পর স্বামীজী কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন! রাত্রে ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্বামীজী তাঁহার গাড়ীতে পুনরায় ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

তৎপর দিবস স্বামীজী লালাজীর মোটরে তক্ষশীলার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গেলেন। এইস্থানে মোটর ও রেলগাড়ীযোগে যাওয়া যায়। স্থানটি রাওয়ালপিণ্ডি হইতে তেত্রিশ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত। তক্ষশীলা বৌদ্ধযুগে অতি বিখ্যাত নগরী ছিল। এখন উহার ধ্বংসাবশেষ মাটির নীচ হইতে বাহির হইতেছে। পুরাতত্ত্ববিদ্ বিখ্যাত স্যার জন মার্শাল সাহেব এই কার্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার সহকারী শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় স্বামীজীকে যত্নপূর্বক সকল স্থান দেখাইতে লাগিলেন। তক্ষশীলা পূর্বে (গান্ধার) গন্ধর্ব দেশের অন্তর্গত ছিল। রামায়ণ পাঠে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে ভরত গন্ধর্ব দেশ জয় করেন এবং রাজপুত্র তক্ষকে সেই প্রদেশের রাজা করিয়া দেন। সেই হইতে এই প্রদেশ তক্ষশীলা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরীক্ষিৎ-পুত্র রাজা জন্মেজয় এইস্থানে বিরাট সর্পযজ্ঞ[১১] করিয়া পিতার প্রাণনাশের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তক্ক বংশীয়গণ এইস্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এইস্থানকে তক্ষশীলা বলে। বৌদ্ধগণ এইস্থানকে তক্ষশির বলেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে কোনকালে এইস্থানে জনৈক ব্রাহ্মণকে স্বীয় মস্তক দান করিয়াছিলেন।

১২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আবর নামক শকগণ এইস্থানে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর কণিষ্ক এই প্রদেশ জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপি এইস্থানের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে তক্ষশীলা ইউফ্রাটিডাসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডার এই নগরে আসিলে এইস্থানের স্বাধীন রাজা অম্ভী তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন এবং পাঁচ সহস্র সৈন্য দিয়া তাঁহার শত্রু পুরু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। চতুর্থ শতাব্দীতে চীনা ভিক্ষু-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এবং ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাং তক্ষশীলায় আগমন করেন। সেই সময় প্রাচীন রাজবংশ বিলুপ্ত ও তক্ষশীলা কাশ্মীরের অধীন ছিল।

ছয় বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সেই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ এইস্থান হইতে খুঁড়িয়া উদ্ধার করা হইতেছে। বহু বৌদ্ধমন্দির, সঙ্ঘারাম ও স্তূপ এই ধ্বংসাবশেষ হইতে বাহির হইয়াছে। নানাবিধ বুদ্ধমূর্তি ঐগুলিতে রহিয়াছে। ধ্বংসাবশিষ্ট হইলেও এই প্রাচীন স্থানের দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবরটি নানাজাতীয় পদ্মফুলে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার দক্ষিণে একটি গহ্বর। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা সম্রাট অশোকের কীর্তি। ধ্বংসাবশিষ্ট বর্তমান তক্ষশীলা শহরটি ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাইবার পথ যথাসম্ভব পূর্ববৎ রাখা হইয়াছে। পথগুলি বেশ চওড়া। মোটর চলিতে

১১। সর্পযজ্ঞের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীজী বলিলেন, সেখানকার যত নাগ-উপাসক অসভ্য জাতিকে যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধি করিয়া হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহাকে সর্পযজ্ঞ বলা হইয়াছে।

পারে। ভাগগুলির নাম এইরূপ ঃ (১) বীর (২) হাতিয়াল (৩) বারখানা (৪) শির কপ্‌কা কোট (৫) শির সুখকা কোট (৬) কাছকোট। একস্থানে একটি ভগ্ন বাড়ীর ভিতের গায়ে একটি দুমুখো ঈগল মূর্তি দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, ইহা গ্রীক আর্ট। স্থানে স্থানে ভূনিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ সকল দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"দেখচো, সেকালের লোকদের কেমন ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞান ছিল!" এই বলিয়া তিনি কানাল স্তূপের নিকটস্থিত একটি ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকার স্নানের ঘর, বৈঠকখানা, চৌবাচ্চা, প্রাচীর প্রভৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাদুঘরের নিকটেই ট্যাক্‌সিলা রেল স্টেশন। নিকটে একটি সুন্দর ফলের বাগান। সেখানে গাছে জল দিবার জন্য একটি ঘটি-যন্ত্র রহিয়াছে।

মণীন্দ্রবাবু স্বামীজীকে যত্নপূর্বক যাদুঘরের দ্রব্যাদি দেখাইতে লাগিলেন। কত সোনা-রূপার জড়োয়া গহনা এইস্থান হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। তাহার মডেলগুলি এখানে রাখিয়া আসলগুলি বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। এইস্থানের দুইটি জিনিস দেখিয়া স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যবোধ হইল, ক্ষুর ও কাচের পুঁতি-মালা। তিনি বলিলেন, সেকালেও যে আমাদের দেশে ক্ষুর ছিল তাহা 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' প্রভৃতি উপনিষদের শ্লোক হইতে অনুমান করিতাম ; কিন্তু আজ স্বচক্ষে দেখিলাম যে, সেকালেও আমাদের দেশে ক্ষুর ও কাচ ছিল, তাহার প্রমাণ এইস্থান হইতে প্রাপ্ত কাচের ইঁট, পাত্র, পুঁতিমালা প্রভৃতি হইতে পাইলাম। বৌদ্ধযুগে স্তূপের চতুর্দিকে মোটা তিন-চারি ইঞ্চি কাঁচের ইঁট দিয়া মেজে বাঁধানো ছিল। চীনারা বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ হইতে কাচ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু অধুনা হিন্দুরা উহা ভুলিয়া গিয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এইরূপে সারাদিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া স্বামীজী সন্ধ্যায় পুনরায় রাওলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে স্বামীজী পেশোয়ার[১২] যাত্রা করিলেন এবং রাত্রি নয়টার সময় স্টেশনে পৌঁছিলেন। সেখানে গুণ্ডাদিগের ভয়ে পুলিশ কাহাকেও রাত্রে কোথাও যাইতে দেয় না, সুতরাং আমাদ্দিগকে রেলের বিশ্রামগৃহে রাত্রি যাপন করিতে হইল। পরদিবস স্থানীয় কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে গেলাম। পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেক শহরেই এক-একটি বাঙালীদের কালীবাড়ী আছে। সেখানে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইয়া ধর্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। দৈনিক পূজারও সুবন্দোবস্ত আছে। বিদেশী বাঙালীদের পক্ষে এইরূপ নিরাপদ আশ্রয়স্থান সত্যই অমূল্য। মধ্যাহ্নে স্বামীজী শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিলেন এবং অপরাহ্নে স্থানীয় সুবিখ্যাত ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

১২। পেশোয়ার একটি বাণিজ্যপ্রধান শহর। অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবি। এই শহরে শতকরা ৯৩ জন মুসলমানের বাস। ইহার প্রাচীন নাম ছিল পুরুষপুর।

ইনিই পেশোয়ারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বাঙালী। কলিকাতার মারোয়াড়ীদের মধ্যে মান্যবর স্বর্গীয় স্যার কৈলাসচন্দ্র বসুর ন্যায় এই অঞ্চলের কাবুলিদের মধ্যে ইঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে।

দুই দিন পেশোয়ারে অবস্থান করিয়া স্বামীজী খাইবার পাস্ ও আফগানিস্থান দেখিবার জন্য পেশোয়ার হইতে জামরোদ যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে খাইবার রেলপথ নির্মিত হইতেছিল। অসংখ্য কুলিমজুর খাটিতেছিল। বহু স্থানে কলকারখানা বসিয়াছিল। স্বামীজী একখানি মেল লরীতে উঠিয়া আফগানিস্থান অভিমুখে চলিলেন। বহু উঁচু-নীচু ঢালু পথ দিয়া লরী চলিতে লাগিল। পথে সর্বত্রই রেলপথের কার্য চলিতেছিল। একস্থানে একটি পাহাড় ভেদ করিয়া একটি সুড়ঙ্গ করিবার চেষ্টা হইতেছিল।

পেশোয়ারের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। চতুর্দিকের সার্কাসের গ্যালারির ন্যায় শৈলমালা শহরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মহাভারতে এই প্রদেশ গান্ধার নামে বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানী পুরুষপুরই বর্তমান পেশোয়ার। এই প্রদেশে সহস্রাধিক বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ ছিল। তাহাদের মধ্যে যেটি বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রের উপর নির্মিত হইয়াছিল সেটিই প্রধান। নানা সময়ের বৈদেশিক আক্রমণে সেগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। নারায়ণ দেব, অনঙ্গ বোধিসত্ত্ব, বসুবন্ধু বোধিসত্ত্ব, ধর্মত্রাতা, মনোহিত, আর্য-পাশ্চিক প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রকার এই গান্ধার দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ফা-হিয়েন, ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ্গ-ফুল এবং ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাং চীন হইতে এই গান্ধারে আগমন করিয়াছিলেন।

প্রায় তিন মাইল আসিয়া স্বামীজী লাণ্ডিখানার বিখ্যাত গোরা বাজারের নিকট উপস্থিত হইলেন। এত অধিক সৈন্য সমাবেশ আমরা ইতিমধ্যে এদিকে দেখি নাই। বোধ হয়, ৪।৫টি পূর্ণ রেজিমেন্ট এইস্থানে বাস করিয়া আফগানিস্থান ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছিল। অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা বিভিন্ন স্থানে কুচকাওয়াজ করিতেছিল। এইস্থানে লরী আধ ঘণ্টা থামিবে। তাই স্বামীজী স্থানীয় বাঙালী অফিসারদের তাঁবুতে গমন করিলেন। সেখানে মিষ্টার কর স্বামীজীকে চা প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। এইস্থানের পর পাসপোর্ট না থাকিলে আর কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না। মিষ্টার কর আনন্দের সহিত তাঁহার পাসখানি স্বামীজীকে ব্যবহার করিতে দিলেন। তাহা লইয়া স্বামীজী পুনরায় লরী চাপিয়া আফগানিস্তান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার আমরা প্রকৃতই আফগান মুল্লুকে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে আফগান যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, বালক-বালিকাগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; অনেকেরই হস্তে বন্দুক। চারিদিকে আফগান গ্রাম ও কুটীর। কুটীরগুলি মাটির, চাল খড়ের। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি করিয়া পঞ্চাশ-ষাট

হাত উচ্চ মিনার আছে। যুদ্ধ বাধিলে গ্রামবাসীরা উহার উপর হইতে গুলি চালায়। বন্দুক ইহাদের অত্যন্ত প্রিয়। শত্রু বধ করিয়া তাহার বন্দুকটি পাইলে ইহারা আনন্দে বলে, "মুঝে এক ভাই মিল গয়া"।

ইহারা অত্যন্ত হিংস্র-স্বভাব ও বন্দুক-চালনায় সিদ্ধহস্ত। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য ইহারা প্রত্যেকেই কাবুলরাজের নিকট হইতে বেতন পায়। ক্রমে আমরা লাণ্ডিকোটাল নামক সামরিক শহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাই ব্রিটিশ অধিকারের শেষ সীমা। এইস্থানেও অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত দুর্গ রহিয়াছে। সৈন্যগণ সর্বদাই সশঙ্কিতভাবে কালযাপন করে এবং কোনপ্রকার অসাধারণ শব্দ শুনিলেই গুলি চালায়। জনৈক গোয়েন্দা পুলিশ কর্মচারী আমাদের পিছু লইয়া আমাদিগকে পুলিশ অফিসারের নিকট লইয়া গেল। তিনি একজন আফগান মুসলমান হইয়াও আমাদের সহিত বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন। স্বামীজীকে চেয়ারে বসাইয়া এই প্রদেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও পাসখানি দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। মেল লরী এইস্থানের পর আর যায় না। এইস্থান হইতে পুনরায় জামরোদ ফিরিয়া যায়। অগত্যা আমরাও আফগানিস্তানের পার্বতীয় দৃশ্য দেখিয়া 'খাইবার পাস' দিয়া পুনরায় জামরোদ ফিরিয়া আসিলাম। পথে স্বামীজী মিঃ করকে তাঁহার পাসখানি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিলেন। জামরোদ রেল স্টেশনে পেশোয়ারের ট্রেন প্রস্তুত ছিল। এই সময় পুনরায় আর একজন গোয়েন্দা আসিয়া আমাদের পিছু লইয়া স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্বামীজী তাহার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে এক ধমক দিতেই সে বেচারী সুড় সুড় করিয়া চলিয়া গেল। আমরা ট্রেনে চড়িয়া পুনরায় পেশোয়ারে আগমন করিলাম। পেশোয়ারে চিড়িয়াখানা, সৈন্যাবাস প্রভৃতি বেড়াইয়া স্বামীজী আটক শহর[১৩], কাবুল নদী[১৪] প্রভৃতি দেখিয়া পাঁচ দিন পরে লাহোর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

লাহোর স্টেশনে স্বামীজীর পূর্ব-পরিচিত কালোয়ান্ত সিং, তেজা সিং প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। আমরা-দুইখানি টাঙ্গাতে মালপত্রাদি তুলিয়া তাঁহাদের বাসায় যাইয়া উঠিলাম। এবার স্বামীজী লাহোরে দুই সপ্তাহ থাকিবেন। তিব্বত যাইবার পূর্বে স্বামীজী লাহোরের এডভোকেট শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে

১৩। আটক সিন্ধুনদের পূর্বধারে অবস্থিত। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহিত এইস্থানে ৩২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পুরু রাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমান দুর্গটি আকবর শাহ ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান রেলওয়ে সেতুটি যেস্থানে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ পার হইয়াছিলেন সেইস্থানে নির্মিত হয়। আজকাল আটক-এ সিমেন্টের কারবার বিখ্যাত।

১৪। এইস্থানে কাবুল ও সিন্ধুনদের সোনা পাওয়া যায়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বহু ব্যক্তি নদীর বালি হইতে স্বর্ণরেণু ধৌত করিয়া বাহির করে।

তিন-চার দিন ছিলেন। ইঁহার বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। পূর্ব-পরিচিত ব্যক্তিগণ স্বামীজীকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। স্থানীয় আর্যসমাজ কলেজে আর্যসমাজীদের নেতা লালা হংসরাজজীর (ইনি দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য দেশহিতৈষী কর্মীপুরুষ) সভাপতিত্বে একদিন বৈকালে স্বামীজীর বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাস্থলে এত অধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, সভাপতি মহাশয়কে সভা সংযত রাখিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। স্বামীজী "আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতা" বিষয়ক অতি উপাদেয় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটি বক্তৃতা করিলেন। হংসরাজজী বলিলেন ঃ "স্বামী বিবেকানন্দকে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) আমি বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের আর্য সমাজে যোগদান করুন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"আপনিই আমার দলে আসিয়া যোগদান করুন" (হাস্য)। প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

ইহার পর কয়েকদিন ক্রমাগত আর্য-সমাজীরা আসিয়া স্বামীজীকে অনবরত কূট প্রশ্ন করিয়া পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেরাই স্বামীজীর নিকট পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তাঁহারা স্থানীয় শ্রীনানকচাঁদ পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ সুখাদ্য ও পানীয়ের দ্বারা অভ্যর্থিত করিবার পর শহরের প্রধান প্রধান পাণ্ডা আর্য-সমাজীরা মিলিয়া স্বামীজীকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

প্রথম প্রশ্ন—স্বামীজী, আপনি বেদকে পূর্ণ না অপূর্ণ মনে করেন?

স্বামীজী—অপূর্ণ মনে করি। কারণ কোন বেদেরই সম্পূর্ণ অংশ এখন পাওয়া যায় না; তাছাড়া বেদেতেই রহিয়াছে যে, সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপকে জানিলে বেদ অবেদ হইয়া যায়—'অত্র বেদা অবেদা ভবন্তি'। (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।২২)

দ্বিতীয় প্রশ্ন—স্বামীজী আপনারা যে বলেন, জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য, বেদের কোন্ জায়গায় লেখা আছে যে জগৎ মিথ্যা?

স্বামীজী—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এক ব্রহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কোনকিছুই নাই। সত্য একটি, কখনও দু'টি হ'তে পারে না। যদি জগৎকে সত্য বল, তাহলে ব্রহ্ম মিথ্যা হয়; আর যদি ব্রহ্মকে সত্য বল, জগৎ মিথ্যা হয়। যদি জগৎ আর ব্রহ্ম একই জিনিস হয়, তাহলে উভয়ই একসঙ্গে সত্য হতে পারে। তাকেই আমরা বলি, জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, অর্থাৎ যেটাকে জগৎ ব'লে মনে কচ্চ সেটা বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাদের রজ্জুতে সর্প ভ্রম হচ্চে, তাই জগৎ মিথ্যা বা মায়া।

এইরূপে আর্য-সমাজীরা প্রত্যেক প্রশ্নে স্বামীজীর স্পষ্ট কাটা-কাটা উত্তর শুনিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। যে কয়জন সনাতনী (ইঁহারা আর্য-সমাজের বিরুদ্ধবাদী দল) সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বামীজীর জয়লাভে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে লাহোরে থাকিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি যাহা কিছু প্রয়োজন সেই সকলের দায়িত্ব লইতে চাহিলেন।

স্বামীজী অন্য সময়ে এইসকল বিষয় আলোচনা করিবেন বলিয়া সেইস্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার খুব পরিশ্রম হইয়াছিল, তাই রাত্রে আহারাদি করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শুইয়া পড়িলেন।

পরের দিন স্থানীয় ফোরম্যান খ্রীশ্চান কলেজে[১৫] স্বামীজীর বক্তৃতা হইয়াছিল। বিষয় 'কর্মবিজ্ঞান'। সভাপতি—এই কলেজের অধ্যক্ষ আমেরিকার অধ্যাপক লুকাস্। সভাক্ষেত্রে ছাত্রগণের অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। স্বামীজী প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি বলিলেন : "আমি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক এবং সারাজীবন এই বিষয় লইয়া আছি, কিন্তু এই সুপণ্ডিত স্বামীজী আজ যাহা বলিলেন, এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা আমি আর কোথাও শুনি নাই। আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিখ্যাত মনীষীদের বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু আজ আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে ভারতে এঁর তুল্য বক্তা কেহ নাই। আমি যখন নিউ ইয়র্কে ছিলাম তখন স্বামীজীর নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আজ আমি শুনিয়া ধন্য হইলাম।"

তাহার পরদিবস স্বামীজী স্যার গঙ্গারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইনি বিধবা-বিবাহ লইয়া খুব মাতিয়াছিলেন। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ইনি বহু হিন্দু বিধবার বিবাহ দিয়াছেন।

তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, "এই শহরে আপনাদের বেলুড় মঠের সেবানন্দ ব'লে একজন সাধু এসেছিলেন। এখানে তিনি দিনকতক আশ্রম করেছিলেন, কিন্তু চালাতে পারলেন না। আপনি এইস্থানে একটি আশ্রম করুন, তার যাবতীয় খরচ আমি দিচ্ছি।"

স্বামীজী বারান্তরে তাঁহাকে এবিষয় জানাইবেন বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী রঘুবীর সিং-এর সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ইঙ্গ-বৈদিক বিদ্যালয় ও হোষ্টেল দেখিয়া লাহোর মিউজিয়াম দেখিতে গেলেন। লাহোর শহরের বাহিরে বিস্তৃত মাঠ দখল করিয়া শহরকে বাড়াইবার চেষ্টা হইতেছিল। বিচারালয়ের পার্শ্বেই যাদুঘর। নানাবিধ দ্রব্যাদি এইস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিবার সময় নাই বলিয়া স্বামীজী কেবল চোখ বুলানো গোছের একবার সব ঘরগুলি দেখিয়া লইলেন। তবে একটি কষ্টি পাথরের শীর্ণ বুদ্ধমূর্তি আমাদের বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহার কঙ্কাল, শিরা প্রভৃতি নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তখনকার দিনের ব্যক্তিদের 'এনাটোমি'র জ্ঞান আজকালকার ব্যক্তিদের অপেক্ষা কিছু কম ছিল। উহা তক্তিভাই নামক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

১৫। ইহা খ্রীশ্চান মিশনারীদের কলেজ। 'হিন্দুইজম্ ইন্‌ভেডস আমেরিকা'-গ্রন্থের লেখক ওয়েণ্ডেল্ টমাস্ এই কলেজে আট বৎসর অধ্যাপকরূপে কার্য করিয়াছিলেন। পাকিস্তান হইবার পরে মুসলীম লীগ গভর্ণমেন্টের হুকুমে এই কলেজ দখল করিয়া সংখ্যালঘুদের এখান হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

মিউজিয়ম হইতে ফিরিবার পথে আমরা লরেন্সের প্রস্তর মূর্তিটি দেখিলাম। উহার এক হাতে কলম, অপর হাতে তরোয়াল। বহুবার উহা ভাঙিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেইজন্য সর্বদাই এইস্থানে একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া থাকে। লাহোরে অবস্থানকালে একদিন স্বামীজী ও কালোয়ান্ত সিং অমৃতসরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তেজা সিং প্রভৃতি রেল স্টেশন পর্যন্ত আসিয়া স্বামীজীকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

হিন্দুদিগের যেরূপ কাশী, মুসলমানদিগের যেরূপ মক্কা, শিখদিগের অমৃতসর সেইরূপ পবিত্রতম তীর্থস্থান। প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে এইস্থানে চক্ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম ছিল। এইস্থানে জলাশয় না থাকায় পথিকদের অত্যন্ত কষ্ট হইত। গুরু নানক তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে লইয়া এখানে ভ্রমণ করিবার সময়ে অলৌকিক শক্তিবলে একটি স্বচ্ছতোয়া সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহার প্রায় ষাট বৎসর পরে ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস এই সরোবরটি আরও বৃহত্তর আকারে খনন করাইয়া ইহার চারিপার্শ্বে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করান এবং নিজ নামানুসারে এইস্থানের নাম রামদাসপুর রাখেন। তাঁহার শিষ্য গুরু অর্জুন সিং এইস্থানে শিখদিগের রাজধানী করিয়া অমৃতসর নাম প্রদান করেন। এই শহরে বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১,৪৩,০০০। এই শহরটি প্রাচীরবেষ্টিত এবং তেরোটি ফটকবিশিষ্ট। পূর্বে ইহার চারিদিকে খাল কাটা ছিল। কিন্তু এখন ইহার অনেকাংশ বুজিয়া গিয়াছে। শত্রুহস্ত হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ পূর্বে এইস্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বর্তমানে তাহা লুপ্ত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা রণজিৎ সিংহ এইস্থানে গোবিন্দগড় নামে একটি পরিখাবেষ্টিত দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও ইহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ্, তাঁহার পুত্র তৈমুর এইস্থানের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ভাঙিয়া এবং তন্মধ্যে গো-হত্যা করিয়া অপবিত্র করিয়া দিয়াছিলেন এবং কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিখরা পরে ঐ সকল স্থান পুনরধিকার করেন এবং ঐ সকল মসজিদে শূকর কাটিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে বর্তমান বৃহৎ মন্দিরটি নির্মিত হয়। ইহার নাম দরবার সাহেব। মন্দিরটি একেবারে অমৃত সরোবরের মধ্যে নির্মিত। ইহার মধ্যে এবং আশেপাশে সর্বদাই গ্রন্থসাহেব পাঠ হইতেছে। সরোবরের স্থির জলে মন্দিরটির অতি অপূর্ব সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ, চারিদিকে ডালপালা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার ডালে বৃহৎ বৃহৎ বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দির, পথঘাট সমস্তই সুন্দর শ্বেত পাথরের। গম্বুজটি তামার পাতে মোড়া, তাহার উপর সোনার হল করা। দেখিতে ঠিক সোনার তৈরী মনে হয়। তাই সকলে ইহাকে সুবর্ণ মন্দির বলে। সোনার হল

করিতে মহারাজ রণজিৎ সিং বহু অর্থ ব্যয় করেন। শিখরা জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহের কবর হইতে বহু মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া আনিয়া মন্দির অভ্যন্তরে লাগাইয়া দিয়াছিল।

সিংহদ্বার দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে আকালিদের ভূঙ্গ প্রাসাদ। সেখানে শিখ গুরুদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের আশেপাশে নানা স্থানে গায়ক ও বাদকদল গীতবাদ্য করিতেছে। কোথাও যাত্রীরা স্নান করিতেছে, কোথাও উদাসী সাধু-সন্ন্যাসীরা বসিয়া আছেন। কোথাও শিখগণ গ্রন্থসাহেব ধর্মপুস্তকের নকল করিতেছে। ব্যবসায়ীরা কাপড়, চিরুনি, লৌহ ও অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। সরোবরের পূর্বধারে একটি বৃহৎ স্তম্ভ রহিয়াছে। উহার উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। ইহার নিকটেই বাবা অতলের সমাজ। তাহার পার্শ্বেই গুরু গোবিন্দ সিং-এর স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত কোলসর। একটি বৃক্ষের তলায় একটি তাম্রফলক রহিয়াছে। উহাতে গুরু গোবিন্দ সিং কিরূপে তাঁহার পত্নী কৌলকে লাহোরে আনিয়াছিলেন তাহার বিবরণ খোদিত রহিয়াছে।

সমস্ত দেখিতে দেখিতে স্বামীজী জুতা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গ্রন্থসাহেব বা গুরু নানকের বাণী পাঠ হইতেছে। স্বামীজী ভক্তিভরে প্রণাম করিতেই একজন শিখ পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটি প্রসাদী ফুল দিলেন। স্বামীজী তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সান্তসর দেখিয়া সিংহদ্বার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সেখান হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখিতে গেলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এই জালিয়ানওয়ালাবাগে একদিন বিকালে কয়েক শত পুরুষ, নারী ও শিশুকে তখনকার ছোটলাট ওডায়ার সাহেবের সমর্থনে জেনারেল ডায়ার কামানের দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া নিজের পৈশাচিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে।

তাহার পরে স্থানীয় রেল স্টেশনে আসিয়া ট্রেনে চাপিয়া স্বামীজী নান্‌কানা সাহেব দেখিতে গেলেন। নান্‌কানা অমৃতসর হইতে অধিক দূর নহে। গুরু নানকের জন্মস্থান বলিয়া এইস্থান শিখদিগের প্রধান তীর্থ। ট্রেন হইতে নামিয়া একখানি টাঙ্গা করিয়া স্বামীজী গুরু নানকের জন্মস্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন। শহরে প্রবেশ করিতেই আমাদের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বোধ হইল ছেলে-বুড়ো সকলের কোমরে ছোরা আঁটা দেখিয়া। গৃহস্থের বৌ-ঝিরা পথ দিয়া চলিয়াছে—কোমরে ছোরা বাঁধা, বালিকারা বই হাতে স্কুলে যাইতেছে—তাহাদেরও কোমরে এক-একখানা ছোরা বাঁধা। মনে হইল হঠাৎ যেন কোন সামরিক জাতির দেশে আসিলাম! না জানি আরও কত কি দেখিব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজী গুরু নানকের জন্মস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানে একটি বৃহৎ গুরুদোয়ারা (মন্দির) বিরাজ করিতেছে। স্বামীজী তাহার নিকট গেলেন। গুরুদোয়ারার ফটকের সম্মুখে গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির

কয়েকজন সভ্য টেবিল-চেয়ার পাতিয়া বিষয়কর্ম করিতেছিলেন। স্বামীজীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বসিবার জন্য চেয়ার দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কিছুদিন পূর্বে এইস্থানে সাধু নারায়ণ দাসের দলস্থ শিখদিগের সহিত আকালিদের ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। আকালিগণ গভর্ণমেন্টের হাত হইতে এই মন্দিরটির ভার কাড়িয়া লইয়াছে। সেইজন্য সকল বিষয় তদারক করিয়া মীমাংসা করিবার জন্য এই কমিটি বসিয়াছে। কমিটির প্রধান কর্মী সর্দার গুরুদিৎ সিং স্বামীজীর সহিত অনেক বিষয়ে আলাপ করিলেন। পরে তাঁহার সহিত স্বামীজী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। দাঙ্গাকারীরা একস্থানে আগুন জ্বালিয়া অনেক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার পর পুড়াইয়াছিল তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। উভয় পক্ষের বন্দুকের গুলিতে মন্দিরের দরজা, জানালায় বহু ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিতরদিকের দেওয়ালে গুলি লাগাতে চুন, বালি খসিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থসাহেব পুস্তকেও গুলি লাগিয়াছে। সম্প্রতি এইরূপ একটি হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অপরিচিত লোককে মন্দিরের ভিতরে বেশীক্ষণ থাকিতে দেওয়া হইতেছে না। সেইজন্য স্বামীজী মন্দিরের ফটো তুলিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং রেল স্টেশনে আসিয়া ট্রেনে চড়িয়া পুনরায় লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন।

লাহোরে আসিয়া স্বামীজী পরদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপে ন্যাশনাল কলেজের ছেলেদের নিকট 'ছাত্রদের কর্তব্য' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার শেষে স্বামীজী, ভাই পরমানন্দের সহিত ন্যাশনাল কলেজ দেখিতে গেলেন। রাত্রে অধ্যাপক গুপ্তের বাটীতে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ হইল। তাহার পরের দিন লালা হরিদাসের সভাপতিত্বে সনাতন-ধর্ম কলেজে স্বামীজী বেদের দার্শনিকত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ছাত্রগণ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইলেন। রাত্রে লালা হরিদাসের বাটীতে নিমন্ত্রণ হইল। সেখানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া স্বামীজীর ধর্মমত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহার পরের দিন স্বামীজী আর্য-সমাজের হবন ও বেদপাঠ দেখিতে গেলেন। বৃহৎ পাল দিয়া ঘেরা একটি মাঠে আর্য-সমাজের বাৎসরিক অধিবেশন হইতেছিল। নানা স্থান হইতে আর্য-সমাজীগণ আসিয়া মঠের মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছিল। যজ্ঞ হোম করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়াছেন। মণ মণ ঘৃত পুড়িতেছিল। এত বড় বৃহৎ যজ্ঞ আর কখনও আমরা দেখি নাই। সেইজন্য ইহা দেখিয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল। তথা হইতে স্বামীজী সব্‌জিবাগে মিঃ বি. কে. লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করিলেন। তাহার পর বাবুমহলে একটি বাঙালী মেসে বেড়াইতে গেলেন। সেখানে উপেন্দ্রনাথ দে স্বামীজীকে চা প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা

করিলেন। পূর্বকালে পশ্চিমের সমস্ত শহরে এত অধিক বাঙালী কর্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেন যে, প্রত্যেক স্থানেই এক-একটি বাঙালী টোলা বা বাবুমহলা গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজকাল স্থানীয় লোকেরা শিক্ষিত হইয়া উঠায় প্রত্যেক স্থানেই বাঙালী কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এইরূপে দুই সপ্তাহ অতীত হইল। তাহার পর স্বামীজী লাহোর হইতে কুরুক্ষেত্র যাত্রা করিলেন। এই অঞ্চলের রেলপথে রাত্রে অত্যন্ত চোরের ভয়। তাই রাত্রে আমরা গাড়ীর ভিতর জাগিয়া রহিলাম ও মালপত্র পাহারা দিতে লাগিলাম।

প্রাতঃকালে কুরুক্ষেত্র পৌঁছাইয়া স্বামীজী ধর্মশালায় আশ্রয় লইলেন এবং নীলকণ্ঠ পাণ্ডার বাড়ীতে আহারাদি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদ, যেখানে যুদ্ধশেষে দুর্যোধন লুকাইয়াছিলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে নিহত হন, তাহা দেখিলেন। পরে যেখানে জাতিস্মর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন সেখানে একটি বটবৃক্ষ আছে। ভদ্রকালী পীঠ—এই স্থানে সতীর উরু পড়িয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্র হ্রদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসকল দেখিতে লাগিলেন। ঐদিন ধর্মশালায় রাত্রিবাস করিয়া পর-দিবস সকালের ট্রেনে হরিদ্বার অভিমুখে রওনা হইলেন। যথাসময়ে স্বামীজী হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। কন্‌খল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ স্টেশনে আসিয়া তুমুল জয়ধ্বনির সহিত স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। সেবাশ্রমে আসিয়া স্বামীজী এক সপ্তাহ রহিলেন।

এই কয়েক দিনের মধ্যে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দজীকে (স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য) সঙ্গে লইয়া একদিন স্বামীজী হৃষিকেশ বেড়াইয়া আসিলেন। হৃষিকেশ দেখিয়া স্বামীজীর পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইস্থানে বহু বৎসর পূর্বে ১৮৮৮—১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাধুকরী করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, নিজ হস্তে ঘাসের কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং স্থানীয় কৈলাস মঠের প্রতিষ্ঠাতা ধনরাজ গিরির নিকট বেদান্ত পড়িতেন। শ্রীমৎ ধনরাজ গিরি স্বামীজীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিতেন, 'অলৌকিকী প্রজ্ঞা'। ধনরাজ গিরির শিষ্যেরা কৈলাস নামে এক মঠ স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীজী তাহা দেখিতে যাইলেন। মঠের মোহন্ত গোবিন্দানন্দ (ইনি স্বামীজীর পূর্বতন সহাধ্যায়ী ও বন্ধু) স্বামীজীর নাম শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনিও ধনরাজ গিরির ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি স্বামীজীকে সেই মঠে কিছুদিন বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং কিছু ফল উপহার দিলেন। স্বামীজী তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন অন্য কোন সময়ে আবার আসিবেন। স্বামীজী পাঞ্জাবী ছত্রে মাধুকরী দ্বারা মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া কন্‌খলে ফিরিয়া আসিলেন। কন্‌খলে আসিয়া স্থানীয়

দক্ষযজ্ঞ ঘাট, সতী সরোবর, ঋষিকুল আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিলেন। স্বামীজী সেবাশ্রমের একটি নব গৃহে 'কলেরা ওয়ার্ড'-প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করিলেন এবং আশ্রমস্থ কয়েকজন কর্মীকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন।

অতঃপর হরিদ্বার হইতে স্বামীজী কাশীধামে আগমন করিলেন এবং রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তিন দিন অবস্থান করিলেন। কাশীস্থ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থান দর্শন করিয়া স্বামীজী ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে ডাউন পাঞ্জাব মেলে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১১ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি-পূজার দিন প্রাতঃকালে স্বামীজী সুদীর্ঘ ছয় মাস পরে পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। অমরনাথ, তিব্বত প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বামীজীকে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বেলুড় মঠের সাধু ও ভক্তরা সকলেই আনন্দিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ পশ্চিম তিব্বত বা লাদাকে বৌদ্ধধর্ম ॥

আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি পাটলিপুত্র নগরে (বর্তমান পাটনা) মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩—২৩৬ অব্দ) তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গতীর অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনের পর অশোক বৌদ্ধ-ভিক্ষু প্রচারকদিগকে নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত, পশ্চিম-তিব্বত (লাদাক), বক্ত্রিয়া, ইয়ারকন্দ, চীন, মঙ্গোলিয়া, মিশর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।[1] প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ ঐ সমস্ত দেশের আদিমবাসীদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া নৈতিক সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই তিব্বতের মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সে সময়ে পশ্চিম-তিব্বতে মন্‌স ও দার্দ নামে আর্যজাতির শাখাবিশেষ বাস করিতেন। ইঁহারাই প্রথমে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রাচীন বৌদ্ধ কলাবিদ্যার ধ্বংসাবশেষ জান্‌স্কারে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্রাহ্মী ভাষায় লিখিত প্রস্তরফলক পাঠ করিলে জানা যায় যে, ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণ লাদাকে প্রথম বৌদ্ধমত প্রচার করেন।[2]

১। বৌদ্ধ মহাবংশ-সাহিত্য থেকে জানা যায়, মহারাজ অশোকের সময়ে যে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গতীর অধিবেশন হয় পাটলিপুত্র রাজধানীতে, তাতে সভাপতিত্ব করেন ভিক্ষু মোগ্গলিপুত্ত তিস (বা উপগুপ্ত)। বিভিন্ন প্রধান ভিক্ষুদের বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক প্রেরণ করেন ঃ

ধর্মপ্রচারক	দেশ
১। মজ্ঝন্তিক	কাশ্মীর ও গান্ধারে
২। মহারক্ষিত	যবন বা গ্রীসদেশে
৩। মজ্ঝিম	হিমালয়-প্রদেশে
৪। ধর্ম রক্ষিত (একজন যবন-ভিক্ষু)	অপরান্তকে
৫। মহাধর্ম রক্ষিত	মহারাষ্ট্রে
৬। মহাদেব	মহিষমণ্ডলে (মহীশূর বা মান্ধাতা)
৭। রক্ষিত	বনবাসিতে
৮। সোণ ও উত্তর	সুবর্ণভূমিতে (বর্মা)
৯। মহেন্দ্র ও অন্যান্য	লঙ্কায় (সিংহল)

এছাড়া অশোক মিশর, গ্রীস, মেসিডোনিয়া প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বত্র বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের প্রেরণ করেন। ধর্মের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

২। Rev. A. H. Francke : *A History of Western Tibet*, p. 20.

॥ চীন মহাদেশে বৌদ্ধধর্ম ॥

সেই সময়ে নেপাল হইতে বৌদ্ধভিক্ষু প্রচারকগণ চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থে গিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২১৭ অব্দে চীন সম্রাট টিসিন শিহ হুয়াঙ্গটির রাজত্বকালে আঠারো জন বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে প্রথম গিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব ৬১ অব্দে চীন-সম্রাট মিং টি যখন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সম্রাট ভারতে বুদ্ধদেবের অস্থি অথবা তাঁহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্যাদি এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ আনয়ন করিবার জন্য তসৈ-ইন প্রভৃতি রাজকর্মচারীদিগকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা দুই বৎসর পরে ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও গোভরন বা ধর্মরক্ষক নামে দুইজন মগধ-নিবাসী শ্রমণ বৌদ্ধভিক্ষু বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ও বৌদ্ধ-শিল্পকলাবিদ্যার নানাপ্রকার নমুনা গান্ধার হইতে লইয়া যান। সেই সময়ে গান্ধার হইতে খোটান, চীন ও তুর্কিস্থান পর্যন্ত সমস্ত দেশে সংস্কৃত ভাষা কথিত হইত। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনের ছোপান জেলায় লোয়াঙ্ নগরীতে পাইমা বৌদ্ধমন্দির প্রথম নির্মিত হইয়াছিল। তথায় মাতঙ্গের দেহত্যাগ হইলে ধর্মরক্ষক অনেকদিন বাস করিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষক মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত হইতে চীনাভাষায় বুদ্ধচরিত্রসূত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মিং টি'র পরবর্তী চীন-সম্রাট ৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আর্যকলা, স্থবির চিলুকাক্ষ ও শ্রমণ সুবিনয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ২২২ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মকাল নামক বৌদ্ধভিক্ষু ভারত হইতে চীনে গিয়াছিলেন। ২২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাবল ও বিঘ্ন নামক বৌদ্ধভিক্ষু, ২৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণরুশ এবং ২৮১ খ্রীষ্টাব্দে কল্যাণ ও ধর্মফল নামক বৌদ্ধভিক্ষু, ৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মরক্ষ এবং ৩৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌতম ও সঙ্ঘদেব নামক বৌদ্ধভিক্ষুদ্বয় ক্রমান্বয়ে চীন মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার করাসর কুচবাসী ভিক্ষু কুমারজীব ৩৮৩—৪১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে বসতি করিয়া 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' নামক বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ চীনদেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এই কুমারজীবের শিষ্য ছিলেন। কুমারজীবের গুরু বিমলাক্ষ কাশ্মীরে বাস করিতেন। সেই সময়ে অপর এক বৌদ্ধভিক্ষু 'বুদ্ধভদ্র' জাহাজে করিয়া দক্ষিণ চীনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ধ্যানী সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তথায় একত্রিশ বৎসর বাস করিয়া ৪২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

৪০০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজপুত্র গুণবর্মন সিংহল, জাভা দেশ দেখিয়া ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজে করিয়া দক্ষিণ চীনে ক্যান্টন্ শহরে গিয়াছিলেন। তিনি ক্যান্টন্ ও নান্‌কিন্ শহরে দুইটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীনদেশে

বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ-চিত্রকর ধর্মদূত ও গুণবর্মন চীনদেশে যাইয়া ভারতীয় শিল্পকলাবিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধভদ্রের কিছুদিন পূর্বে কাবুল হইতে সঙ্ঘভট্ট নামক এক পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রবণ ধর্মপ্রিয় চীনে গিয়াছিলেন।

৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে কুমারজীবের সহকর্মী পুণ্যত্রাত, ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধজীব এবং ৪২৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমিত্র নামক বৌদ্ধভিক্ষুগণ চীনে গিয়াছিলেন।

৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম নামক একজন বৌদ্ধভিক্ষুযোগী ভারত হইতে মালয় দেশ দিয়া পদব্রজে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নয় বৎসর মৌনব্রত পালন করিয়া নান্‌কিনে তপস্যা করিয়াছিলেন। তৎপরে চীন-সম্রাট সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্যায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহকে বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন ও একটি মন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন।

৫০০ খ্রীষ্টাব্দে বসুবন্ধুর জীবনী-লেখক পণ্ডিত পরমার্থ নান্‌কিনে যাইয়া আট বৎসর যোগসাধন করিয়াছিলেন। তিনিই চীনদেশে যোগাচার সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।

* * *

৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) শহরে আসিয়াছিলেন ; সেখানে তিনি বুদ্ধঘোষের বিখ্যাত অধ্যাপক গুরু রেবতীর নিকট চতুর্দশ বৎসর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধগ্রন্থাদি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

॥ কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ॥

৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া আ-তাও ও সন-তাও নামক দুইজন চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষু কোরিয়াতে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং রাজা-কর্তৃক যথেষ্টরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কোরিয়ার রাজা ও রাণী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। সেই অবধি বৌদ্ধধর্ম কোরিয়াতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার পরে অনেক চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষু কোরিয়ায় যাইয়া সেখানে বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের বৌদ্ধভিক্ষু মতানন্দ কোরিয়াতে গিয়াছিলেন এবং রাজা-কর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

॥ জাপানে বৌদ্ধধর্ম ॥

৫২২ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার হাকুসাই-এর রাজা জাপানের রাজা মিকাডোকে সুবর্ণ-নির্মিত বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধগ্রন্থ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। এক বৎসর পরে মিকাডো নিজ রাজধানীর নিকট সমুদ্রতটে একটি বৃহৎ কর্পূরবৃক্ষের গুঁড়িকাষ্ঠ হইতে

খোদিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি পাইয়াছিলেন। তিনি ঐ মূর্তির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোরিয়ার হাকুসাই-এর রাজা সাতজন বৌদ্ধভিক্ষুকে কোরিয়া হইতে জাপানে মিকাডোর নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা জো-জিৎসু ও সান্‌-রন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা অপর নয়জন বৌদ্ধভিক্ষুকে জাপানে পাঠাইয়া দেন। ৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে মিকাডো বিদাৎসু তেন্নো-এর রাজত্বকালে কোরিয়া হইতে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ, এবং রিৎসু ও জেন্‌ সম্প্রদায়ের বহু ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, অধ্যাপক, ওঝা, রাজমিস্ত্রী, প্রতিমা-নির্মাতা প্রভৃতি আসিয়াছিলেন।

৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন জাপানী কোরিয়া হইতে শাক্যমুনি ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং বুদ্ধের অস্থি জাপানে আনয়ন করিয়াছিল। সোগোনো-ইনামে নামক এক জাপানী বৌদ্ধ বুদ্ধদেবের প্রথম মন্দির (প্যাগোডা) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

পরবর্তী মিকাডোর রাজত্বকালে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়া কোরিয়া হইতে জাপানে আসেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সেই সময়ে জাপানের বিখ্যাত ওসাকা নগরীতে তেন্নোজী বুদ্ধমন্দির, কিওটো নগরীর নিকটবর্তী উদ্‌জুমাসা নামক বুদ্ধমন্দির, য়ামাডো শহরের অসুকদেরা দরুমাজী, তায়েমা-দেরা, কুমেদেরা ও তাচিবনদেরা নামক বুদ্ধমন্দিরসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* * *

৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষুগণ প্রথমে জাপানে আসিয়া মন্দির, মঠ ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম জাপানী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের রাজা মিকাডো কোডোকু তেন্নো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া দো-সো নামক জাপানী বৌদ্ধভিক্ষুকে চীনদেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর (যিনি ভারতে আসিয়া অনেক বৎসর বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন) নিকট বৌদ্ধধর্মের রহস্য শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

দো-সো জেন্‌ সম্প্রদায়ের এমনি নামক বৌদ্ধভিক্ষুর নিকট ধ্যানযোগ সাধনপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন।

* * *

৬৭৩-৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মিকাডো তেম্মু তেন্নো বৌদ্ধমঠগুলিকে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া রাজ্যাধীনতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নারা এবং নগরীর নিকট জুকুশজী নামক বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং প্রজাদের প্রত্যেক বাটীতে বুদ্ধের পূজা ও বৌদ্ধগ্রন্থ রাখিবার জন্য অনুশাসন জাহির করিয়াছিলেন। ৭০০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল।

৭১০ খ্রীষ্টাব্দে নারা নগরীর কোবুকু-জী নামক বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মিকাডো শোমু-তেন্নো আদেশ করিয়াছিলেন যে, জাপানে প্রতি জেলাতে বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হউক এবং তিনি সপ্ততলা উচ্চ বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি নারা নগরীতে বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির এবং পঁচিশ হাত উচ্চ অষ্টধাতুর বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই মন্দির ও মূর্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহারই রাজত্বকালে বরামন সোজো নামক ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু ভারত হইতে জাহাজে করিয়া ওসাকা নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বোধহয় বাঙালী ব্রাহ্মণ বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন এবং তখনকার বঙ্গাক্ষরে লিখিত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। সেই পুঁথি নারা নগরীর বৌদ্ধমন্দিরে অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছে। অবশেষে মিকাডো শোমু-তেন্নো রাজত্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। সেই অবধি জাপানের বৌদ্ধধর্ম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ॥

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে রাজধর্ম ও জাতীয় ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য-তিব্বতে প্রচারিত হইলেও সাধারণে ইহা গ্রহণ করে নাই। তিব্বতের রাজা স্রংসান্ গাম্পো ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশ আক্রমণ করেন। তৎপর চীন মহারাজ তাঙ্গ-বংশীয় তাইতসুঙ্গ তিব্বতের রাজার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার কন্যা ওয়েনচেঙ্গকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে স্রংসান্ গাম্পো নেপালের রাজা অংশবর্মার কন্যা ভৃকুটীর পাণিগ্রহণ করেন।

তাঁহার দুই স্ত্রী বৌদ্ধধর্মের আওতায় লালিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহাদের স্বামীকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্মের উচ্চ ভাব ও নীতি সমুদয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রাজদূত থন্‌মি সম্ভোটকে ভারতে প্রেরণ করেন। সম্ভোট ভারতের নানাস্থানে বহুকাল অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা সমাপন করিয়া ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নাগরী অক্ষরে বর্ণমালা, যাহা খ্রীষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে মগধ ও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা তিব্বতে প্রচলিত করেন। অদ্যাপি সেই বর্ণমালাই তিব্বতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মগধে এবং বঙ্গে উহার আকৃতি অন্যরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহাকে 'বুচন' বর্ণমালা বলে। সম্ভোট তিব্বতীয় কথাগুলি বর্ণমালা দিয়া লিখিবার প্রথা চালাইলেন এবং একখানি তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করিলেন। এইরূপে তিব্বতের প্রথম রাজা স্রংসান্ গাম্পো তিব্বতে বর্তমান লিখিত ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার দুই স্ত্রীর সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম স্থাপিত করিয়া তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতা ও নীতি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি লাসা নগরীকে রাজধানী করিয়া বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

॥ তিব্বতে আদিম অধিবাসী ॥

বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করিবার পূর্বে তিব্বতে আদিম অধিবাসীরা নর-মাংসাহারী অসভ্য জাতি ছিল। তাহাদের বিশেষ কোন ধর্ম ছিল না। তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, দৈত্য, যক্ষ, ডাকিনী প্রভৃতিকে ভয় করিত, তাহাদের প্রীতি উৎপাদিত করিবার জন্য আরাধনা করিত এবং পশুবলি এমনকি নরবলিও দিত। তাহারা গাছ, পাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা, বজ্রাঘাত প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের

মধ্যে মানুষের ন্যায় ব্যক্তিত্ব ও প্রাণ-বিশিষ্ট ভূত, প্রেত বিদ্যমান আছে এবং তাহারা অসন্তুষ্ট হইলে মানুষের অমঙ্গল করিয়া থাকে এইরূপ বিশ্বাস করিত। তাহারা পিশাচাশ্রিত বৃক্ষ, প্রস্তর, সর্প প্রভৃতি পূজা করিত ; এবং ভূতের বিকট মূর্তির মুখোশ পরিয়া দানাই নৃত্য করা এই পূজার প্রধান অঙ্গ ছিল।

॥ তিব্বতে বন্‌ধর্ম ॥

এইরূপ ভূত পিশাচ পূজাকে তিব্বতীরা বন্ অথবা পন্-ধর্ম নাম দিয়াছিল। ইহার প্রবর্তক সেন্-রাব-মি-ভো নামক একজন পশ্চিম তিব্বতবাসী সাধক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নানা ভাষা, কলাবিদ্যা, ঔষধাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ৩৩৬টি স্ত্রী ও বহু সন্তান ছিল। অবশেষে একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকালের মধ্যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বন্-দেবতা সেন-হাও-কার-এর অর্থাৎ শ্বেত জ্যোর্তিময় বন্ দেবতার আরাধনা করিয়া অলৌকিক শক্তি লাভ করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর চীনদেশে এই বন্-দেবতাকে প্রচার করেন ও চীন মহারাজা কনগঙ্‌সিকে তাঁহার মঠে দীক্ষিত করেন। সেন-রাব-মি-ভো তিব্বতবাসীকে এই বন্‌ধর্ম শিক্ষা দেন এবং দেবতাকে আবাহন করিবার বিধি, ভূত পিশাচদিগের নৃত্য, সৌভাগ্যদাত্রী দেবীর প্রার্থনা, প্রেতদিগকে পানীয় অর্থাৎ সুরা নিবেদন করিবার বিধি, মৃতদেহের সংকারবিধি, অমঙ্গল নিবারণার্থ কবচ, মাদুলি ধারণের মন্ত্র, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকারের তুক্-তাক্ বা ম্যাজিক শিখাইয়াছিলেন। এই বন্‌ধর্ম তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করিবার পূর্বে এই বন্‌ধর্ম সাধারণে গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্মের পুরোহিতকে বন্-পো বলে।

বন্-পো নানাপ্রকার মন্ত্র প্রয়োগ ও উচ্চারণ করিয়া ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, দৈত্য, ডাকিনী প্রভৃতিকে তান্ত্রিক সাধকের ন্যায় বশীভূত করিয়া বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করে এবং অমঙ্গল দূর করে। তন্মধ্যে তিনটি মন্ত্র প্রধান ঃ (১) আং ওঁ হুঁ রং স সদ্ স লে সন্ নে য়া স্বাহা ; (২) ঐঁ রং খং ক্রুং দুঃ ; (৩) বশ্বো ঠন্ লে লো যো-ঠং স্পুন্‌স্ সো থান্-দো থুন হ্রীঁ। এই মন্ত্রগুলি দ্বারা সকল প্রকার বিঘ্ন, বিপদ, ক্ষতি ও গ্রহ-নক্ষত্রের কোপ এবং দুষ্ট প্রেতাত্মার শক্তি অপসারিত হয়। বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা মানব পার্থিব দুঃখ-কষ্ট সকল দূর করিয়া মুক্তিলাভ করে। বন্‌ধর্মের প্রধান দেবতার নাম লা ছেন্‌পো-মিগ্ দু-পা অর্থাৎ নয়টি চক্ষু-বিশিষ্ট মহাদেব। ইনি জগৎপতি ও ব্রহ্মাণ্ডের গৌরবশালী মহারাজা। অন্যান্য দেবতারা দুই প্রকার, দুঃখদাতা ও শান্তিদাতা। বন্‌ধর্মের দেবীরা দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অধিক শক্তিশালিনী। প্রধান দেবী আদ্যাশক্তির নাম জি বৃজিদংথা যস্মা। ইঁহার মুখশ্রী শ্বেতবর্ণের এবং দুই হস্তবিশিষ্ট, প্রত্যেক হস্তে একটি দর্পণের উপর মশাল ধারণ করিয়া চারিটি সিংহ-পৃষ্ঠে সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। ইনি লা ছেন্‌পো

নামক মহাদেবের পত্নী। এই মহাদেব শ্বেতবর্ণের বৃষোপরি উপবিষ্ট এবং এক হস্তে একখানি রৌপ্যমণ্ডিত পুস্তক ধারণ করিয়া আছেন। অন্যান্য দেবী যথা ঃ বাগ্‌দেবী, লক্ষ্মী, দয়াময়ী, বুদ্ধিদাত্রী প্রভৃতি সকলেই সিংহাসনে উপবিষ্টা এবং প্রত্যেক দেবীর একটি করিয়া দেবতা আছে। তাঁহাদের নাম বাগ্‌দেবতা ইত্যাদি। তাঁহারা সকলেই বৃষারূঢ়। এইরূপে বন্‌ধর্মে পাঁচটি দেবী ও পাঁচটি দেবতা আছেন। এই ধর্মের সাধকদিগের চরম উদ্দেশ্য এই যে, সিদ্ধিলাভ করিয়া জীবের কল্যাণ করা ও কল্যাণসাধনের বিঘ্নকারীদিগকে দমন করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করা এবং সাধনার ত্রয়োদশ অবস্থা-স্তর অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করা। ইহাতে বৌদ্ধদিগের নির্বাণ মুক্তি নাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের রাজা স্রংসান্ গাম্পো দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলে পর লামা ভিক্ষুরা তাঁহাকে স্বর্গীয় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার আখ্যা দিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার দুই স্ত্রীও অবলোকিতেশ্বরের পত্নী তারাদেবীর অবতার আখ্যা পাইয়া পূজিতা হইতে লাগিলেন। চীনদেশীয় রাজকন্যা ওয়েনচেং হইলেন শুভ্রতারা এবং নেপালী রাজকন্যা ভৃকুটি হইলেন শ্যামলতারা। অদ্যাপি ইঁহাদের মূর্তি লামাদিগের মন্দিরে পূজিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই, সেই কারণে লামারা তাঁহাদের দেবী বলিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে যে বৌদ্ধধর্ম স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কিরূপ ? বুদ্ধদেবের পরে এক সহস্র বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিশুদ্ধ মতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। ইহা যখন বিধর্মী অসভ্য জাতিদিগকে ক্রোড় দান করিল, তখন তাহাদের যে সকল দেবদেবীর প্রতীক, প্রতিমা, ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি পূজা এবং কুসংস্কারপূর্ণ আচার-ব্যবহারগুলি ছিল বৌদ্ধধর্মে সেগুলি যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিল। বহুবার বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম-সংসদ (কাউন্সিল) আহ্বান করা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সিথিয়ান রাজা কণিষ্ক যে সংসদ জলন্ধরে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে বৌদ্ধধর্ম দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একভাগ প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধমত পোষণ করিল। এই মত সেই অবধি সিংহল, বর্মা, শ্যাম দেশে প্রচলিত হইল। ইহাকে ইংরাজীতে 'সাদার্ণ বুড্ডিজম্' বলা হয়। অপর ভাগটি অন্যান্য জাতির দেব, দেবী প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়া এবং নানাবিধ কুসংস্কারের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তর ভারতের বাহিরে তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, মধ্য-এশিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম হইল 'নর্দার্ন বুড্ডিজম্'। বৌদ্ধরা প্রথমটিকে হীনযান এবং দ্বিতীয় ভাগকে মহাযান আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রথমে এই দুই মতের সাধনপ্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য নির্বাণ সম্বন্ধে বিশেষ ভেদ ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে

নাগার্জুন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে মহাযান মত বিশেষ উদ্যমের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

এই মহাযান মতে বুদ্ধদেবকে স্বর্গীয় জগদীশ্বরের স্থানে বসানো হইল এবং তাঁহার গুণগুলিকে দেবতা করা হইল। স্বর্গীয় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর জীবের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের যাহাতে অশেষ কল্যাণ হয় তাহারই চিন্তা সর্বদা করিতে লাগিলেন। হীনযান মতাবলম্বীরা নিজের নির্বাণমুক্তির জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন এবং বিনয়পিটক নামক বৌদ্ধ-শাস্ত্রমতে সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাযান মতাবলম্বীরা সমস্ত জীবের মুক্তি কামনা করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত থাকেন ; কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, জীবজন্তু সকলেই কোন-না-কোন সময়ে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তাহাদিগকে দুঃখকষ্টপূর্ণ সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা সকলেরই প্রধান কর্তব্য।

'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্রে হীনযানীদিগের আপন আত্মার কল্যাণ ও নির্বাণ মুক্তিলাভরূপ মতের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দা করা হইয়াছে এবং মহাযানীদিগের উদার সার্বজনীন নির্বাণ-প্রার্থনারূপ মতের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের বিশুদ্ধ ধর্মে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্তা জগদীশ্বরের স্থান নাই। কিন্তু তাঁহার পরিনির্বাণের পর অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার মতাবলম্বীগণ তাঁহাকেই জগদীশ্বরের স্থানে বসাইয়া সুখাবতী নামক স্বর্গে অনাদি, অনন্ত, বিজ্ঞানময় অমিতাভ-বুদ্ধ নাম দিয়া স্থাপিত করিয়া তাঁহারই পূজা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের পার্থিব জীবনের লীলা ও ঘটনাগুলিকে স্বর্গীয় নিত্য-বোধিসত্ত্বের নিত্যাবস্থার প্রতিরূপ বলিয়া প্রচার হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক স্বর্গীয় বোধিসত্ত্বের কল্পনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে প্রধান বোধিসত্ত্ব হইলেন অমিতাভের পুত্র অবলোকিতেশ্বর—ইহাই মহাযানীদিগের মত।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গান্ধার দেশে (বর্তমান পেশোয়ার) অসঙ্গ নামক এক বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন। তিনি পতঞ্জলির রাজযোগাভ্যাসে সিদ্ধ হইয়া মহাযান বৌদ্ধমতে রাজযোগের সাধনপ্রণালী অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর শতাব্দীতে হিন্দুদিগের তন্ত্রমত এবং শিব, শক্তি, দুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা, প্রতিমা-পূজা, মন্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি মহাযানের মতের সহিত জড়িত হইয়াছিল ঃ এইরূপে প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ক্রমে নানাভাবে পরিবর্ধিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই মহাযান বৌদ্ধ মতটি তিব্বতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধভিক্ষুগণ প্রচার করিয়াছিলেন। তখন তিব্বতে প্রাচীন বন্ধর্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল। সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্ম বন্ধর্মের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া তাহার সহিত ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইতে লাগিল।

বন্ধর্মাবলম্বীরা কৃষ্ণবর্ণের টুপি ও চোগা (আলখাল্লা) পরিধান করিত, কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধরা লালবর্ণের টুপি ও চোগা পরিধান করিয়া নিজেদের পার্থক্য স্থাপন করিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুরা বন্ধর্মের কুসংস্কার ও ব্যভিচার দূর করিবার জন্য প্রায় একশত বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হন নাই। সেই কারণে পরবর্তী তিব্বত মহারাজা খিস্রঙ্ দৈৎসান্ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ অধ্যাপক ও মগধ রাজার গুরু শান্ত রক্ষিতকে তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন।

॥ শান্ত রক্ষিত ॥

শান্ত রক্ষিত[১] বঙ্গদেশীয় যশোহরের রাজার পুত্র ছিলেন। ইনি বৌদ্ধভিক্ষু জ্ঞানগর্ভ-কর্তৃক দীক্ষিত হইয়া নানা বৌদ্ধ শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। ইঁহার সাধু চরিত্র এবং অশেষ সদ্গুণ দেখিয়া তিব্বতী লামারা ইঁহাকে আচার্য বোধিসত্ত্ব উপাধি দিয়াছিলেন। তিব্বতে এই নামে তিনি অদ্যাপি বিখ্যাত। ইনি মাধ্যমিক যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী ছিলেন। শান্ত রক্ষিত তিব্বতে উপস্থিত হইয়া খিস্রঙ্ দৈৎসান্ মহারাজকে আদেশ করিলেন ঃ "উদ্যয়ন নগরে (বর্তমান কাবুল) এক বৌদ্ধতন্ত্রে সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পদ্মসম্ভব। তিনি ভূত, প্রেত, পিশাচদিগকে মন্ত্রশক্তি দ্বারা তিব্বত হইতে দূর করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনান।" তিব্বতের মহারাজা তাঁহার আদেশানুযায়ী পদ্মসম্ভবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মসম্ভব তিব্বতে আসিলে মহারাজা বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান পুরোহিত পদে বরণ করিলেন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষদিগকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই মতে সর্বত্যাগ ও ভিক্ষাশ্রম অবলম্বন না করিয়াও সাধারণ গৃহস্থ হইতে রাজা পর্যন্ত সকলেই সহজে নির্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারে।

পদ্মসম্ভব দুই চূড়াবিশিষ্ট মুকুটের ন্যায় লোহিত বর্ণের টুপি পরিতেন। অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লামারা এইরূপ টুপি পরিধান করিয়া থাকেন।

॥ পদ্মসম্ভব ॥

তিব্বতীরা পদ্মসম্ভবকে গুরু রিন্‌পোচে নামে অভিহিত করে। ইহার অর্থ—মহামূল্য গুরু। ইনি যে মত প্রচার করেন তাহারই নাম লামাধর্ম (লামাইজিম্)। পদ্মসম্ভবকে লামারা বুদ্ধদেবের তুল্য সম্মান করেন। তিনি কি প্রকারে অমঙ্গলকারী ভূত, প্রেত, পিশাচদিগকে মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়া দেশকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অনেক গল্প তিব্বতীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু

১। অনেকে বলেন—শান্তি রক্ষিত।

তিনি ঐ সকল ভূত-প্রেতকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, লামারা নিত্য তাঁহাদের পূজা করিবে ও তাঁহাদের উপযুক্ত নৈবেদ্যাদি ভোগ দিবে। এই কারণে অনিষ্টকারী ভূত-প্রেত পূজা লামাদিগের নিত্যপূজার একটি অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

মহারাজা খিস্রঙ্ দৈৎসান-এর সাহায্যে পদ্মসম্ভব সাম-যাস্ শহরে ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বৌদ্ধ মঠ ও ভিক্ষুদিগের বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মঠে শান্ত রক্ষিতকে প্রথম মোহন্ত করেন। তিনি ঐ পদে ত্রয়োদশ বৎসর ছিলেন। পরে তাঁহাকে লামারা স্বর্গীয় বুদ্ধের প্রতিবিম্বস্বরূপ আচার্য বোধিসত্ত্ব-মহাগুরু আখ্যা দিয়াছিলেন। পদ্মসম্ভবের অনেক বিভূতি (সিদ্ধাই) তিব্বতের পুস্তকে বর্ণিত আছে। (১) তিনি আকাশে উড়িয়া যাইতেন ; (২) নিজমুখ অশ্বমুখে পরিবর্তন করিতে পারিতেন ; (৩) মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে পারিতেন ; (৪) বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইতেন ; (৫) নদীর জলকে উজান বহাইতেন ; (৬) হস্তদ্বারা উড্ডীয়মান পক্ষীকে ধরিতে পারিতেন ইত্যাদি।

শান্ত রক্ষিত ও পদ্মসম্ভবের পর প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে, নেপাল ও কাশ্মীর হইতে পঞ্চসপ্ততিজন বৌদ্ধভিক্ষু-পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য তিব্বতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম ছিল যথা ঃ ধর্ম্মকীর্তি, বিমলমিত্র, বুদ্ধগুহ্য, শান্তিগর্ভ, বিশুদ্ধসিংহ, কমলশীল, কুশর, শঙ্করব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জু (নেপালী), অনন্তবর্মা, কল্যাণমিত্র, জিনমিত্র, ধর্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, গুণপাল, সিদ্ধপাল, সুভূতি, শ্রীশান্তি ইত্যাদি।[২] খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রাজা খিস্রঙ্-দৈৎসানের পৌত্র রালপাচন তিব্বতের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি উপযুক্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্র অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধমঠে স্থাবর সম্পত্তি দান এবং চীনদেশীয় কালগণনা প্রথা তিব্বতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিব্বতের ঐতিহাসিক ঘটনা-বিবরণী ঐ প্রথাতে লিখিত হইয়াছে।

॥ বৌদ্ধ-নির্যাতন ॥

রাজা রালপাচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লান ডরমা বৌদ্ধধর্ম বিদ্রোহী ছিলেন এবং রাজার বৌদ্ধধর্মে প্রগাঢ় ভক্তি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রালপাচনের হত্যাসাধন করাইয়া রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হন এবং সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র লামাদিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করেন ও তাঁহাদের মঠ ও মন্দিরগুলি নানাপ্রকারে কলুষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া তাঁহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিলেন এবং জোর করিয়া লামাদিগকে কসাইয়ের কার্যে লাগাইয়া দিলেন। তিন বৎসর ধরিয়া এইরূপ ঘোর

২। Journal of the Buddhist Text Society, January, 1983.

অত্যাচার করিয়া অবশেষে তিনি পাল দরজে নামক লামার হস্তে তীর দ্বারা নিহত হন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন ঃ "হায়, তিন বৎসর পূর্বে যদি আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমি এই সমস্ত পাপকার্য হইতে রক্ষা পাইতাম কিম্বা তিন বৎসর পরে যদি নিহত হইতাম তাহা হইলে আমি এই সময়ের মধ্যে তিব্বত হইতে বৌদ্ধধর্ম সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিতাম।" এই ঘটনার পর লামা পুরোহিতগণ পাল দরজেকে মহাপুরুষের শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মান দিয়াছিলেন। এই সকল জঘন্য অত্যাচার বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই, বরং ইহা দ্বারা লামাদিগের উৎসাহ ও উদ্যম এবং বৌদ্ধধর্মের শক্তি ও বিস্তার স্থায়ীভাবে বর্ধিত হইয়াছিল।

তিব্বতী ভাষায় 'লামা' শব্দটির অর্থ মহাত্মা। এই উপাধি মঠের মোহন্ত ও সিদ্ধ ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। লামারা তাহাদের ধর্মকে লামা-ধর্ম বলে না। লামারা তাহাদের ধর্মকে বৌদ্ধধর্ম আখ্যা দেয়। তিব্বতের রাজা খিস্রঙ্ দৈৎসান্ ও তাঁহার পরবর্তী দুই রাজার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া তিব্বতে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

॥ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ॥

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধভিক্ষু বঙ্গদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হইতে তিব্বতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি গৌড়ের রাজবংশসম্ভূত। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। যৌবনে অবধূত জেতারির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটক, হীনযান মতের গ্রন্থসকল, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতের ত্রিপিটক, গৌতমের ন্যায়দর্শন, মাধ্যমিক ও যোগাচার মতের দর্শনশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিয়া অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি দিগ্‌গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রবিচারে পরাভূত করিয়া অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কৃষ্ণগিরি বৌদ্ধবিহারের প্রধান আচার্য রাহুল গুপ্তের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'গুহ্যজ্ঞান বজ্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি মগধের ওদন্তপুর-বিহারে আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'শ্রীজ্ঞান' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একত্রিংশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আচার্য ধর্মরক্ষিত-কর্তৃক বোধিসত্ত্ব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসী ভিক্ষুর বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি মগধের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকদিগের নিকট ন্যায়শাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেন।

তারপর দীপঙ্কর পেগুদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র সুবর্ণদ্বীপের মোহন্ত প্রধান আচার্য ধর্মকীর্তির নিকট দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রসমূহ সম্যকরূপে অধ্যয়ন

করেন। তথায় অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সিংহলদ্বীপে ভ্রমণকরতঃ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

পুনরায় মগধে আসিয়া তিনি তথাকার সুবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধূতী, তোম্ভী—এই কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপঙ্করকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শিরোমণি বলিয়া জানিতেন। মহাবোধিতে অবস্থিতিকালে তিনি নাস্তিকদিগকে বৌদ্ধ দার্শনিক মত বুঝাইয়া বৌদ্ধধর্মের দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

মগধের বৌদ্ধরাজা মহীপালের পুত্র রাজা নরপাল-এর অনুরোধে দীপঙ্কর বিক্রমশীলার মহাবিহারের প্রধান আচার্য পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও পাণ্ডিত্য তিব্বতে প্রচারিত হওয়াতে লামারা তাঁহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, তিব্বতের রাজা লা লামা যে-শেসোদ দীপঙ্করকে বিক্রমশিলায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া দীপঙ্কর ষাট বৎসর বয়সে ১০৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত যাত্রা করিলেন। তিনি নাগশো নামক লামার সহিত নারী-কোরসুম-এর পার্বত্য পথ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, দীপঙ্কর যখন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া তিব্বতে যাইতেছিলেন তখন তিনি যোগবলে অশ্বপৃষ্ঠের জীন হইতে এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ শূন্যে বসিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক যোগবিভূতি (সিদ্ধাই) ছিল; তন্মধ্যে ইহা একটি। তিনি জাতিস্মরের ন্যায় পূর্ব পূর্ব জন্মের ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন।

তিব্বতের রাজা দীপঙ্করকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগশক্তি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন এবং প্রভুস্বামী উপাধি (তিব্বতী ভাষায় জো-ভো জে) দিয়া তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে বিশুদ্ধ মহাযান মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনভিজ্ঞ লামাদিগকে তান্ত্রিক পন্থা হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্মে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া কদম্পা নামক একটি লামা-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সাড়ে তিনশত বৎসর পরে এই সম্প্রদায়ের নাম গে-লুগ্-পা হইয়াছিল। বর্তমানকালে তিব্বতে এই সম্প্রদায় সর্বপ্রধান। এই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে পদমর্যাদানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ যাজক-লামাসমাজ স্থাপিত হইল।

অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে ত্রয়োদশ বৎসর বাস করিয়া বিভিন্ন শহরে বৌদ্ধধর্ম-সংস্কারকার্য বিস্তার করিয়া তিয়াত্তর বৎসর বয়সে ১০৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লাসার নিকট সে-থান মঠে দেহত্যাগ করেন। তথায় তাঁহার সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তিব্বতের সমস্ত লামারা অতীশ দীপঙ্করকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন এবং বুদ্ধদেবের নীচে বোধিসত্ত্ব বলিয়া তাঁহার মূর্তিপূজা করেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সংস্কৃত ও তিব্বতী ভাষায় শতাধিক ধর্মগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ (১) বোধিপথপ্রদীপ ; (২) চর্যা-সংগ্রহপ্রদীপ ; (৩) সত্যদ্বয়াবতার ; (৪) মধ্যমোপদেশ ; (৫) সংগ্রহগর্ভ ; (৬) হৃদয়-নিশ্চিন্ত ; (৭) বোধিসত্ত্ব-মণ্যাবলি ; (৮) বোধিসত্ত্ব-কর্মাদিমার্গাবতার ; (৯) শরণাগতাদেশ ; (১০) মহাযান-পথ-সাধন-বর্ণ-সংগ্রহ ; (১১) মহাযান-পথ-সাধনসংগ্রহ ; (১২) শুভার্থ-সমুচ্চয়োপদেশ ; (১৩) দশ-কুশল-কর্মোপদেশ ; (১৪) কর্ম-বিভঙ্গ ; (১৫) সমাধি-সম্ভব-পরিবর্ত ; (১৬) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি ; (১৭) গুহ্য-ক্রিয়া-কর্ম ; (১৮) চিত্তোৎপাদ-সম্বর-বিধি-কর্ম ; (১৯) শিক্ষাসমুচ্চয়অভিসময় ; (২০) বিমল-রত্ন-লেখনা।

অতীশ দীপঙ্করের প্রধান শিষ্য ডম্‌টন (জীনাকর) ক-দম্-পা সম্প্রদায়ের মোহন্ত হন এবং ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লাসার উত্তর-পূর্ব দিকে রা-ডেঙ্ নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই ক-দম্-পা সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ হইল।

কারজ্যু-পা, শাক্য-পা, দুক্-পা প্রভৃতি দশটি সম্প্রদায় অতীশের সংস্কারগুলির অর্ধেক অংশ গ্রহণ করিল। কিন্তু যাহারা অতীশের সংস্কার আদৌ গ্রহণ করিল না এবং প্রাচীন মত ও বন্‌ধর্মের আচার-ব্যবহার পোষণ করিতে লাগিল তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম হইল নিম্‌মা-পা। ইহার সাতটি শাখা-সম্প্রদায় স্থাপিত হইল। এই সকল সম্প্রদায়ের লামারা লাল রঙের টুপি ও চোগা পরিধান করেন এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মঠ তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

তিব্বতী রাজা লান্ ডরমাকে হত্যা করিবার পর লামারা তাঁহার নাবালক সন্তান-ভার লইয়া তিব্বতের অধীশ্বর হইলেন এবং রাজ্যকে বিভাগ করিয়া এক এক অংশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লামারা শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি হইল এবং প্রধান প্রধান লামারা স্থানে স্থানে মঠ ও বিহার নির্মাণ করিয়া ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর এইভাবে চলিতে লাগিল। প্রতাপশালী রাজা না থাকায় ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার দস্যুরা চেঙ্গিস্ খাঁর নেতৃত্বে তিব্বত আক্রমণ করে। চেঙ্গিস খাঁ পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

মঙ্গোলীয় চেঙ্গিস্ খাঁর উত্তরাধিকারী কুব্‌লাই খাঁ চীনদেশ জয় করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন। সমস্ত মঙ্গোলিয়া, তিব্বত ও চীনদেশে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। কুব্‌লাই খাঁ অনেক সদ্‌গুণসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যে নানাজাতীয় অসভ্য লোকের বসতি। তাহাদিগকে সভ্য করিতে হইলে উচ্চশ্রেণীর নীতি ও ধর্মপ্রচারের আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটি রাজসভা আহ্বান করিলেন। এই রাজসভায় খ্রীষ্টান ধর্মের মিশনারীগণ ও তিব্বতের বৌদ্ধ লামাগণ মিলিত হইয়াছিলেন। রোমীয়

প্রধান ধর্মযাজক পোপ ঐ সকল খ্রীষ্টান মিশনারীদিগকে চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট কুব্‌লাই খাঁ খ্রীষ্টান মিশনারীগণকে এবং লামাদিগকে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, যাঁহারা কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইতে পারিবেন তাঁহাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিবেন। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ যখন অসমর্থ হইলেন, তখন একজন প্রধান বৌদ্ধলামা সম্রাটের সম্মুখে একটি টেবিলের উপর যে সুরাপাত্রটি ছিল সেইটিকে যোগশক্তি প্রভাবে শূন্যে উঠাইয়া সম্রাটের অধরে লাগাইয়া দিলেন। সম্রাট বিস্মিত চিত্তে উহা হইতে সুরা পান করিলেন। এই অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি (যোগবিভূতি) দেখিয়া সম্রাট বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন এবং লামাধর্মে দীক্ষিত হইলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে য়ুরোপীয় সম্রাট চার্লামেন যেরূপ খ্রীষ্টান ধর্মসঙ্ঘের পোপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেরূপ সম্রাট কুব্‌লাই খাঁ তিব্বতের প্রধান লামাকে রাজত্ব দান করিয়া তিব্বতের বৌদ্ধধর্মাধ্যক্ষ পোপ সৃজন করিলেন এবং তাঁহার নাম হইল পাগ্‌স্‌-পা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাজ।

এইরূপে ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে কুব্‌লাই খাঁ শাক্য-মঠের প্রধান লামা শাক্য-পণ্ডিতকে তিব্বতের মোহন্তরাজা করিলেন। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে শাক্য-লামা চীনদেশের সম্রাটকে রাজমুকুট পরাইয়া অভিষেক করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কুব্‌লাই খাঁ এইরূপে নানাপ্রকারে লামাধর্মের উন্নতিসাধন করিতেছিলেন। তিব্বতে ও মঙ্গোলিয়ায় অনেক লামা মঠ ও বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং চীনদেশের রাজধানী পিকিং-এ একটি বৃহৎ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোহন্তরাজা শাক্য-লামা পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র কা-গ্যুর মঙ্গোলিয়ার ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনিই মঙ্গোলিয়ার বর্ণমালার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অবধি চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও রুশিয়াবাসীরা লামাধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। শাক্য-লামারা মোগল সম্রাটগণের সাহায্যে প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন এবং প্রায় একশত বৎসর তিব্বতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের মিঙ্‌-বংশীয় সম্রাট রাজ্যলাভ করিয়া শাক্য-লামাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য কা-গ্যুপা ও ক-দম্‌-পা সম্প্রদায়ের লামাদিগের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া শাক্য-লামাদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিলেন। বিভিন্ন দলের লামারা রাজ্যে আধিপত্য লাভের জন্য বিরোধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সন্‌-কা-পা নামক এক লামা ক-দম্‌-পা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর এই সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'ক-দম্‌-পা' শব্দের অর্থ যাহারা নিষ্ঠার সহিত নিয়ম পালন করে।

সন্‌-কা-পা এই সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্তন করিয়া গেলুগ্‌-পা (ধর্মশীল) নাম দিলেন এবং অতীশ-নির্ধারিত কঠোর তপস্যার নিয়মগুলি সংক্ষেপ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে গেলুগ্‌-পা সম্প্রদায় প্রধান শক্তিশালী হইয়া উঠিল। বর্তমানে দালাই লামা এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্‌-কা-পা লাসা-নগরীর প্রায় উনচল্লিশ মাইল পূর্বে 'গো-দান' (অর্থাৎ স্বর্গ) নামে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক-দম্‌-পা সম্প্রদায়ের লামাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনাইয়া ঐ মঠে আপন শিষ্যদিগের সহিত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে বিনয়পিটকের ২৩৫টি নিয়মাবলী পালন করিবার উপদেশ দিলেন। তাহাদের পোশাক (আলখাল্লা) ও টুপি ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুদিগের ন্যায় হলুদ রঙে পরিবর্তন করিয়া দিলেন।

এই সম্প্রদায়ের লামারা টুক্‌রা টুক্‌রা কাপড় জোড়া দিয়া সেলাই করিয়া আলখাল্লা প্রস্তুত করেন। তাঁহারা এইরূপ আলখাল্লা পরিধান করেন এবং হস্তে ভিক্ষাপাত্র ও প্রার্থনা করিবার জন্য বসিবার কার্পেট লইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হন। হলুদে রঙের টুপিকে তিব্বতী ভাষায় 'সা-সের' এবং লাল বর্ণের টুপিকে 'সা-মার' বলে। ক-দম্‌-পা লামারা অতীশের সময় হইতে লাল রঙের টুপি ও আলখাল্লা পরিধান করিতেন।

সন্‌-কা-পা লামা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে লাম-রিম (ক্রমপন্থা) নামক গ্রন্থখানি সর্বপ্রধান। তিনি গেলুগ্‌-পা সম্প্রদায়ের পুরোহিত-পদ্ধতিও রচনা করিয়াছিলেন।

১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে সন্‌-কা-পা স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে মঞ্জুশ্রীর (ব্রহ্মার) অবতাররূপে পূজা করিতে লাগিলেন। গেলুগ্‌-পা সম্প্রদায়ের লামারা তাঁহাকে জে-রিম্‌-পোচে নামে জানেন এবং তাঁহাকে পদ্মসম্ভব এমনকি অতীশ দীপঙ্কর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন ও মন্দিরে তাঁহার মূর্তি উচ্চ আসনে স্থাপিত করেন। তাঁহাকে লামারা গ্যাল-ওয়া অর্থাৎ জিন এই পদবী দেন এবং তাঁহার মূর্তি কবচ করিয়া পরিধান করেন।

গেলুগ্‌-পা সম্প্রদায়ের লামারা বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রেয় বুদ্ধের আদেশ ভারতের অসঙ্গ (বৌদ্ধভিক্ষু, যিনি ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের যোগাচার মতবাদ প্রবর্তিত করেন) হইতে দীপঙ্কর ও তাঁহার শিষ্য ডম্‌-বক্সীর মধ্য দিয়া জে-রিম-পোচে-তে আসিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের লামারা বজ্রধরকে আদিমবুদ্ধ বলেন। ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্‌-কা-পার ভ্রাতুষ্পুত্র গে-দুন-গ্রুব গে-লুগ্‌-পা সম্প্রদায়ের মঠের মোহন্ত প্রধান লামার পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাসি-লান্‌পো মঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার এক সহকর্মী লামা জে-সে-রাব্‌সেন-এজে-গ্যাল্‌সাব-জে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দে-পুঙ্গ' মঠ স্থাপন করিলেন। 'দে-পুঙ্গ' অর্থাৎ ধ্যান-স্তূপ। এই মঠ ভারতীয়

কলিঙ্গদেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক-মঠ শ্রীধান্য কটকের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। এই মঠে বৌদ্ধতন্ত্রের কালচক্র-মতের বিশেষ প্রচার হইয়া থাকে। দে-পুঙ্গ মঠ লাসা নগরীর তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমানে এই মঠে সাত হাজার লামা বাস করেন এবং ইহার মধ্যে দালাই লামার একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ আছে। প্রতি বৎসর তিনি লাসা হইতে সেখানে যাইয়া কিছুদিন বাস করেন। এই মঠে অনেক মোগল লামারা বাস করেন ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

খাস-গ্রুব-জে নামক অপর এক সহকর্মী ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সের-রা' নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই লামারা গেলুগ্-পা সম্প্রদায়ের অন্যান্য বড় বড় মঠও স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গে-দুন-গ্রুব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই জান্-পোব্-ক্রাসিস্ তাসি-লান্-পো মঠের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই মঠের প্রতিদ্বন্দ্বী সের-রা নামক মঠ লাসা নগরীর দেড় মাইল উত্তরে তা-তিপু পর্বতের গায়ে অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত। সের-রা শব্দের অর্থ অনুকম্পাপূর্ণ শিলাপাত। শিলাপাত যেমন ধান্যের ধ্বংসকারী সেইরূপ এই মঠ দে-পুঙ্গ মঠের ধ্বংসকারী।

সের-রা মঠে প্রায় ৫,৫০০ লামা বাস করে। তাহারা রাজশক্তি পাইবার জন্য দে-পুঙ্গ মঠের লামাদিগের সহিত অনেকবার বিবাদ, কলহ করিত এবং উহা অনেক সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামা রক্তারক্তিতে পরিণত হইত। এই মঠে তিনটি বড় মন্দির আছে। প্রত্যেকটি ৮।১০ তলা উচ্চ এবং মন্দিরের প্রত্যেকটি ঘর সোনা দিয়া গিল্‌টি করা। কেহ কেহ বলেন তিব্বতী ভাষায় স্বর্ণকে গেস্‌র্ বলে। সেই কারণে এই মঠের নাম সের-রা। সের-রা মঠের মন্দিরে একটি তাম-দিন ফুর্বু নামক বজ্র (দোর্জে) আছে। ইহাকে লামারা বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন এবং প্রতি বৎসর শোভাযাত্রা করিয়া ইহাকে লাসাতে দালাই লামার পোটালা নামক মঠে লইয়া যাওয়া হয় এবং দালাই লামা প্রমুখ সকল লামা তাহা মস্তক দিয়া স্পর্শ করেন। কথিত আছে যে, ইহা প্রথমে ভারতে এক মহাপুরুষের নিকট ছিল, পরে আকাশমার্গে উড়িয়া গিয়া সের-রা মঠের নিকটবর্তী পর্বতে পতিত হয়, তৎপরে লামাদের হস্তে আসে। এই বজ্রের অলৌকিক শক্তিদ্বারা সর্বপ্রকার বিঘ্ন, বিপদ ও অমঙ্গল নিবারিত হয়, এইরূপ বিশ্বাস সকলেরই আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে গেলুগ্-পা সম্প্রদায়ের চতুর্থ মোহন্ত রাজা যন্-তান (গ্র্যান্ড লামা) নামক লামার রাজত্বকালে চীনরাজ্যের মোগল মন্ত্রী চঙ্গ-কার-এর সাহায্যে বিশেষ শক্তিশালী হন। তিনি কা-র্গ্যু, নিন্-মা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লামাদিগকে জোর করিয়া নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে হলুদ রঙের টুপি পরিধান করিতে বাধ্য করেন।

১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে গেলুগ্-পা সম্প্রদায়ের পঞ্চম মোহন্ত রাজা নাগ-ওয়ান লো-জাঙ্গন্যৎ সো-গ্র্যান্ড লামার অনুরোধে মোগল সম্রাটের যুবরাজ গুশরি খাঁ তিব্বত জয় করেন এবং তাঁহাকে জিত রাজ্য দান করেন। এইরূপে নাগ-ওয়ান-লো-জাঙ্গ সমস্ত তিব্বতের মহারাজা হন এবং ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাট তাঁহাকে সমর্থন করিয়া 'দালাই লামা' আখ্যা দেন। মোগল শব্দ 'দালাই' সমুদ্রের ন্যায় মহান অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিব্বতে লামাদিগের মধ্যে কিন্তু এই শব্দ প্রচলিত নাই। তাহারা দালাই লামাকে গ্যাল-ওয়া-রিন্‌পো-চে অর্থাৎ রাজা প্রতাপশালী মহারত্ন এই পদবী দিয়া থাকে।

সেই অবধি অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মঠগুলি তাঁহার অধীনে আসিল। ক্রমশঃ তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার হইলেন। লামা-ধর্মে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর হিন্দুদিগের যমরাজের ন্যায় মনুষ্যের ভাগ্যবিধাতা এবং প্রেতাত্মার পুনর্জন্ম-বিধানকর্তা।

১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই লামা মহারাজা লাসা-নগরীতে একটি পর্বতের উপর 'পোটালা'-নামক সুবৃহৎ মঠ-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তথায় আপনার রাজসিংহাসন বসাইলেন। অদ্যাপি সেই সিংহাসনে তাঁহার উত্তরাধিকারী দালাই লামা মহারাজাগণ বসিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। পোটালা-প্রাসাদ নয়-তলা উচ্চ অট্টালিকা; দেখিতে অতি রমণীয়। ইহার বাহিরের দেওয়ালসমুদয় ঘোর লোহিত রঙে রঞ্জিত এবং মারপো-রি নামক লাল পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

লাসা নগরীতে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে, ইহাকে জে-খাঙ্গ বলে। ইহাতে পঞ্চধাতু-নির্মিত বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। তিব্বতী ভাষায় এই মূর্তির নাম জে-ভোরিন্ পোচে। কথিত আছে যে, এই মূর্তি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় মগধে নির্মিত হয়। বিশ্বকর্মা ইন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হইয়া এই মূর্তি নির্মাণ করেন। মুসলমানেরা যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে চীনসম্রাট মগধের রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মগধের রাজা সেই উপকারের বিনিময়ে এই বুদ্ধমূর্তি চীনসম্রাটকে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চীনসম্রাট তেইৎসুঙ্গ যখন তিব্বতের রাজা স্রন-সান্-গাম্বোকে তাঁহার কন্যার (ওয়েঙ্গ চাঙ্গ) সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন সেই সময়ে ওয়েঙ্গ চাঙ্গ এই বুদ্ধমূর্তিটি লাসাতে লইয়া আসেন। স্রন-সান্-গাম্বো একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মূর্তি স্থাপন করিয়াছলেন। এই মূর্তির মস্তকে যে বহুমূল্য মুকুট আছে তাহা সন্-কা-পা-কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

॥ তিব্বতে রোগ ও চিকিৎসা ॥

তিব্বতে বাংলাদেশের ন্যায় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নাই। লামা-বৈদ্যশাস্ত্র হিন্দুদিগের চরক ও শুশ্রুত হইতে গৃহীত। সুশ্রুত-সংহিতাতে যেসকল যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক যন্ত্র বর্ণিত আছে তাহা বর্তমানে ভারতে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু সেইগুলি চীন, তিব্বত ও মঙ্গোলদেশের বৈদ্য-চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিব্বতীরা দেশীয় জড়ি-বুটি দ্বারা উৎকট রোগ দূর করিতে পারে এরূপ প্রবাদ আছে। শল্য-চিকিৎসাতেও তিব্বতরা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই চিকিৎসা তাহারা চীনদেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

তিব্বতে বসন্ত রোগের প্রভাব অধিক, কিন্তু ইহার প্রতিকার বিষয়ে তিব্বতী বৈদ্যেরা অনভিজ্ঞ। তাহারা টীকা দেয় না। চীনদেশের প্রথানুযায়ী তিব্বতীরা বসন্ত রোগের বীজ কোন সবল বালকের অঙ্গ হইতে গ্রহণ করিয়া কর্পূরের সহিত মিশাইয়া একটি নল দ্বারা নাসিকার মধ্যে ফুঁ দিয়া প্রবেশ করাইয়া দেয়। পানি-বসন্তের জন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। ইহা সময়ে আপনি আরোগ্য হয়।

ক্ষিপ্ত কুকুর কামড়াইবার ফলে জলাতঙ্ক রোগ তিব্বত, চীন, মঙ্গোল দেশে বিশেষ প্রবল। তিব্বতীদিগের বিশ্বাস যে, এই রোগের লক্ষণ কুকুরের গায়ের রং অনুসারে সাত দিন হইতে আঠারো দিনের মধ্যে প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা এই রোগের যেরূপ চিকিৎসা করেন তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথমতঃ ক্ষতস্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে পট্টী বাঁধিয়া ক্ষতস্থান হইতে শিঙ্গার ন্যায় বাটি-যন্ত্রদ্বারা বিষ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলা হয়। তৎপরে সেই স্থান হইতে রক্তস্রাব করাইয়া পরে তপ্ত লৌহ দ্বারা রোগদুষ্ট মাংস দগ্ধ করা হয় এবং একপ্রকার মলম লাগানো হয়। এই মলমে ঘৃত, হলুদ, মৃগনাভি ও বিষাক্ত গাছের শিকড় মিশ্রিত থাকে।

গলগণ্ড রোগ দক্ষিণ তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও সিকিমে অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তুষার নদীর বরফগলা জল ও বরফচূর্ণময় জল পান করিলে এই রোগ হইয়া থাকে। এই গলগণ্ড রোগ ছয় প্রকার। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা তিব্বতী বৈদ্যেরা করিয়া থাকেন।

তিব্বতী বিষাক্ত সর্প কোন কোন উপত্যকায় আছে। সর্প-দংশনের চিকিৎসা কুকুর-দংশনের চিকিৎসার তুল্য। বিশেষ এই যে, ক্ষতস্থানটি দুগ্ধ, দধি অথবা উষ্ট্র-দুগ্ধ দ্বারা ধৌত করানো হয়। কথিত আছে যে, সর্প যদি উষ্ট্রকে দংশন করে তাহা হইলে সর্প মরিয়া যাইবে, কিন্তু উষ্ট্রের কোন ক্ষতি হইবে না। সর্পদষ্ট রোগীকে দেশীয় ঔষধ সেবন করানো হয়। তিব্বতে লালোস্ নামে এক জাতি আছে, তাহারা চীনা ও জাপানীদিগের ন্যায় সর্প রন্ধন করিয়া ভোজন করে। কিন্তু তাহারা সর্পের মস্তক ও লেজ ফেলিয়া দেয়।

তিব্বতে সন্ন্যাসরোগ অনেকেরই হয়। এই রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কুষ্ঠরোগ তিব্বতীদিগের মধ্যে প্রবল। ইহা অষ্টাদশ প্রকার। প্রত্যেকের পক্ষে বিভিন্ন ঔষধ ও চিকিৎসা আছে। উদরী বা শোথরোগ দক্ষিণ ও পূর্ব-তিব্বতে বিশেষ প্রবল। ইহা দ্বাদশ প্রকার। অস্থি-ভস্ম এই রোগের পক্ষে উপকারী। অন্যান্য দেশীয় ঔষধ দ্বারা এই রোগের উপশম হয়। উদরাময় ও অজীর্ণ রোগ তিব্বতীদিগের মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ। ইহা ত্রিশ-চল্লিশ প্রকার। তিব্বতীদিগের দন্তরোগ জলবায়ুর দোষে অল্প বয়সেই দেখা দেয় এবং কোন কোন স্থানে ত্রিশ বৎসর বয়সে একটি দন্তও থাকে না।

॥ তিব্বতী ক্রীড়া ॥

কুস্তি, ধনুর্বিদ্যা, পোলো, ঘোড়দৌড়, পাশা, সতরঞ্চ, ছক্কা-পাঞ্জা প্রভৃতি ক্রীড়া গৃহস্থী তিব্বতীরা খেলিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী লামারা নৃত্য, গীত ও বাদ্য ভালবাসেন এবং স্বর্গ ও নরকপ্রাপ্তির ভাগ্য-পরীক্ষা খেলা করিয়া থাকেন।

নব বর্ষারম্ভের দিন, বুদ্ধের জন্মদিন, তাঁর গৃহত্যাগের দিন ও পরিনির্বাণের দিন বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। সেই সময়ে বড় বড় মঠে ও মন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং নানাপ্রকারের নাচ ও তামাশা হইয়া থাকে। ভূত-প্রেতের নানাপ্রকারের মুখোশ এবং নরকঙ্কালাঙ্কিত পোশাকে সজ্জিত হইয়া লামারা নৃত্য-গীত করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর আনন্দ-বর্ধন করিয়া থাকেন। বন্ধু-বান্ধবদিগকে লইয়া বনভোজন করিবার প্রথা তিব্বতে বিশেষ প্রবল। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় তিব্বতীরা হিন্দুদিগের ন্যায় পূজাপাঠ করিয়া থাকেন।

॥ লামাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ॥

তিব্বতী রোগীর মৃত্যু হইলে সন্ন্যাসী লামা ব্যতীত অন্য কাহাকেও মৃতদেহ ছুঁইতে দেওয়া হয় না। রোগীর নাড়ী অথবা নিঃশ্বাস বন্ধ হইলেও যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস তিব্বতীদের মধ্যে নাই। তিব্বতীদিগের বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা (নাম শে) মৃতদেহের মধ্যে অন্ততঃ তিন দিন পর্যন্ত থাকে, সেইজন্য মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শবদেহের সৎকার করা মহাপাপ বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। কিন্তু উন্নত সিদ্ধযোগী লামাদিগের আত্মা নিঃশ্বাস শেষ হইলে দেহত্যাগ করিয়া গদন অথবা তুষিত নামক স্বর্গে গমন করেন।

সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে পোবো লামা, যিনি মৃতদেহ হইতে আত্মাকে বাহির করিতে জানেন, তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি আসিয়া মৃতদেহ যে ঘরে থাকে তাহাতে প্রবেশ করিয়া দরজা, জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া একাকী শবের নিকট বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃতদেহের মস্তকের উপরিভাগ হইতে তিন-চারি গাছি চুল উৎপাটন করিয়া ফেলেন। কখনও কখনও ছুরিকা দ্বারা মস্তকের চর্ম একটু কাটিয়া দেন। ইহাদের বিশ্বাস যে, ঐ লোমকূপের ছিদ্রদ্বার দিয়া শবদেহের মধ্যে আবদ্ধ আত্মা বাহির হইলে আত্মার ঊর্ধ্বগতি হয় ; নতুবা দেহের অন্য দ্বার দিয়া আত্মা বাহির হইলে তাহার অধোগতি হয়। পরে ঐ লামা মন্ত্রদ্বারা সেই আত্মাকে সদ্গতির পথে বিঘ্ন ও বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে অমিতাভ বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। এই ক্রিয়া করিতে প্রায় এক ঘণ্টা কাল সময় লাগে। যতক্ষণ না ঐ লামা স্থির করিয়া বলিতে পারেন যে, মৃতব্যক্তির আত্মা দেহের কোন্ দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছে, ততক্ষণ শোকার্ত আত্মীয়গণ শবদেহের নিকট যায় না।

এই ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ঐ লামা দক্ষিণা-স্বরূপ অর্থ, গো, য়্যাক (চমরীগাই), ভেড়া অথবা ছাগল পাইয়া থাকেন। তারপর জ্যোতির্বিদ্ লামা মৃতব্যক্তির কুষ্ঠী দেখিয়া তাহার জন্মতিথি ও বয়স স্থির করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা দেন। যদি কোন আত্মীয় সেই তিথি ও নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মা সেই আত্মীয়ের ঘাড়ে চাপিবে। এই জ্যোতির্বিদ্ লামাও উক্ত প্রকার দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

সাধারণতঃ তিব্বত ও মঙ্গোলিয়াতে সকল অবস্থার লোকের মৃতদেহ তিন দিন অতি যত্নের সহিত ঘরের এক কোণে সাদা কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বসাইয়া রাখা হয় এবং আত্মীয়স্বজন আসিয়া শবদেহ দর্শন পরিক্রম করিতে করিতে আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে ও হস্তে মণিযন্ত্র ঘুরাইতে থাকে। শবদেহের মস্তকের নিকট পাঁচটি ঘৃত-প্রদীপ সর্বদা জ্বলিতে থাকে এবং উহার সম্মুখে একটি পরদা ঝুলানো থাকে। ইহার মধ্যে প্রেতাত্মাকে আহার্য ও পানীয় চা অথবা ছাং সুরা, এমনকি তামাকু পর্যন্ত রীতিমত আহারের সময়ে নিবেদন করা হয়। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য পরে কেহ ভোজন করে না। উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে, উহার সারাংশ প্রেতাত্মা গ্রহণ করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ভক্ষণীয় নহে। ইহাদের আরও বিশ্বাস যে, প্রেতাত্মা নিজ আত্মীয়দিগের নিকট উনপঞ্চাশ দিন পর্যন্ত ঘুরিতে থাকে। সেইজন্য তাহার পাত্রে প্রত্যহ চা, ছাং ও খাদ্যদ্রব্য, ঘি, ছাতু প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং ধূপ জ্বালানো হয়।

চতুর্থ দিবসে প্রাতে ঐ শব বাহিরে আনিয়া নিকটবর্তী শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময়ে লামারা জোরে ডমরু বাজাইতে থাকে এবং আত্মীয়েরা শবের খাটের সহিত সংলগ্ন কাপড় ধরিয়া পশ্চাতে গমন করে এবং শ্রদ্ধার সহিত দীর্ঘ প্রণাম করিতে থাকে। দুইজন চা ও খাদ্য লইয়া যায়। প্রধান লামা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে ডমরু ও বামহস্তে ঘণ্টা বাজায়। শ্মশানে উপস্থিত হইবার পূর্বে পথে কোন স্থানে শব নামানো অমঙ্গলসূচক। যদি কোন কারণবশতঃ পথে নামাইতে হয়, তাহা হইলে সেইস্থানেই শবের সৎকার করা নিয়ম। লাসা শহরের নিকট ফাবোঙ্কা ও সেরাশার নামক দুইটি গোরস্থান আছে। প্রথমটিতে শবকে লইয়া যাইলে মঠের লামাদিগকে চা পান করিবার জন্য তিন টাকা দিতে হয়। দ্বিতীয়টিতে লইয়া যাইলে শ্মশান-রক্ষককে এক টাকা ও মৃতব্যক্তির বস্ত্রাদি ও বিছানা দিতে হয়।

তিব্বতে প্রত্যেক শ্মশান বা গোরস্থানে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আছে। তাহার উপর শবদেহকে উলঙ্গ করিয়া উপুড় করিয়া শোয়ানো হয়। পরে একজন জল্লাদ লামা আপাদমস্তক দাগ দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বৃহৎ তরবারী দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া শবদেহকে কাটিয়া ফেলে। পরে ঐ সকল টুকরা শকুনি, গৃধিনী (তানকার) ও কুকুরদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। অবশেষে মস্তকটি চূর্ণ করিয়া মস্তিষ্ক ও হাড়ের সহিত মিশাইয়া তাহাদিগকেই খাওয়ানো হয়।

তৎপরে একটি নূতন মৃৎপাত্রে ঘুঁটের আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে ঘৃত ও যবের ছাতু মিশাইয়া পোড়ানো হয়। ঐ পাত্রটি যে দিকে প্রেতাত্মা গিয়াছে শ্মশানের সেই দিকে রাখা হয়। তৎপরে সকলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আহারান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করে। সাধারণতঃ সকলের জন্য উক্ত শবকর্তনপ্রথা তিব্বতে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ করা হয় এবং ঐ ভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া ছর্তেনে রক্ষিত হয়। বোধিসত্ত্বের ন্যায় মহাত্মা লামাদিগের মৃতদেহকে মিশর দেশের প্রথার ন্যায় মমি করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা তাম্রের ছর্তেনে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির ন্যায় মন্দিরে রক্ষিত হয় এবং নিত্য পূজা, ভোগ, আরতি করা হয়।

দালাই ও তাসি লামাদিগের দেহত্যাগ হইলে সাতদিন সমস্ত অফিস, বাজার বন্ধ থাকে। একমাস স্ত্রীলোকেরা নূতন বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করে না, অন্যান্য লামারা দশদিন শোক করে। সেই সময়ে ক্ষৌরকার্য ও মস্তকে টুপি পরা নিষিদ্ধ। মঠের মোহন্ত দেহত্যাগ করিলে অন্যান্য আত্মীয় অথবা বন্ধুদিগের মধ্যে শোক প্রকাশ করা হয়। ধনী সম্ভ্রান্ত তিব্বতীর পিতামাতা দেহত্যাগ করিলে সে এক বৎসর বিবাহ অথবা কোন আমোদ-প্রমোদে যোগদান করে না এবং দূরদেশে যাত্রা করে না।

সিকিমের বৌদ্ধ লামারা শবদেহকে শ্মশানে দাহ করিয়া হিন্দুদিগের প্রথানুযায়ী চিতা জলদ্বারা নির্বাপিত করে। ভস্মগুলি সংগ্রহ করিয়া নদীতে ফেলা হয় এবং একটি পাত্রে অস্থি সংগ্রহ করিয়া ছর্তেনে প্রোথিত করা হয়। সিদ্ধযোগী লামাদিগের অস্থি চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করা হয়, পরে ছোট ছর্তেনের ছাঁচে গঠন করা হয় এবং উহা কোন মন্দির অথবা মঠে রক্ষিত হয়।

মৃত্যুর পর সপ্তম দিবসে তেন-জুঙ্গ নামক শ্রাদ্ধ করিয়া আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদিগকে ভোজন করানো হয়। সন্ধ্যাকালে তান্ত্রিক লামা আগন্তুক ভূত, প্রেত ও অমঙ্গলকারী আত্মাদিগকে মন্ত্র দ্বারা তাড়াইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ লোকনায়ক যীশুখ্রীষ্ট ॥

(হিমিস্ মঠের পুঁথিতে যেরূপ বর্ণিত আছে)

[১]

১। ইজরেল বংশধর ইহুদীরা যে ভীষণ পাপকার্য করিয়াছে তাহা জানিয়া পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণ স্বর্গলোক হইতে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

২। কারণ তাহারা যে মহাপুরুষ ঈশার মধ্যে বিশ্বাত্মা বিরাজমান ছিলেন তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছে।

৩। বিশ্বাত্মা সাধারণের উপকার ও তাহাদের পাপচিন্তা দূর করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৪। এবং পাপীদিগকে শান্তি, সুখ ও ভগবৎপ্রেম দিবার জন্য ও ঈশ্বরের অসীম করুণা স্মরণ করাইবার জন্য তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

৫। এই সংবাদ ইজরেলদেশীয় বণিকগণ এদেশে আসিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

[২]

১। ইজরেল জাতিরা অতি উর্বর ভূমিতে বাস করিত এবং সেখানে বৎসরে দুইবার ফসল হইত। তাহাদের অনেক ভেড়া ও ছাগলের পাল ছিল। তাহারা পাপকর্মের দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছিল।

২। সেই কারণে ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লন এবং মিশরদেশের প্রতাপশালী সম্রাট ফেরাও-এর দাসত্বে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩। কিন্তু সম্রাট ফেরাও ইজরেলের বংশধরদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, তাহাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া এবং গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত করিয়া কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৪। যাহাতে তাহারা সর্বদা সশঙ্কিত থাকে এবং মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দিতে পারে।

৫। ইজরেলের সন্তান-সন্ততিগণ এইরূপে মহাকষ্টে পড়িয়া তাহাদের পূর্ব-পুরুষদিগের রক্ষাকর্তা জগৎপিতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃপা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

৬। সেই সময়ে এক সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী ও ঐশ্বর্যশালী ফেরাও মিশরদেশের সম্রাট হইয়াছিলেন ; তাঁহার প্রাসাদগুলি ক্রীতদাসেরা নিজ হস্তে নির্মাণ করিয়াছিল।

৭। এই ফেরাও-এর দুই পুত্র ছিল। ইহাদের কনিষ্ঠটির নাম ছিল মোসা। ইনি বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন।

৮। এবং ইনি আপন সচ্চরিত্রগুণে ও দুঃস্থের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।

৯। ইনি দেখাইয়াছিলেন যে, ইজরেলের বংশধরগণ অসীম কষ্ট সহ্য করিয়াও জগৎপিতার প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মিশরদেশীয় জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হয় নাই।

১০। মোসা এক অখণ্ড জগদীশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করিতেন।

১১। ইজরেলদিগের শিক্ষাদাতা পুরোহিতগণ মোসার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তিনি যদি তাঁহার পিতা সম্রাট ফেরাওকে তাহাদের সহকর্মীদিগের সাহায্যার্থ অনুরোধ করেন তাহা হইলে সকলের মঙ্গল হইবে।

১২। মোসা তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করিলে তাঁহার পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রজাদিগের উপর ক্রীতদাসের ন্যায় অধিকতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৩। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মিশরদেশে মহামারী আসিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী-দরিদ্র সকলকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে লাগিল। সম্রাট ফেরাও ভাবিলেন তাঁহার কার্যে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া এইপ্রকার শাস্তি দিতেছেন।

১৪। সেই সময়ে মোসা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, জগৎপিতা অত্যাচারে পীড়িত দুঃখী প্রজাদিগের প্রতি কৃপা করিবার জন্য মিশরবাসীদিগকে শাস্তি দিতেছেন।

* * *

ক্রমে জগৎপিতার কৃপায় ইজরেল বংশধরদিগের শ্রীবৃদ্ধি ও স্বাধীনতা আসিতে লাগিল।

[৩]

১। জগৎপিতা জগদীশ্বর পাপীদের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিলেন।

২। সেই অবতার-পুরুষ অনাদি অনন্ত সর্বকর্মের অতীত পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র আত্মারূপে মূর্তিমান হইলেন।

৩। জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার ও অনন্ত সুখ লাভ করিবার উপায় দেখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন।

৪। এবং নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা যাহাতে জীব নৈতিক পবিত্রতা লাভ করিতে পারে এবং স্থূলদেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে ও যে জগৎপিতার স্বর্গে অনন্ত সুখ সর্বদা বিরাজমান তথায় গমন করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মানব-শরীর ধারণ করিলেন।

৫। ইজরেলের দেশে এক অপূর্ব শিশুরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই শিশুর মুখ দিয়া জগদীশ্বর দেহের অনিত্যতা ও আত্মার মহিমা বলিতে লাগিলেন।

৬। এই শিশুর পিতামাতা দরিদ্র, কিন্তু অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ এবং পবিত্র বংশজাত ছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নাম ও মহিমা কীর্তন করিবার জন্য পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ করিয়াছিলেন এবং জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

৭। জগদীশ্বর তাঁহাদের সহিষ্ণুতার পুরস্কার দিবার জন্য এই প্রথমজাত শিশুকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এবং পাপীদিগকে উদ্ধার এবং অসুস্থদিগকে আরোগ্য করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৮। এই দেবশিশুর নাম হইল ঈশা। ইনি শৈশবকালে অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের প্রতি যাহাতে ভক্তি-শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, সে বিষয়ে জনসাধারণকে অনুরোধ করিতেন এবং পাপীদিগকে পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া অনুতাপ করিতে বলিতেন।

৯। এই শিশুর মুখে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য চতুর্দিক হইতে লোক আসিত এবং ইজরেল বংশধরগণ একবাক্যে স্বীকার করিত যে, অনাদি অনন্ত পরম কারুণিক পরমেশ্বর এই শিশুর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। (অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে)।

* * *

ইহা ছাড়া বোম্বের বুদ্ধ সোসাইটির সম্পাদক একটি বিবৃতিতে যীশুখ্রীষ্টের ভারতভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে উল্লেক করিয়া বলিয়াছেন ঃ

"A recent New York despatch says that Prof. Roerich, a well-known archaeologist, who is conducting an American expedition to Central Asia, announces that he has found manuscripts in a Buddhist monastery in Ladak describing the visit of Jesus Christ to India to study Buddhism. Jesus Christ travelled through India preaching and returned to Jerusalem when he was 27 years of age.

There are not a few scholars who think that Christianity originated from Buddhism."

পরিশিষ্ট

হিমিস্-গুম্ফা হইতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যীশুখ্রীষ্টের চৌদ্দ বছরের যে অজ্ঞাত জীবনের কাহিনী তিব্বতী দোভাষী লামার মাধ্যমে অনুবাদ করাইয়া আনিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে রুশ-পর্যটক নিকোলাস নটোভিচ্কৃত অনুবাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তাহা আগেও উল্লেখ করিয়াছি। নটোভিচ্ও দোভাষীর সাহায্য লইয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, মনে হয়, রুশীয় ভাষায় এবং আমেরিকায় সেটি পুনরায় ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়[১]।

আমরা বইখানির ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ সংস্করণটি হইতে যীশুখ্রীষ্টের অজ্ঞাত-ভারতীয় জীবনকাহিনীর কতকাংশ মাত্র (পৃঃ ১০৫—১১৪) অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নিকোলাস নটোভিচ্ বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ

"After the close of the Turko Russian War [1867—1878] I undertook a series of extended journeys through the Orient. Having visited all points of interest in the Balkan Peninsula, I crossed the Caucasian Mountains into Central Asia and Persia, and finally, in 1887, made an excursion into India, the most admired country of the dreams of my childhood.

* * *

In the course of one of my visits to a Buddhist convent, I learned from the chief Lama that there existed very ancient memoirs, treating of the life of Christ and of the nations of the Occident, in the archives of Lassa, and that a few of the larger monasteries possessed copies and translations of these precious chronicles.

* * *

During my sojourn in Leh, the capital of Ladak, I visited Himis, a large convent in the outskirts of the city, where I was informed by the Lama that the monastic libraries contained a few copies of the manuscript in question. * * * I took advantage of my short stay among these monks to obtain the privilege of seeing

১। *The Unknown Life of Jesus Christ* by Nicolas Notovitch. Translated from the French by Alexina Loranger (Indo-American Book Company, Chicago III, U.S.A.)

the manuscripts relating to Christ. With the aid of my interpreter, who translated from the Thibetan tongue, I carefully transcribed the verses as they were read by the Lama. Entertaining no doubt of the authenticity of this narrative, written with the utmost precision by Brahmin historians and Buddhists of India and Nepal, my intention was to publish the translation on my return to Europe."

তাহা ছাড়া বইটির মধ্যে A Feast in a Gompa শীর্ষক আলোচনায়ও গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ঃ

"While a young man kept the prayer-wheel in motion by my besides, the venerable director of the gompa entertained me with interesting accounts of their belief and the country in general, * * Finally, yielding to my earnest solicitations, he brought forth two big volumes in cardboard covers, with leaves yellowed by the lapse of time, and read the biography of Issa, which I carefully copied from the translation of my interpreter. This curious document is written in the form of isolated verses, which frequently bear no connection between each other."

"I have long cherished the project of publishing the memoirs on the life of Jesus Christ, which I found at Himis, * *, [pp. 96—97]

তাহা ছাড়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের Epitome পর্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ "In reading the life of Issa [Jesus Christ], we are at first struck by the similarity between some of its principal passages and the Biblical narrative; while, on the other hand, we also find equally remarkable contradictions, which constitute the difference between the Buddhist version and that found in the Old and New Testaments". [p. 147]

"The two manuscripts read to me by the Lama of the Himis Convent, were compiled from diverse copies written in the Tibetan tongue, translated from rolls belonging to the Lassa library and brought from India, Nepal, and Maghada two hundred years after Christ. These were placed in a convent standing on Mount Marbour, near Lassa, where the Dalai Lama now resides.

These rolls were written in the Pali tongue, which certain Lamas study carefully so that they may translate the sacred writings from that language into the Tibetan dialect.

The chroniclers were Buddhists belonging to the sect of Buddha Gautama." [p. 151]

গ্রন্থকার নটোভিচ্ যীশুখ্রীষ্টের ভারত-পরিভ্রমণ সম্বন্ধে নানা স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তির অবতারণা করিয়া পরিশেষে এই কথা অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছেন ঃ

"It is to be supposed that Jesus Christ chose India, first, because Egypt made part of the Roman possessions at that period, and then because an active trade with India had spread marvellous reports in regard to the majestic character and inconceivable riches of art and science in that wonderful country, where the aspirations of civilized nations still tend in our own age.

Here the Evangelists again lose the thread of the terrestrial life of Jesus. St. Luke says : 'He was in the desert till the day of his shewing unto Israel.' Which conclusively proves that no one knew where the young man had gone, to so suddenly reappear sixteen years later." (pp. 161—162)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

THE LIFE OF SAINT ISSA

The Best of the Sons of Men

(By Nicholas Notovitch)

IV

1. And now the time had come, which the Supreme Judge, in his boundless clemency, had chosen to incarnate himself in a human being.

2. And the Eternal Spirit, which dwelt in a state of complete inertness and supreme beatitude, awakened and detached itself from the Eternal Being for an indefinite period.

3. In order to indicate, in assuming the human form, the means of identifying ourselves with the Divinity and of attaining eternal felicity.

4. And to teach us, by his example, how we may reach a state of moral purity and separate the soul from its gross envelope, that it may attain the perfection necessary to enter the Kingdom of Heaven which is immutable and where eternal happiness reigns.

5. Soon after, a wonderful child was born in the land of Israel; God Himself, through the mouth of this child, spoke of the nothingness of the body and of the grandeur of the soul.

6. The parents of this new-born child were poor people, belonging by birth to a family of exalted piety, which disregarded its former worldly greatness to magnify the name of the Creator and thank him for the misfortunes with which he was pleased to try them.

7. To reward them for their perseverance in the path of truth, God blessed the first-born of this family; he chose him as his elect, and sent him forth to raise those that had fallen into evil, and to heal them that suffered.

8. The Divine child, to whom was given the name of Issa, commenced even in his most tender years to speak of the one and indivisible God, exhorting the people that had strayed from the path of righteousness to repent and purify themselves of the sins they had committed.

9. People came from all parts to listen and marvel at the words of wisdom that fell from his infant lips; all the Israelites united in proclaiming that the Eternal Spirit dwelt within this child.

10. When Issa had attained the age of thirteen, when an Israelite should take a wife.

11. The house in which his parents dwelt and earned their livelihood in modest labour, became a meeting place for the rich and noble, who desired to gain for a son-in-law the young Issa, already celebrated for his edifying discourses in the name of the Almighty.

12. It was then that Issa clandestinely left his father's house, went out of Jerusalem, and in company with some merchants, travelled toward Sindh.

13. That he might perfect himself in the divine word and study the laws of the great Buddhas.

V

1. In the course of his fourteenth year, young Issa, blessed by God, journeyed beyond the Sindh and settled among the Aryas in the beloved country of God.

2. The fame of his name spread along the Northern Sindh. When he passed through the country of the five rivers and the Radjipoutan, the worshippers of the god Djaine begged him to remain in their midst.

3. But he left the misguided admirers of Djaine and visited Juggernaut, in the province of Orsis, where the remains of Viassa-Krichna rest, and where he received a joyous welcome from the white priests of Brahma.

4. They taught him to read and understand the Vedas, to heal by prayer, to teach and explain the Holy Scripture, to cast out evil spirits from the body of man and give him back human semblance.

5. He spent six years in Juggernaut, Rajergriha, Benares, and the other holy cities; and all loved him, for Issa lived in peace with the Vaisyas and Soudras, to whom he taught the Holy Scripture.

6. But the Brahmans and the Kshatriyas declared that the Great Para-Brahma forbade them to approach those whom he had created from his entrails and from his feet.

7. That the Vaisyas were authorized to listen only to the reading of the Vedas, and that never save on feast days.

8. That the Soudras were not only forbidden to attend the reading of the Vedas, but to gaze upon them even; for their condition was to perpetually serve and act as slaves to the Brahmans, the Kshatriyas, and even to the Vaisyas.

9. "Death alone can free them from servitude," said Para-Brahman. "Leave them, therefore, and worship with us the gods who will show their anger against you if you disobey them."

10. But Issa would not heed them; and going to the Soudras, preached against the Brahmans and the Kshatriyas.

11. He strongly denounced the men who robbed their fellow-beings of their rights as men, saying : "God the Father establishes no difference betwen his children, who are all equally dear to him."

12. Issa denied the divine origin of the Vedas and the Pouranas, declaring to his followers that one law had been given to men to guide them in their actions.

13. "Fear thy God, bow down the knee before Him only, and to Him only must the offerings be made."

14. Issa denied the Trimourti and the incarnation of Para-Brahma in Vishnou, Siva, and other gods, saying.

15. "The Eternal Judge, the Eternal Spirit, composes the one and indivisible soul of the universe, which alone creates, contains and animates the whole."

16. "He alone has willed and created, he alone has existed from eternity and will exist without end; he has no equal neither in the heavens nor on this earth."

17. "The Great Creator shares his power with no one, still less with inanimate objects as you have been taught, for He alone possesses supreme power."

18. "He willed it, and the world appeared; by one divine thought he united the waters and separated them from the dry portion of the globe. He is the cause of the mysterious life of man, in whom he has breathed a part of his being."

19. "And he has subordinated to man, the land, the waters, the animals and all that he has created, and which he maintains in immutable order by fixing the duration of each."

20. "The Wrath of God shall soon be let loose on man, for he has forgotten his Creator and filled his temples with abominations, and he adores a host of creatures which God has subordinated to him."

21. "For, to be pleasing to stones and metals, he sacrifices human beings in whom dwells a part of the spirit of the Most High."

22. "For the humiliates them that labour by the sweat of their brow to gain the favour of an idler who is seated at a sumptuously spread table."

23. "They that deprive their brothers of divine happiness shall themselves be deprived of it, and the Brahmans and the Kshatriyas shall become the Soudras of the Soudras with whom the Eternal shall dwell eternally."

24. "For on the day of the Last Judgement, the Soudras and Vaisyas shall be forgiven because of their ignorance, while God shall visit his wrath on them that have arrogated his rights."

25. "The Vaisyas and the Soudras were struck with admiration, and demanded of Issa how they should pray to secure their happiness."

26. "Do not worship idols, for they do not hear you; do not listen to the Vedas, where the truth is perverted; do not believe yourself first in all things, and do not humiliate your neighbour."

27. "Help the poor, assist the weak, harm no one, do not covet what you have not and what you see in the possession of others."

VI

1. The white priests and the warriors becoming cognizant of the discourse addressed by Issa to the Soudras, resolved upon his death and sent their servants for this purpose in search of the young prophet.

2. But Issa, warned of this danger by the Soudras, fled in the night from Juggernaut, gained the mountains, and took refuge in

the Gothamide Country, the birth-place of the great Budda-Cakya-Mouni, among the people who adored the only and sublime Brahma.

3. Having perfectly learned the Pali tongue, the just Issa applied himself to the study of the sacred rolls of Soutras.

4. Six years later, Issa, whom the Buddha had chosen to spread his holy word, could perfectly explain the sacred rolls.

5. He then left Nepal and Himalaya Mountains, descended into the valley of Rajipoutan and went westward, preaching to diverse people of the supreme perfection of man.

6. And of the good we must do unto others, which is the surest means of quickly merging ourselves in the Eternal Spirit, "He who shall have recovered his primitive purity at death", said Issa, "shall have obtained the forgiveness of his sins, and shall have the right to contemplate the majestic figure of God."

7. In traversing the pagan territories, the divine Issa taught the poeple that the adoration of visible gods was contrary to the laws of nature.

8. "For man", said he, "has not been favoured with the sight of the image of God nor the ability to construct a host of divinities resembling the Eternal."

তাহা ছাড়া এই সম্বন্ধে বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক রোরিকের অভিমত স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষে উল্লেখ করিয়াছেন।

Text incorporated by—**Swami Prajnanananda**

Swami Abhedanander
Kashmir O Tibbat Bhraman
Rs. 80.00

ISBN 978-81-88446-83-4